

যেভাবে শিখে থাকে সেই একই প্রক্রিয়াতে তারা শেখান। আশা করা যায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ডিপিএড কার্যক্রমে নিজেরা অনুসন্ধানভিত্তিক এপ্রোচে বিজ্ঞান শিখে বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে একই এপ্রোচে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শেখায় সহায়তা করবে। শিক্ষণ বিজ্ঞান অংশে যে পরিবর্তনটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হলো, তথ্যপুস্তকটিতে জাতীয় প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকে যে সকল নতুনত্ব এসেছে সে বিষয় এবং এপ্রোচকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকা এবং শিক্ষক সংস্করণসমূহ কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক পরিকল্পিত প্রাথমিক বিজ্ঞান মূল্যায়ন রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

‘পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯’-এ যে সকল সংযোজন-বয়োজন সম্পাদিত হয়েছে তা ডিপিএড কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে বিশ্বাস করছি। পরিমার্জনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, লেখক, সম্পাদক ও সমন্বয়কবৃন্দকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই পরিমার্জন কাজে আইইআর ডিপিএড টিমের সম্মানিত সদস্যগণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে তাঁদের ভূমিকা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকাসহ ডিপিএড মানোন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আইইআর ডিপিএড টিমকে সর্বাঙ্গিক সহায়তা ও সমর্থন প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আইইআর-এর প্রাক্তন পরিচালকবৃন্দ অধ্যাপক মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, অধ্যাপক ড. আবদুল আউয়াল খান ও অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম এবং আইইআর এর অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সচিব, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি যারা ডিপিএড কার্যক্রমের মানোন্নয়নে আইইআর এর গৃহীত কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়ে আসছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (অর্থ ও সংগ্রহ) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি জানাচ্ছি অশেষ কৃতজ্ঞতা যারা বিভিন্ন সময়ে আইইআর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর বর্তমান ও প্রাক্তন মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ যারা এ পরিমার্জন কাজে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে, ‘পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯’ ডিপিএড কোর্সের মানোন্নয়ন তথা প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রত্যাশিত শিক্ষকমান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করছি।

অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার
পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. শারমিন হক
কো-অর্ডিনেটর
ডিপিএড মান উন্নয়ন কর্মসূচি
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

প্রথম অংশ: প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়জ্ঞান

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	আমাদের পরিবেশ পরিবেশ ও পরিবেশের উপাদান জড় ও জীবের বৈশিষ্ট্য জীবনের জন্য কী প্রয়োজন? উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা জীবের আবাসস্থল বাস্তুসংস্থান, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যজাল ও শক্তির প্রবাহ	
২	পরিবেশের উপাদান ও পরিবেশ সংরক্ষণ পরিবেশের উপাদান জীবের ওপর পরিবেশের প্রভাব পরিবেশ সংরক্ষণ পরিবেশের উপাদান: মাটি - মাটি কী উপাদান দিয়ে তৈরি? - মাটি কী কী ধরনের - মাটি ক্ষয় ও এর প্রভাব - মাটি সংরক্ষণ - মাটি দূষণের কারণ - মাটি দূষণ রোধে করণীয় পরিবেশের উপাদান: পানি - পানির উৎস ও ব্যবহার - উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য পানি - পানি চক্র - কীভাবে মেঘ সৃষ্টি হয় - পানি দূষণ ও এর কারণ - পানি দূষণ রোধে করণীয় - পানি বিশুদ্ধকরণ পরিবেশের উপাদান: বায়ু - বায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ - আগুন জ্বালানোর জন্য বায়ুর প্রয়োজন আছে কি? - বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতি - বায়ুর প্রয়োজনীয়তা - বায়ু দূষণ ও পরিবেশের ওপর এর প্রভাব - বায়ু দূষণ রোধের উপায়	

৩	খাদ্য ও পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যবিধি খাদ্য এবং পুষ্টি পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান, উৎস ও প্রয়োজনীয়তা - আমিষ বা প্রোটিনের উৎস ও প্রয়োজনীয়তা - শর্করার উৎস ও প্রয়োজনীয়তা - স্নেহ বা চর্বি উৎস ও প্রয়োজনীয়তা - ভিটামিনের উৎস ও প্রয়োজনীয়তা - খনিজ লবণের উৎস ও প্রয়োজনীয়তা - পানি - আঁশযুক্ত তন্তু বা রাফেজ সুষম খাদ্য অসুষম খাদ্য ও জঙ্ক খাদ্য খাদ্য সংরক্ষণ প্রাথমিক চিকিৎসা - প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণ, প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা স্বাস্থ্যবিধি রোগ বয়ঃসন্ধিকালীন যত্ন	
৪	পদার্থ ও শক্তি পদার্থের বৈশিষ্ট্য পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ ধাতু ও অধাতু শক্তির উৎস শক্তির বিভিন্ন রূপ ও রূপান্তর শক্তির সংরক্ষণ	

৫	প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদ কী? বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব	
৬	আমাদের মহাবিশ্ব, আবহাওয়া এবং জলবায়ু মহাবিশ্বের বিস্তৃতি সূর্য ও সৌরজগত আমাদের বাসভূমি পৃথিবী পৃথিবীর আঙ্গিক গতি ও বার্ষিক গতি আবহাওয়া ও জলবায়ু আবহাওয়ার পরিবর্তন জলীয়বাষ্প, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘ, শিশির ও বৃষ্টিপাত বিরূপ আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ জলবায়ুর পরিবর্তন বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ	
৭	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ তথ্য প্রযুক্তি তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের উপায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা	

অধ্যায় ১

আমাদের পরিবেশ



আমাদের জীবন আমাদের পরিবেশের সাথে জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। আমরা এই পরিবেশে বেঁচে আছি; পরিবেশ ভাল থাকলে আমরা ভাল থাকি। আবার পরিবেশের ভাল থাকা না থাকা নির্ভর করছে আমাদের ওপর। এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা জানবেন আমাদের পরিবেশের সাথে আমাদের জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক কী? শিক্ষার্থীরা জানবেন পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, জীবের বৈশিষ্ট্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য, জীবের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান, উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যজাল ও শক্তির প্রবাহ সম্পর্কে।

অনুসন্ধান ১.১: পরিবেশ ও পরিবেশের উপাদান

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ (Invitation to Inquiry)

আমাদের চারপাশে রয়েছে নানা বস্তু ও ঘটছে নানা ঘটনা। এসব কিছু মিলেই আমাদের পরিবেশ। চলুন তো আমরা জানার চেষ্টা করি, পরিবেশ কী এবং পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী?

অনুসন্ধান সম্পাদন (Exploration)

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আমাদের চারপাশের পরিবেশে কী কী আছে তা জানা প্রয়োজন। এ কাজটি আপনারা কীভাবে করবেন? একে অপরের সাথে আলোচনা করে কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরি কার্যপ্রণালি এ থেকে ভিন্নতর হতে পারে এবং শিক্ষার্থীরা তা অনুসরণ করতে পারেন)

- ১) নিচে প্রদত্ত ছকের ন্যায় একটি ছক তৈরি করুন।
- ২) শ্রেণিকক্ষে যে সকল জিনিস দেখতে পান সেগুলো ছকে লিপিবদ্ধ করুন।
- ৩) এবারে শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে আপনার চারপাশে যা যা দেখতে পান সেগুলো লিখুন।
- ৪) আপনার কাজ নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ছকটি চূড়ান্ত করুন।

শ্রেণিকক্ষের জিনিস	শ্রেণিকক্ষের বাইরের জিনিস

৫) উপরিউক্ত ছক থেকে উপাদানগুলোর মধ্যে কোনটি মানুষের তৈরি আর কোনটি মানুষের তৈরি নয় তা আলাদা করে নিচের ছকে লিখুন।

মানুষের তৈরি	মানুষের তৈরি নয়

ধারণা গঠন (Concept Formation)

পরিবেশ কী? আমাদের চারপাশে যা যা আছে সবকিছু মিলেই পরিবেশ। আপনার চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে কী পেলেন? এগুলোকে কীসের ভিত্তিতে আপনারা ভাগ করেছেন? মানুষের তৈরি পরিবেশকে কী বলা যায়? আর প্রকৃতির তৈরি পরিবেশকে কী বলা যায়?

ধারণা প্রয়োগ (Application of Concept)

আপনারা দেখলেন পরিবেশের উপাদানের মধ্যে কিছু উপাদান আছে যা মানুষের তৈরি। আবার কিছু উপাদান আছে যেগুলো মানুষের তৈরি নয়। এদের কোনটি কোন ভাগে পড়ে তা কীভাবে নির্ধারণ করবেন?

পরিবেশ ও পরিবেশের উপাদান সংক্রান্ত ধারণা পরিবর্ধন

পরিবেশ কী?

আমরা একই সঙ্গে দুইটি জগতে বাস করি:

- প্রকৃতিজগত যা উদ্ভিদ, প্রাণী, মাটি, পানি, বায়ু, পানি ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।
- মানবসৃষ্ট জগত যা সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রযুক্তিজগত ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী নিয়ে গঠিত।

উপরিউক্ত দুই ধরনের জগতের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে পরিবেশ। মনে রাখতে হবে এ পরিবেশ নিষ্ক্রিয় বা স্থবির নয়; বরং এ পরিবেশের প্রতিটি উপাদান পরস্পরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করছে সবসময়।

আমাদের পরিবেশের উপাদান

পরিবেশের উপাদানগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে যেগুলো মানুষের তৈরি নয় সেগুলো প্রাকৃতিক উপাদান, যা নিয়ে গড়ে ওঠে প্রাকৃতিক পরিবেশ। আর মানুষের তৈরি উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত হয় মানুষ সৃষ্ট পরিবেশ। আমরা যে পরিবেশে বসবাস করি তাতে এই দুই ধরনের পরিবেশই রয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ: আমাদের চারপাশে রয়েছে গাছপালা, পশুপাখি, সূর্যের আলো, মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি। এগুলো আমরা তৈরি করতে পারি না। প্রাকৃতিক উপায়ে এসব তৈরি হয় এবং এদের নিয়েই গঠিত হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ।

মানবসৃষ্ট পরিবেশ: আমরা অনেক রকমের জিনিস তৈরি করি। ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, টেবিল-চেয়ার, কাপড়চোপড় ইত্যাদি। রাস্তাঘাট, বাস, ট্রেন, নৌকা ইত্যাদি নানান বস্তু রয়েছে যা মানুষের তৈরি। মানুষের তৈরি এ সকল উপাদান নিয়েই গঠিত হয় মানবসৃষ্ট পরিবেশ।



চিত্র ১.১: প্রাকৃতিক পরিবেশ



চিত্র ১.২: মানবসৃষ্ট পরিবেশ

অনুসন্ধান ১.২: জড় ও জীবের বৈশিষ্ট্য

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

আমাদের চারপাশে পরিবেশে গাছপালা, পশুপাখি, ঘরবাড়ি, পুকুর ইত্যাদি নানা উপাদান রয়েছে। বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে আমরা পড়াশুনা করি। এখানে আছে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, দরজা, জানালা ইত্যাদি। চারপাশে আমরা যা যা দেখি সেগুলোকে জড় ও জীব এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। চলুন দেখি জীব ও জড় উপাদানের মধ্যে আমরা কী কী বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য নিরূপন করতে পারি?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: জড় ও জীবের বৈশিষ্ট্য ও এদের মধ্যে পার্থক্য জানতে হলে কী কী কাজ করবেন এবং কীভাবে করবেন? সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

- ১) চারপাশের পরিবেশের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করুন।
- ২) পর্যবেক্ষণ শেষে বিভিন্ন উপাদানের মধ্য থেকে তিনটি করে জীব ও জড়বস্তু নির্বাচন করুন।
- ৩) নির্বাচিত জীব ও জড়বস্তুসমূহ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। আপনি এদের মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য আলাদা করতে পারেন? নিচের ছকটি পূরণ করুন।

জীবের বৈশিষ্ট্য	জড়ের বৈশিষ্ট্য

- ৪) পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে জড় ও জীব উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্য ও এদের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে তা সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করুন।
- ৫) আমরা কীভাবে জড়বস্তুর উপর নির্ভরশীল তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করুন।

মানুষ যেভাবে জড়বস্তুর উপর নির্ভরশীল

- ৬) তৈরিকৃত ছকটি নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন এবং আলোচনার ভিত্তিতে ছকটি পূরণ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করুন।

ধারণা গঠন

পরিবেশের জড় ও জীব পর্যবেক্ষণ করে এদের মধ্যে কোনো মিল বা অমিল পেয়েছেন কি? এই মিল অমিলগুলো থেকে জীব ও জড়ের পার্থক্য সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় কি? জীব ও জড় কীভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল? আপনাদের সম্পাদিত কাজ ও আলোচনার ভিত্তিতে প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করুন।

ধারণা প্রয়োগ

আপনারা চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন জড় ও জীবের পার্থক্য রয়েছে। আপনাদের জানা আরো কয়েকটি জড় ও জীব উপাদানের নাম উল্লেখ করুন। কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবেন? আপনাদের উল্লেখকৃত জীব উপাদানগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি উপাদান বেছে নিন। পরিবেশের এই উপাদানগুলোকে আপনি কেন জীব হিসেবে অভিহিত করবেন? জীবের বেঁচে থাকার জন্য জড়বস্তু কেন প্রয়োজন?

ধারণা পরিবর্তন: জীব ও জড়ের বৈশিষ্ট্য

জীব ও জড়

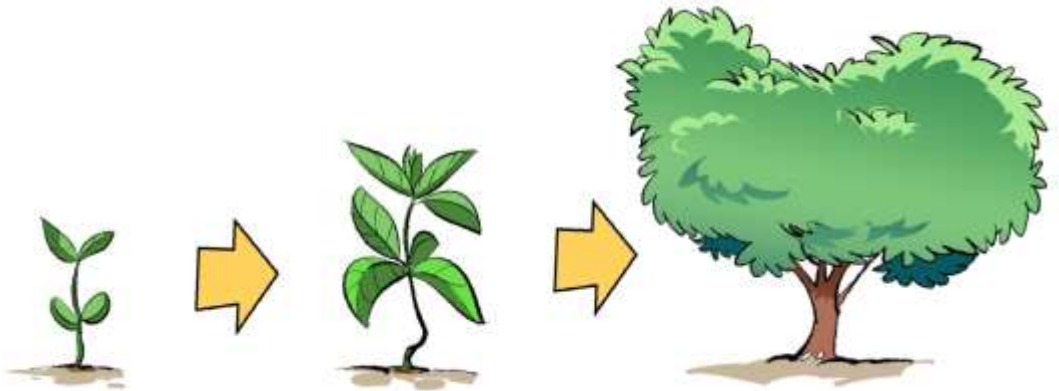
পরিবেশের উপাদানগুলোকে আমরা জীব ও জড় এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। আপনিসহ সকল মানুষ জীব। আবার আপনি যে চেয়ারে বসেন কিংবা মাটির ওপর হাটাহাটি করেন তা জড়।

জীব

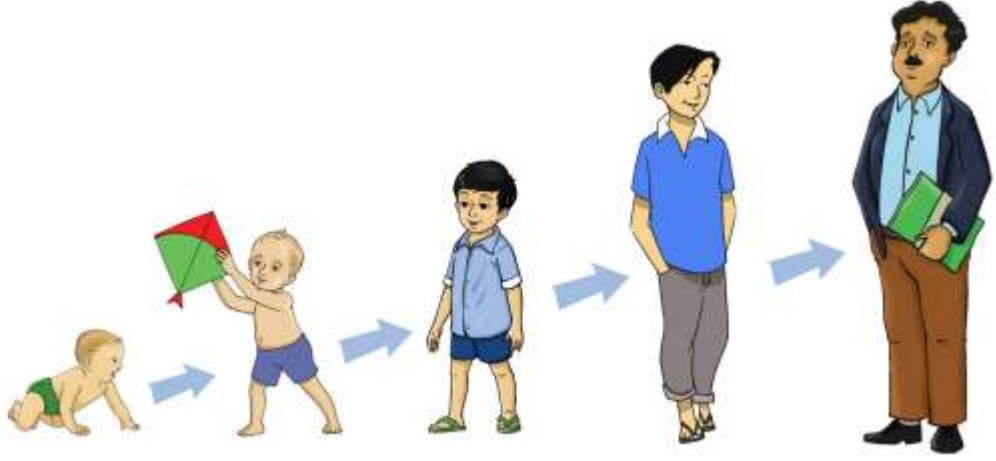
মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদি জীব। জীবের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, পানি এবং বায়ুর অক্সিজেন প্রয়োজন। নিচে জড় পদার্থ থেকে জীবকে আলাদা করা যায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল।

জীবের বৈশিষ্ট্য

- ১) **নড়ন ও চলন:** জীব নড়াচড়া করে। জীবের এ নড়াচড়াকে নড়ন বলে। জীবের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়াকে চলন বলে। মানুষ, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ, মাছ ইত্যাদির চলন সহজে দেখা যায়। গাছপালা মাটিতে এক জায়গায় স্থির থাকে। কিন্তু এদের দেহের অংশবিশেষ যেমন – শিকড়, ডালপালা, আকর্ষী ইত্যাদি নড়াচড়া করে। অণুবীক্ষণিক খাদ্য গ্রহণ, বাসস্থানের সন্ধান, আত্মরক্ষা ইত্যাদির জন্য উদ্ভিদকে নড়াচড়া করতে দেখা যায়। কিছু কিছু উদ্ভিদ নড়াচড়া করে জৈবিক কাজ সম্পন্ন করে।
- ২) **অনুভূতি:** জীব সাড়া দেয়, অর্থাৎ তাদের অনুভূতি আছে। যেমন – লজ্জাবতীর পাতা স্পর্শ করলে নুয়ে পড়ে। শামুককে স্পর্শ করলে দেহকে খোলসের ভিতরে গুটিয়ে নেয়। আমাদের পায়ে কাঁটা ফুটলে পা দ্রুত সরিয়ে নেই। অনুরূপভাবে উদ্ভিদ আলো ও তাপের উপস্থিতি বুঝতে পারে।
- ৩) **খাদ্য গ্রহণ:** শক্তি উৎপাদন, দৈহিক বৃদ্ধি ও দেহের ক্ষয়পূরণের জন্য জীব খাদ্য গ্রহণ করে। মানুষের মতো গরু, ছাগল, মাছ, হরিণ, বাঘ সবাই কোনো না কোনো খাদ্য গ্রহণ করে। উদ্ভিদ শর্করা জাতীয় খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে। খাদ্য তৈরির জন্য তারা পানি ও কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। এরপর ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে সূর্যের আলোর সহায়তায় পানি ও কার্বন-ডাই অক্সাইড ব্যবহার করে উদ্ভিদ শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। এই শর্করা উদ্ভিদের শক্তি উৎপাদন এবং দেহ গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ৪) **দৈহিক বৃদ্ধি:** আমরা জানি যে, গাছপালা, মানুষ, পশু-পাখি সকলেই ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়। দেহের আকার এবং ওজন বৃদ্ধি পায়। জীবের এরূপ আকার এবং ওজন বেড়ে যাওয়াকে বৃদ্ধি বলে। নিচের ছবির সাহায্যে জীবের বৃদ্ধি ভালো বোঝা যায়।



চিত্র ১.৩: উদ্ভিদের বৃদ্ধি- চারা থেকে ছোট গাছ, তারপর বড় গাছ



চিত্র ১.৪: মানুষের বৃদ্ধি- শিশু বড় হয়ে পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হওয়া

- ৫) **শ্বসন:** শ্বসন প্রতিটি জীবের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। শ্বসন হলো শক্তি উৎপাদনকারী কতিপয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমষ্টি। জীব অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং এ অক্সিজেনের সাহায্যে খাদ্য থেকে শক্তি, পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে। জীব বিভিন্ন কাজে উৎপাদিত শক্তি ব্যবহার করে এবং পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। শ্বসন ছাড়া কোনো জীব বাঁচতে পারে না।



- ৬) **রেচন:** জীবদেহে খাদ্যকে কাজে লাগানোর পরে বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় বা বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। আর বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে রেচন প্রক্রিয়ায় বের হয়ে যায়। যেমন- মানুষ রেচন প্রক্রিয়ায় প্রশ্রাবের মাধ্যমে ইউরিয়া বের করে দেয়।
- ৭) **প্রজনন বা বংশবৃদ্ধি:** জীব বংশবৃদ্ধি করে। বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে প্রজনন বলে। যেমন- গাছের বীজ থেকে চারাগাছ জন্মায়। বিভিন্ন পাখি ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ডিম পাড়ে, পরে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। অপরদিকে মানুষ, গরু, ছাগল, বিড়াল ইত্যাদি বাচ্চা প্রসব করে। প্রজননের মাধ্যমে জীবনের ধারা বজায় থাকে।
- ৮) **মৃত্যু:** জীবের জীবনকাল সীমিত। জীব চিরদিন বেঁচে থাকে না। অর্থাৎ জীবের মৃত্যু হয়। জীবের জীবনকালকে শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য এ তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। জীব শৈশবে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, যৌবনে প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। তারপর একদিন জীব তার জীবনীশক্তি হারিয়ে মারা যায়।

জড়

বই, খাতা, চেয়ার, টেবিল, গাড়ি ইত্যাদি হল জড়। বায়ু, মাটি, পানি এগুলোও জড়। জড় খাবার খায় না, পানি পান করে না, এমনকি এরা বৃদ্ধিও পায় না। এরা নিজের মতো নতুন কোন বস্তু তৈরি করতে পারে না।

সারণি ১.১: জীব ও জড়ের পার্থক্য

জীব	জড়
১। জীব চলতে পারে বা নড়াচড়া করতে পারে।	১। জড় নিজেরা নড়তে বা চলাফেরা করতে পারে না।
২। জীবের অনুভূতি আছে। তাই উদ্ভেজনায় সাড়া দেয়।	২। জড়ের অনুভূতি নেই। তাই উদ্ভেজনায় সাড়া দেয় না।
৩। জীব খাদ্য গ্রহণ করে।	৩। জড় খাদ্য গ্রহণ করে না।
৪। জীব শ্বসনক্রিয়ায় অংশ নেয়।	৪। জড় কোনো শ্বসনক্রিয়ায় অংশ নেয় না।
৫। জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে।	৫। জড় দৈহিকভাবে বাড়ে না।
৬। জীবের রেচন প্রক্রিয়া ঘটে।	৬। জড়ের রেচন প্রক্রিয়া নেই।
৭। জীবের প্রজনন ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ জীব থেকে নতুন জীবের জন্ম হয়।	৭। জড়ের প্রজনন ক্ষমতা নেই।
৮। জীবের যেমন জন্ম হয়েছে, তেমনি মৃত্যুও রয়েছে।	৮। জড়ের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই।

মানুষ যেভাবে জড়বস্তুর উপর নির্ভরশীল

বেঁচে থাকার জন্য মানুষ বিভিন্ন জড়বস্তুর উপর নির্ভর করে। মানুষের শ্বাস গ্রহণের জন্য বায়ু, পান করার জন্য পানি এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টির জন্য খাবার প্রয়োজন। ফসল ফলানো ও বাসস্থান তৈরির জন্য মানুষের মাটি প্রয়োজন। এছাড়া জীবন যাপনের জন্য বাসস্থান, আসবাবপত্র, পোশাক, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রয়োজন। আর এ সকল কিছুই মানুষ জড়বস্তু থেকে পেয়ে থাকে। এভাবে দেখা যায় মানুষ বিভিন্নভাবে জড়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল।

অনুসন্ধান ১.৩: জীবনের জন্য কী প্রয়োজন?

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

সৌরজগতের অন্য কোন গ্রহে কোন জীব নেই, কোন জীব টিকে থাকতে পারে না। তাহলে শুধু এ পৃথিবীতে কেন জীবন রয়েছে? তার মানে, জীবের টিকে থাকার জন্য এমন কিছু প্রয়োজন যা শুধু এ পৃথিবীতে রয়েছে, অন্য কোথাও নেই। জীবের বেঁচে থাকার জন্য তাহলে এমন কী প্রয়োজন?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: জীবের বেঁচে থাকার জন্য কী প্রয়োজন তা জানতে হলে কী কী কাজ করবেন এবং কীভাবে করবেন? কোন একটি জীবকে (উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী) পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যেতে পারে কি? কোন পরীক্ষণের মাধ্যমে বোঝা যাবে কি? সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

- ১) তিনটি ছোট টব নিন। টব তিনটিতে প্রত্যেকটির চার ভাগের তিন ভাগ বেলে দোঁআশ মাটি দিয়ে টবগুলো প্রস্তুত করুন।
- ২) তিনটি (টব ১, টব ২, টব ৩) টবেই ছোলা/সিমের চারা রোপন করুন।
- ৩) নিচের ছক অনুযায়ী টবগুলিতে পানি ও আলোর ব্যবস্থা করুন।

টব ১	প্রতিদিন অল্প পানি দিন, বারান্দায় অল্প রোদে রাখুন
টব ২	প্রতিদিন অল্প পানি দিন, বারান্দায় কাঠের বা মোটা কাগজের তৈরি বাস্তের সাহায্যে ঢেকে দিন
টব ৩	পানি দেবেন না, বারান্দায় অল্প রোদে রাখুন



চিত্র ১.৫: তিনটি ভিন্ন টবে পরীক্ষণ

- ৪) দুই সপ্তাহ পরে টবগুলোতে চারার বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করুন। পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত তথ্য নিচের ছকে লিখুন।

টব	উপাদান			পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য
	পানি	রোদ বা সূর্যের আলো	মাটি	
টব ১	প্রতিদিন অল্প পানি	অল্প রোদ	বেলে দোঁআশ	
টব ২	প্রতিদিন অল্প পানি	রোদ পায়নি	বেলে দোঁআশ	
টব ৩	পানি দেওয়া হয়নি	অল্প রোদ	বেলে দোঁআশ	

ধারণা গঠন

কোন টবটিতে চারা সবচেয়ে ভাল বৃদ্ধি পেয়েছে? পাতা সবুজ ও সতেজ দেখাচ্ছে? নিশ্চয়ই টব ১ এর চারা সবচেয়ে ভাল হয়েছে? এবার টব ১ এর উপাদানের সাথে টব ২ এর উপাদানের পার্থক্য চিন্তা করুন। কোন উপাদানটি টব ১ এ আছে কিন্তু টব ২ এ নেই? ঐ উপাদানটি তাহলে উদ্ভিদের জন্য আবশ্যিক, তাই নয় কি? একইভাবে টব ১ এবং টব ৩ এর উপাদানের পার্থক্য চিন্তা করুন। কোন উপাদানটি এক্ষেত্রে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয়?

ধারণা প্রয়োগ

ধরুন আরেকটি টবে কোন মাটি দেওয়া হয়নি; খালি টবেই একটি চারা গাছ রেখে প্রতিদিন অল্প পানি দেওয়া হয়েছে এবং বারান্দায় অল্প রোদে রাখা হয়েছে। দু'সপ্তাহ পরে কী ঘটবে? এ পরীক্ষণ থেকে কী বোঝা যাবে উদ্ভিদের জন্য আর কী প্রয়োজন?

ধারণা পরিবর্তন: জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান

জীবের চাহিদা

এ মহাবিশ্বে অনেক গ্রহ উপগ্রহ থাকলেও পৃথিবী ছাড়া এখন পর্যন্ত কোথাও জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। অথচ পৃথিবীতে কোটি কোটি ধরনের জীব রয়েছে। এর কারণ জীবের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে। নিচে এ উপাদানগুলো আলোচনা করা হল।

পানি: সকল জীবের জন্য পানি অপরিহার্য। জীব দেহে বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়া পানিতে হয়ে থাকে। মানুষের শরীরে প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগই পানি। উদ্ভিদ পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ (শর্করা) তৈরির মাধ্যমে সূর্যের আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ দেহের শর্করা প্রাণী গ্রহণ করে। শর্করা উদ্ভিদ ও প্রাণীর শক্তির যোগানদায়ী খাদ্য।

পানি + কার্বন ডাই অক্সাইড + সূর্যের আলো $\longrightarrow$ গ্লুকোজ (শর্করা) + অক্সিজেন

সূর্যের আলো: সূর্যের আলো পৃথিবীর সকল শক্তির উৎস। সূর্যের আলোর শক্তি সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ দেহে শর্করার মধ্যে সঞ্চিত হয়। প্রাণী উদ্ভিদ থেকে শর্করা জাতীয় খাদ্য পায়। প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়েই শ্বসনের মাধ্যমে অক্সিজেন ব্যবহার করে খাদ্য থেকে শক্তি উৎপাদন করে বেঁচে থাকে।

কার্বন ডাই অক্সাইড: সূর্যের আলোর শক্তি শর্করা (গ্লুকোজ) তৈরির মাধ্যমে সংগ্রহ করার জন্য সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করে।

অক্সিজেন: বেঁচে থাকার জন্য জীবের অক্সিজেন প্রয়োজন। শ্বসনের মাধ্যমে খাদ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের জন্য জীব অক্সিজেন ব্যবহার করে।

খনিজ পদার্থ: পৃথিবীর মাটিতে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ রয়েছে। জীবের জৈবিক প্রক্রিয়ায় এ খনিজ লবন প্রয়োজন। উদ্ভিদ তাদের মূলের সাহায্যে খনিজ লবন গ্রহণ করে। প্রাণী উদ্ভিদ বা অন্যান্য প্রাণী দেহ ভক্ষণের মাধ্যমে খনিজ লবন পেয়ে থাকে।

তাপমাত্রা বা উষ্ণতা: জীবের টিকে থাকার

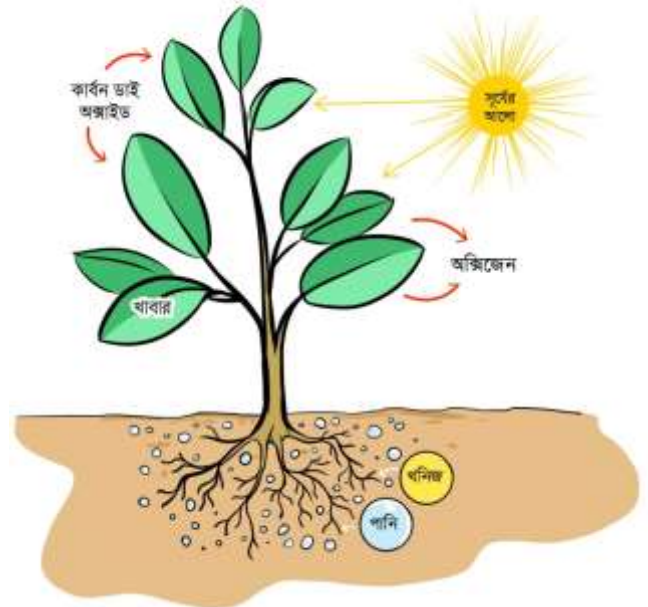
জন্য অনুকূল তাপমাত্রা বা উষ্ণতা

আবশ্যিক কারণ জীবের জৈব রাসায়নিক

প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখা দরকার।

পৃথিবী সূর্য থেকে তাপ পায় এবং

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান তাপ ধরে রাখে, তাই পৃথিবীতে জীব টিকে থাকতে পারছে।



চিত্র ১.৬: উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান

অনুসন্ধান ১.৪: উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য

অনুসন্ধানের আমন্ত্রণ

আপনাদের চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন এতে জড় উপাদানের পাশাপাশি অনেক ধরনের জীব উপাদান রয়েছে। এই জীব উপাদানের মধ্যে সব জীব উপাদান কি একই রকম? কী কী ধরনের জীব আপনাদের পরিবেশে রয়েছে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: পরিবেশে বিভিন্ন জীবের বসবাস। আপনারা জানেন জীবের মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই রয়েছে। এ সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য কী তা জানা প্রয়োজন। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে আপনারা কীভাবে করবেন? কাজটির জন্য সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালী

- ১) আপনার পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করুন।
- ২) আপনার নিকট পরিবেশের কয়েকটি ভিন্ন প্রজাতির ছোট ও বড় উদ্ভিদ এবং কয়েকটি ভিন্ন প্রজাতির ছোট ও বড় প্রাণীর নাম উল্লেখ করে তাদের একটি তালিকা তৈরি করুন।
- ৩) এবার নিচের ছকের ন্যায় একটি ছক অঙ্কন করুন।

উদ্ভিদ	প্রাণী

- ৪) আপনার করা তালিকার উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে যে সকল পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে আলোচনা করে ছকটি পূরণ করুন।

ধারণা গঠন

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই জীব। কিন্তু এরা কি একই রকম? আপনাদের নিকট পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করে কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য দেখতে পেলেন?

ধারণা প্রয়োগ

আপনারা দেখলেন উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আপনার পরিবেশের পরিচিত কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করে তাদের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য রয়েছে সেগুলো উল্লেখ করে চার্টে প্রদর্শন করুন।

ধারণা পরিবর্ধন: উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

উদ্ভিদ ও প্রাণী: সাধারণভাবে জীবদেরকে উদ্ভিদ ও প্রাণী-এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। জীবদের মধ্যে যারা কার্বন-ডাই অক্সাইড, পানি ও সূর্যের আলোর সাহায্যে নিজেদের জন্য শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে তাদের বলা হয় উদ্ভিদ। আর জীবদের মধ্যে যারা নিজেরা খাদ্য উৎপন্ন করতে পারে না, খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে তাদের প্রাণী বলা হয়। উদ্ভিদে ক্লোরোফিল আছে বলে এরা নিজেরা খাদ্য তৈরি করতে পারে।

- ১) **উদ্ভিদ:** বেশিরভাগ উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটিতে আটকে থাকে। এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাচল করতে পারে না। উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা ইত্যাদি রয়েছে।

পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদ বিভিন্নভাবে জড়বস্তুর উপর নির্ভর করে। যেমন- সূর্যের আলো, পানি, মাটি, বায়ু ইত্যাদি উদ্ভিদের জন্য আবশ্যিক। উদ্ভিদ সূর্যের আলো, পানি ও বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করে নিজেদের শর্করা জাতীয় খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে। সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোষস্থ ক্লোরোপ্লাস্ট নামক অঙ্গাণুতে ঘটে। সবুজ বর্ণের উদ্ভিদে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। প্রাণীদের ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না তাই প্রাণী শর্করা জাতীয় খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না।

- ২) **প্রাণী:** চলাচলের জন্য প্রাণীদের পা, ডানা বা পাখনা থাকে। অধিকাংশ প্রাণী নিজের ইচ্ছামতো চলাচল করতে পারে। তবে প্রাণীরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে না। প্রাণী খাদ্য হিসেবে উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণী খেয়ে থাকে। প্রাণীদের চোখ, কান, মুখ ইত্যাদি আছে। এগুলো ব্যবহার করে প্রাণী দেখতে পায়, শুনতে পায় ও স্বাদ নিতে পারে।

অনুসন্ধান ১.৫: উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

আমাদের চারপাশের উদ্ভিদগুলো দেখতে কেমন? সব উদ্ভিদ কি দেখতে একরকম? না এদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে? কী কী ধরনের উদ্ভিদ আপনাদের পরিবেশে রয়েছে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: পরিবেশে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ রয়েছে। বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় কীভাবে? কাজটির জন্য সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি

- ১) বাইরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে ৫টি বড় উদ্ভিদ ও ৫টি ছোট উদ্ভিদের নাম লিখুন।
- ২) ফুল ও ফল হয় এমন ২টি উদ্ভিদের নাম লিখুন।
- ৩) ফুল ও ফল হয়না এমন ২টি উদ্ভিদের নাম লিখুন।
- ৪) প্রদত্ত উদ্ভিদের নমুনা (যাদের ফুল ও ফল হয় না এমন উদ্ভিদ যেমন শৈবাল, ছত্রাক, মস, ফার্ণ, ব্যাঙের ছাতা) পর্যবেক্ষণ করুন এবং নিচের ছকটি পূরণ (টিক চিহ্ন দিয়ে) করুন।

নমুনার নাম	দেহ মূল, কাণ্ড, পাতায় বিভক্ত	দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত নয়	দেহের রঙ সবুজ	দেহ সবুজ নয়
শৈবাল				
ব্যাঙের ছাতা				
মস				
ফার্ণ				

- ৫) পর্যবেক্ষণকৃত উদ্ভিদসমূহকে তাদের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিতে ভাগ করুন।

- ৬) প্রদত্ত ফলযুক্ত উদ্ভিদের ফল ও বীজ (যেমন, সিম/টেঁড়স/বাদাম) কিংবা তাদের ছবি (নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ) পর্যবেক্ষণ করে বৈশিষ্ট্য লিখুন। বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাদের শ্রেণিবিভাগ করুন।

- ৭) প্রদত্ত বাদাম ও ধান বীজ পর্যবেক্ষণ করুন। উভয় ধরনের বীজত্বক আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করুন। তাদের বীজপত্র বোঝা যায় কি? কোনটির কয়টি বীজপত্র রয়েছে?

ধারণা গঠন

উদ্ভিদসমূহকে কী কী শ্রেণিতে ভাগ করা যায়? ফুল হয় কি হয় না এর ভিত্তিতে উদ্ভিদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? ফুল ও ফল হয় এরকম উদ্ভিদকে কী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়? কী কী ভাগে?

ধারণা পরিবর্ধন: উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস

আমরা শহরে অথবা গ্রামে সর্বত্রই আমাদের চারপাশে নানান ধরনের উদ্ভিদ দেখতে পাই। গ্রামে আমাদের বাড়ির চারপাশে, রাস্তার ধারে অথবা শহরে ফুলের টবে অনেক ধরনের উদ্ভিদ আমরা দেখতে পাই। এদের কোনোটা এমন ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখা যায় না। আবার এমন বড় উদ্ভিদ আছে যা দূর থেকে দেখা যায়। এসব উদ্ভিদের মধ্যে কতগুলোর ফুল-ফল হয় এবং কতগুলোর ফুল-ফল কিছু হয় না। আবার এমন উদ্ভিদ আছে যাদের মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না। বর্তমানে পৃথিবীতে উদ্ভিদের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষের মতো। অসংখ্য ও বিচিত্র উদ্ভিদরাজিকে সহজে জানার জন্য একটি সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা হয়। এ পদ্ধতিই উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস নামে পরিচিত। শ্রেণিবিন্যাসের পর কোনো একটি শ্রেণির একটি সদস্যকে ভালোভাবে জানতে পারলে ঐ শ্রেণির অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে জানা যায়।

ক) অপুষ্পক উদ্ভিদ

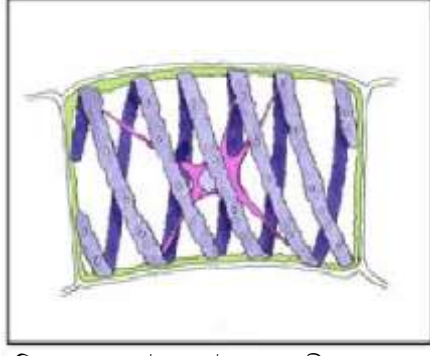
আমাদের বাড়ির আশেপাশে আমরা যদি উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরা দেখব কতগুলো উদ্ভিদের ফুল হয় না। আবার কতগুলো উদ্ভিদের ফুল হয়। বৈজ্ঞানিকভাবে যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় সে অনুসারে প্রথম ধরনের উদ্ভিদকে বলে অপুষ্পক উদ্ভিদ। এখন আপনি বাড়ির পাশ, বিদ্যালয়ের পাশ থেকে এমন কিছু উদ্ভিদ সংগ্রহ করে নিয়ে আসুন। যথা-ফার্ন, মস, ব্যাঙের ছাতা ইত্যাদি। এ অপুষ্পক উদ্ভিদ আবার তিন প্রকার। যথা- (১) সমাঙ্গবর্গ, (২) মসবর্গ এবং (৩) ফার্নবর্গ

সমাঙ্গবর্গ: এ দলের উদ্ভিদগুলো এককোষী বা বহুকোষী এবং ক্লোরোফিলযুক্ত বা ক্লোরোফিলবিহীন হয়ে থাকে। এদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না। যেসব উদ্ভিদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না সেসব উদ্ভিদকে সমাঙ্গবর্গ উদ্ভিদ বলে। সমাঙ্গবর্গীয় উদ্ভিদকে আবার দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে; যথা-(১) শৈবাল এবং (২) ছত্রাক।

১। শৈবাল : আপনার বাড়ির পাশে আবদ্ধ জলাশয়, জমে থাকা বৃষ্টির পানি, নর্দমা, কলের পাড়ে, স্যান্ডসেঁতে মাটিতে সবুজ শেওলা জন্মে থাকে। এসব শেওলা জাতীয় উদ্ভিদকে শৈবাল বলে। এদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে বলে এরা সবুজ হয়। এসব উদ্ভিদ ক্লোরোফিলের সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করতে পারে। এরা এককোষী বা বহুকোষী হয়ে থাকে। যেমন-স্পাইরোগাইরা ও ক্লোরেলা।

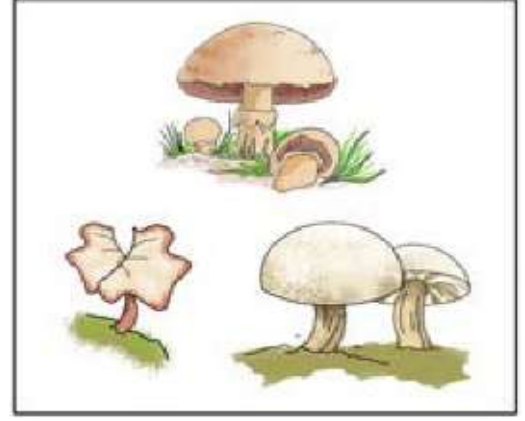


চিত্র: ১.৭ শৈবাল



চিত্র ১.৮: স্পাইরোগাইরা (অণুবীক্ষণ যন্ত্রে)

২। ছত্রাক : পচা, সঁাতসেঁতে জায়গা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় আপনারা ব্যাঙের ছাতা জন্মাতে দেখে থাকবেন। এ ব্যাঙের ছাতার আরেকটি নাম হলো অ্যাগারিকাস। বাসি, পচা রুটির উপর তুলার অংশের মতো একপ্রকার বস্তু জন্মাতে দেখা যায়, এদের বলে রুটির ছত্রাক বা মিউকর। এরা ক্লোরোফিলবিহীন। এ কারণে এদের রং সাদা। ক্লোরোফিল নেই বলে এরা নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করতে পারে না। তাই এরা পরভোজী। যে সকল সমাঙ্গবর্গ উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল নেই, তাদেরকে ছত্রাক বলে। যেমন-অ্যাগারিকাস ও মিউকর।



চিত্র: ১.৯ অ্যাগারিকাস/ব্যাঙের ছাতা

মসবর্গ

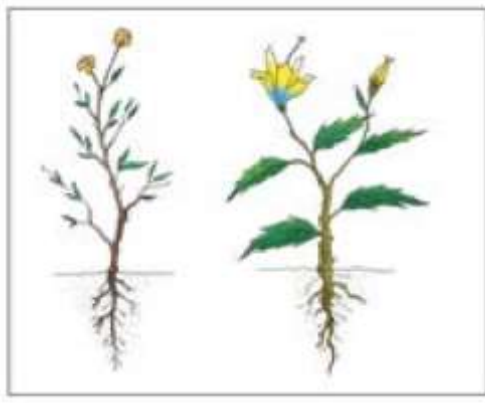
ছায়াযুক্ত সঁাতসেঁতে মাটি, পুরনো দেয়াল ও ছাদ, পুরনো ইট, পুরনো গাছের কাণ্ড ইত্যাদির উপর একরকম মখমলের মতো উদ্ভিদ জন্মে। এ জাতীয় বেশিরভাগ উদ্ভিদের দেহকে কাণ্ড ও পাতায় ভাগ করা যায়। এদের দেহে মূলের পরিবর্তে চুলের মতো সূক্ষ্ম রাইজয়েড জন্মে। মূলের কাজ রাইজয়েড দিয়ে সম্পন্ন হয়। দেহে ক্লোরোফিল থাকার জন্য এরা নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করতে পারে। যেমন-মস।



চিত্র ১.১০: মস

ফার্নবর্গ

সঁাতসেঁতে ছায়াযুক্ত স্থান এবং পুরনো দেয়ালে এসব উদ্ভিদ ভালো জন্মে। এসব উদ্ভিদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। এ জাতীয় উদ্ভিদ নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। ছায়াযুক্ত অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে এরা সর্বাপেক্ষা উন্নত। যেমন- টেকিশাক।



চিত্র ১.১১ : সপুষ্পক উদ্ভিদ



চিত্র ১.১২ : অপুষ্পক উদ্ভিদ-টেকি শাক

খ) সপুষ্পক উদ্ভিদ

আমাদের বাড়ির চারপাশে রয়েছে বহুবিধ উদ্ভিদ। যেমন-আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল, লিচু ইত্যাদি। এসব উদ্ভিদের ফুল হয় এবং এদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। যে সকল উদ্ভিদের ফুল হয় তাদেরকে সপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। সপুষ্পক উদ্ভিদ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-(১) নগ্নবীজী উদ্ভিদ এবং (২) আবৃতবীজী উদ্ভিদ।

১। নগ্নবীজী উদ্ভিদ

সত্যিকার অর্থে এদের কোনো ফুল হয় না; তবে এরা খাদ্য তৈরি করতে পারে। এদের গর্ভাশয় নেই, তাই ফল হয় না এবং বীজ উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে। সাইকাস ও পাইন নগ্নবীজী উদ্ভিদের উদাহরণ।



চিত্র ১.১৩: পাইন ফল

২। আবৃতবীজী উদ্ভিদ

আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা এসব আবৃতবীজী উদ্ভিদ। সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে এরা সর্বাপেক্ষা উন্নত শ্রেণির। যে সকল উদ্ভিদের ফুল হয়, ফল হয় এবং বীজ ফলের মধ্যে আবৃত অবস্থায় থাকে তাদেরকে আবৃতবীজী উদ্ভিদ বলে। আবৃতবীজী উদ্ভিদ আবার দুই প্রকার। যথা-দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদ।

ক) দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ: আপনি একটি বাদামের বীজের খোসা ছাড়িয়ে ফেলুন। দুইটি বীজপত্র দেখতে পাবেন। আম, জাম, কাঁঠাল, বাদাম, শিম, ছোলা এসব উদ্ভিদের বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে। যে সকল উদ্ভিদের বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে তাদেরকে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে।



চিত্র ১.১৪: বাদাম বীজের দুটি পত্র

খ) একবীজপত্রী উদ্ভিদ: সতর্কতার সাথে একটি ধানের খোসা ছাড়িয়ে চাল বের করুন। লক্ষ্য করুন চালের এক কোণে একটি আলাদা অংশ রয়েছে, একে ভ্রূণ বলে। এ ভ্রূণ থেকেই ধানের চারা গজায়। এতে রয়েছে পাতলা পর্দার মতো একটি বীজপত্র। যে সকল উদ্ভিদের বীজে একটি বীজপত্র থাকে তাদেরকে একবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে। যেমন-নারিকেল, তাল, ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি।



চিত্র ১.১৫: একবীজপত্রী উদ্ভিদের চারা

অনুসন্ধান ১.৬: প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস

অনুসন্ধান আমন্ত্রণ

আমাদের চারপাশে রয়েছে নানা ধরনের প্রাণী। অনেক প্রাণী জলে বাস করে, অনেক প্রাণী স্থলে বাস করে। আবার কোন প্রাণী জলে ও স্থলে বাস করে। আবার মানুষের পিঠে যেমন শিরঃদাঁড়া আছে, এরকম অনেক প্রাণীর শিরঃদাঁড়া বা মেরুদণ্ড আছে। এদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। আবার একদল প্রাণী যেমন কেঁচো, তেলাপোকা - এদের মেরুদণ্ড নেই; এরা অমেরুদণ্ডী প্রাণী। মেরুদণ্ডী প্রাণী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য কী? আবার সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই কি একরকম? না এদেরকে আবার বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: মেরুদণ্ডী প্রাণী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য কীভাবে নির্ণয় করা যায়? মেরুদণ্ডী প্রাণীদেরকে কীভাবে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি

১) মেরুদণ্ডী প্রাণী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর নমুনা (জীবিত কিংবা সংরক্ষণকৃত) কিংবা ছবি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

২) দলে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করুন।

প্রাণীর নাম	মেরুদণ্ড		অন্তঃকক্ষাল		হৃদপিণ্ড		লেজ		চোখ	
	আছে	নাই	থাকে	থাকে না	উন্নত	অনুন্নত	আছে	নাই	সরল	জটিল
চিংড়ি										
কেঁচো										
মাছ										
গরু										
কবুতর										

- ৩) পূরণকৃত ছকের তথ্য বিশ্লেষণ করে অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য দলে আলোচনা করে নির্ণয় করুন।
- ৪) মানুষ, হরিণ, ব্যাঙ, টিকটিকি, কুমির, সাপ, ইলিশ মাছ, মাগুর মাছ, কবুতর, চডুই ইত্যাদির চিত্র পর্যবেক্ষণ করুন। এদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করুন।

ধারণা গঠন

মেরুদণ্ডী প্রাণী কীভাবে অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে আলাদা? পর্যবেক্ষণে কী পাওয়া গেল? সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই কি একরকম? কীভাবে পাখি মানুষের চেয়ে আলাদা? কীভাবে মাছ পাখিদের চেয়ে আলাদা?

ধারণা পরিবর্ধন

প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

আমাদের এ বিশ্বে অসংখ্য এবং বিচিত্র ধরনের প্রাণীর বসবাস। আমাদের নিকট পরিবেশেও আমরা নানা ধরনের প্রাণী দেখতে পাই। চোখে দেখা প্রাণী ছাড়াও চোখে দেখা যায় না এমন প্রাণীও রয়েছে আমাদের চারপাশে। বৈচিত্র্যময় এ প্রাণিজগৎ সম্পর্কে সঠিক তথ্য লাভ করা যায় প্রাণীর গঠন প্রকৃতি সম্পর্কিত তথ্য বিন্যাস করে অর্থাৎ প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করে। যেমন মানুষের ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত সরু অস্থির দ্বারা তৈরি দণ্ড (যাকে আমরা মেরুদণ্ড বলি)। যেসব প্রাণীর এরূপ মেরুদণ্ড রয়েছে তাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলা হয়। তেলাপোকা, চিংড়ি (মাছ নয়), মশা ইত্যাদি প্রাণীর এরূপ কোনো মেরুদণ্ড নেই। এরূপ প্রাণীদের অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দলে ফেলা হয়।

প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস: অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণী

অমেরুদণ্ডী প্রাণী

যেসব প্রাণীর শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড নেই, তাদের অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। যেমন-তেলাপোকা, কেঁচো, চিংড়ি, ঝিনুক, কাঁকড়া, কুমি, মশা, মাছি ইত্যাদি।



চিত্র ১.১৬: অমেরুদণ্ডী প্রাণী - ঝিনুক, মশা, চিংড়ি, কেঁচো, ঘাসফড়িং

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

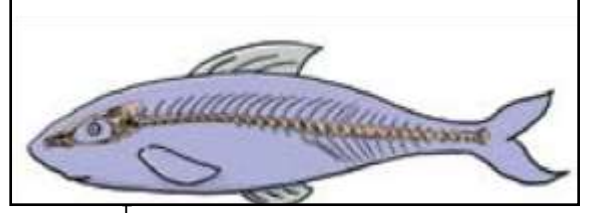
অমেরুদণ্ডী প্রাণীর কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাধারণত এদের –

- মেরুদণ্ড নেই।
- কোনো অন্তঃকক্ষাল থাকে না।

- চোখ সরল প্রকৃতির বা পুঞ্জাক্ষী।
- হৃদপিণ্ড উন্নত ধরনের নয়।
- সাধারণত লেজ থাকে না।

মেরুদণ্ডী প্রাণী

যেসব প্রাণীর শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড আছে তাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। যেমন-গরু, ছাগল, ঘোড়া, হাতি, বানর, বাঘ, সিংহ, ব্যাঙ, মাছ, কুমির, বিড়াল, মহিষ, মানুষ ইত্যাদি।



চিত্র ১.১৭: মাছের মেরুদণ্ড

মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য: নিচে মেরুদণ্ডী প্রাণীর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য করা হলো। সাধারণত এদের –

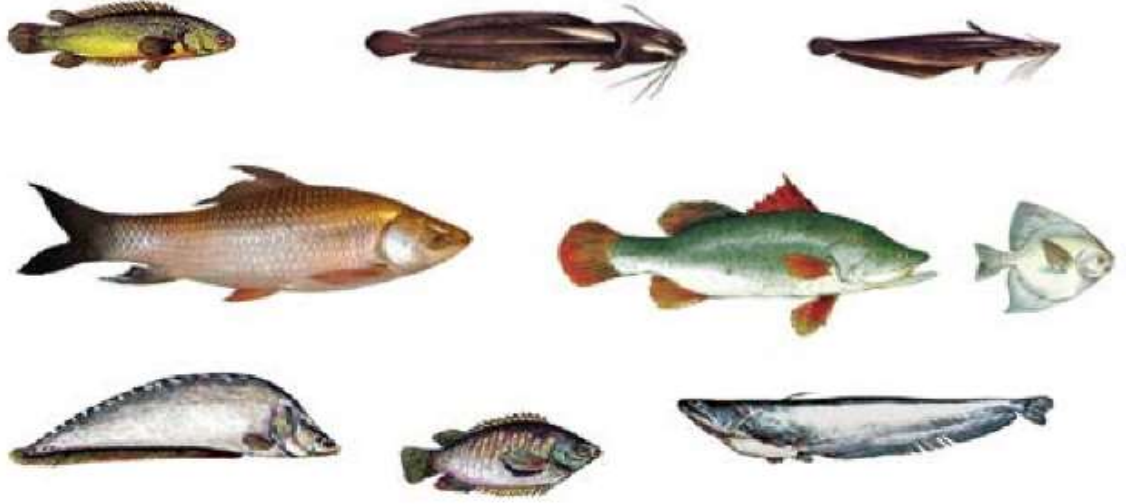
- মেরুদণ্ড আছে।
- স্নায়ুরজ্জু থাকে।
- ফুসফুস বা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।
- অন্তঃকঙ্কাল থাকে।
- হৃৎপিণ্ড উন্নত ধরনের।
- পাখনা বা পা দুই জোড়ার অধিক নয়।
- চোখ সরল প্রকৃতির।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। নিচে প্রত্যেকটি শ্রেণির উদাহরণ ও শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

১। মৎস্যকুল

সকল মাছ এ শ্রেণিভুক্ত। এরা মিঠা ও লোনা পানিতে বাস করে। যেমন-রুই, কাতলা, মৃগেল, শোল, গজার, শিং, কৈ, বোয়াল, পুঁটি, টেংরা, আইড়, রিঠা, কোরাল, রূপচাঁদা, হাঙ্গর ইত্যাদি।



চিত্র ১.১৮: কৈ, মাগুর, শিং, রুই, কোরাল, রূপচাদা, চিতল, তেলাপিয়া, বোয়াল

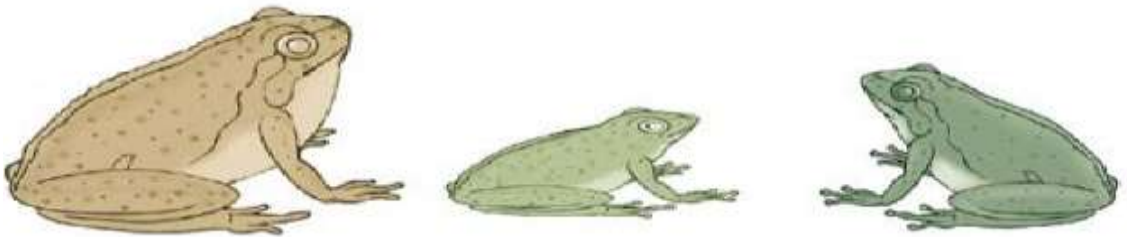
বৈশিষ্ট্য: সাধারণত মাছের -

- গায়ে আঁইশ থাকে। কতগুলোর আঁইশ থাকে না, যেমন-শিং, মাগুর, বোয়াল, টেংরা ইত্যাদি
- ফুলকা আছে, ফুসফুস নেই।
- দেহে জোড় ও বিজোড় পাখনা আছে এবং তা দিয়ে সাঁতার কাটে।
- ফুলকার সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়।
- শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী।
- ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চা হয়।

২। উভচর

যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণী জীবনচক্রের একটি সময় জল এবং স্থল উভয় স্থানে বাস করে তাদের উভচর প্রাণী বলে।

যেমন-সোনা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, গেছো ব্যাঙ, সালামান্ডার ইত্যাদি।



চিত্র ১.১৯: সোনা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, গেছো ব্যাঙ

বৈশিষ্ট্য

- ত্বক নগ্ন। আঁইশ, লোম, পালক কিছুই নেই।

- দুই জোড়া পা আছে। পায়ের আঙুলে নখ নেই।
- ছোট অবস্থায় ফুলকা থাকে। পরিণত ব্যাঙে ফুলকা লুপ্ত হয়ে ফুসফুস গঠিত হয়।
- ঘাড় নেই, মাথা দেহের সঙ্গে যুক্ত।
- ব্যাঙ জিহ্বা দিয়ে শিকার ধরে খাবার গিলে খায়।
- শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী।

৩। সরীসৃপ

যেসব প্রাণী বুকে ভর দিয়ে এবং এর পাশাপাশি আঁইশের সাহায্যে অথবা পা-এর সাহায্যেও চলে তাদেরকে সরীসৃপ বলে। যেমন-সাপ, কচ্ছপ, কুমির, টিকটিকি, কাছিম, গিরগিটি, ঘড়িয়াল, গুঁইসাপ ইত্যাদি।



চিত্র ১.২০: কুমির, সাপ, টিকটিকি, কাছিম

বৈশিষ্ট্য

- এরা বুকে ভর দিয়ে চলে।
- এদের ত্বক আঁইশ বা অন্য কোনো শক্ত আবরণে ঢাকা থাকে।
- সাপসহ আরো কিছু সরীসৃপের পা নেই। বাকিরা পাবিশিষ্ট, এদের আঙুলে নখ থাকে।
- এরা ডিম পাড়ে। কোনো কোনো সাপ সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে।
- এরা ফুসফুস দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়।
- এরা শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী।

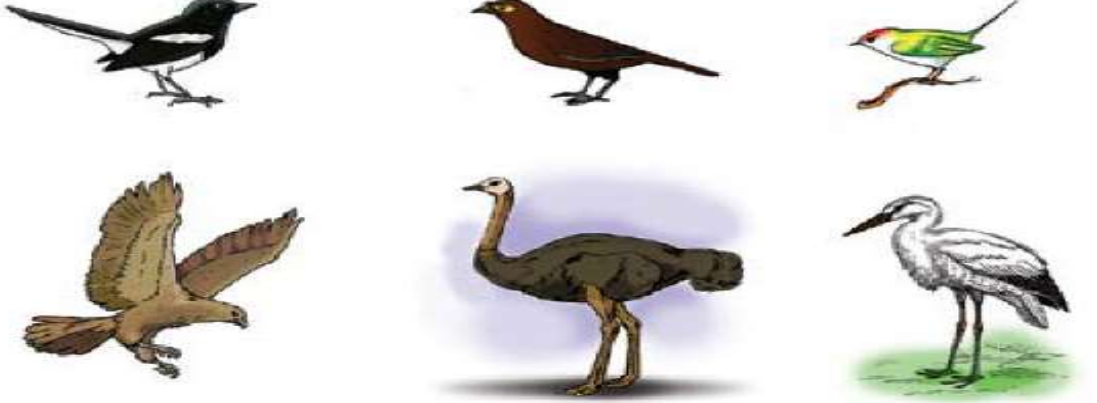
৪। পক্ষীকুল

যে সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর পালক আছে তাদেরকে আমরা পাখি বলি। যেমন-কাক, কোকিল, ময়না, টিয়া, দোয়েল, হাঁস, মুরগি, কবুতর, চড়ুই, বাবুই, চিল, শকুন, শালিক, ঈগল, টুনটুনি, মাছরাঙা, বক, সারস, ময়ূর, কিউই, এমু, উটপাখি ইত্যাদি। কিউই, এমু ও উটপাখি উড়তে পারে না কিন্তু দৌড়াতে পারে।

বৈশিষ্ট্য

- এদের প্রায় সবাই উড়তে পারে।
- দেহ পালক দিয়ে ঢাকা।
- মুখে শক্ত ঠোঁট আছে কিন্তু দাঁত নেই।

- দুইটি পা ও দুইটি ডানা আছে।
- ফুসফুস ও বায়ুথলি আছে।
- এদের বড় হাড়গুলো ফাঁপা ও হালকা।
- উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণী।



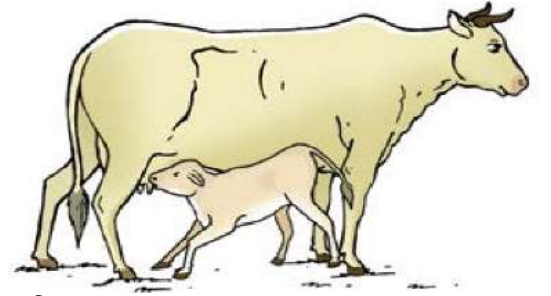
চিত্র ১.২১: দোয়েল, শালিক, টুনটুনি, চিল, উটপাখি, বক

৫। স্তন্যপায়ী

যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণী সন্তান প্রসব করে ও সন্তানরা মায়ের দুধ পান করে তাদেরকে আমরা স্তন্যপায়ী প্রাণী বলি। যেমন-মানুষ, কুকুর, বিড়াল, গরু, মহিষ, ছাগল, বানর, গাধা, ঘোড়া, হাতি, ভালুক, বেজি, বাদুড়, হুঁদুর, নীল তিমি ইত্যাদি।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহে লোম থাকে।
- সন্তান প্রসব করে ও সন্তানেরা মায়ের দুধ পান করে।
- সাধারণত চতুষ্পদী, তবে তিমি ও ডলফিনের মতো কারো কারো পা নেই। শুধু মানুষ দ্বিপদী।
- বহিঃকর্ণবিশিষ্ট।
- আঙুলে নখ থাকে।
- উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণী।



চিত্র ১.২২: গরুর বাছুর দুধ পান করছে

অনুসন্ধান ১.৭ : উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের উপর নির্ভরশীল কিনা তা আপনারা কীভাবে যাচাই করবেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালী

- ১) আপনার নিকট পরিবেশের একটি স্থলজ বাস্তুসংস্থান নির্বাচন করুন এবং বাস্তুসংস্থানে কোন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকতে পারে তা পূর্বানুমান (Predict) করুন।
- ২) এই নির্বাচিত বাস্তুসংস্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাস করে কী?
- ৩) এসব উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তা নিচের ছকের ভিত্তিতে পূরণ করুন।

জীব	কীভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পর নির্ভরশীল
উদ্ভিদ	
প্রাণী	

- তৈরিকৃত ছকটি নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন এবং আলোচনার ভিত্তিতে ছকটি হালনাগাদ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করুন।

ধারণা গঠন

পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে আপনারা কী দেখলেন? পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী কী পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল? কীভাবে?

ধারণা প্রয়োগ

কীভাবে প্রাণী উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল? ছোট ছোট উদ্ভিদ কীভাবে অন্য বড় উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল? আবার ছোট ও বড় প্রাণী কীভাবে উদ্ভিদ ও অন্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল?

ধারণা পরিবর্ধন: উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পর নির্ভরশীলতা

প্রাণী বিভিন্নভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদের ত্যাগ করা অক্সিজেন প্রাণী শ্বাস গ্রহণের সময় ব্যবহার করে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ যেমন- কাণ্ড, শাখা ও ফলমূল প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ আবার অনেক প্রাণীর আবাসস্থল। মানুষ তার বাসস্থান তৈরিতেও উদ্ভিদ ব্যবহার করে। অন্যদিকে, উদ্ভিদ তার খাদ্য তৈরি ও বৃদ্ধির জন্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। খাদ্য তৈরির জন্য উদ্ভিদ প্রাণীর ত্যাগ করা কার্বনডাইঅক্সাইডের উপর নির্ভর করে। এছাড়াও বীজের বিস্তরণ, পরাগায়নের



চিত্র ১.২৩: উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পরের নির্ভরশীলতা

জন্যও উদ্ভিদ প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া আমরা মানুষরাও বিভিন্নভাবে খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর নির্ভরশীল।

অনুসন্ধান ১.৮: জীবের আবাসস্থল

অনুসন্ধান আমন্ত্রণ

আপনারা জেনেছেন জড় ও জীব নিয়েই পরিবেশের সৃষ্টি। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়েই জীব পরিবেশের সৃষ্টি। কোন একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে এই জড় ও জীব উপাদানের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে যা বাস্তুসংস্থান নামে পরিচিত। একই পরিবেশে যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে তাদের বাসস্থান কি একই ধরনের? তাদের বসবাসের জন্য কোন কোন ধরনের আবাসস্থল প্রয়োজন?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিবেশে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন আবাসস্থলের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা দেখা এবং পরিবেশে জড় ও জীবের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করুন।

পরিকল্পনা প্রণয়ন

পরিবেশে বিভিন্ন জীবের আবাসস্থল জানার জন্য আপনারা কী কী কাজ করবেন? এ কাজগুলো কীভাবে করবেন? দলে আলোচনা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি

১. স্থানীয় পরিবেশে জীবের বিভিন্ন আবাসস্থল সনাক্ত করুন।
২. উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে তাদের বাসস্থানসমূহ নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করুন।

উদ্ভিদের নাম	কোথায় দেখা যায়	প্রাণীর নাম	কোথায় বাস করে

৩। তৈরিকৃত ছকটি নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন এবং আলোচনার ভিত্তিতে ছকটি হালনাগাদ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করুন।

ধারণা গঠন

আবাসস্থল কী? প্রাকৃতিক (Natural) এবং পরিবর্তিত (Modified) আবাসস্থল কী? আবাসস্থল বিভিন্ন হওয়ার কারণ কী? আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে আবাসস্থলের উপর কী প্রভাব পড়ে? মানুষ কীভাবে আবাসস্থলের পরিবর্তন ঘটায়?

ধারণা প্রয়োগ

পরিবেশে একটি স্থান নির্বাচন করে সেখানে যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাস তা সনাক্ত করুন। দেখুন সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোন ধরনের ভিন্নতা রয়েছে? এ ভিন্নতা কেন?

ধারণা পরিবর্তন

জীবের আবাসস্থল

সকল জীবের জন্য আবাসস্থল প্রয়োজন। উদ্ভিদ যে জায়গায় জন্মে এবং প্রাণী যে বিশেষ জায়গায় বাস করে তাই তার আবাসস্থল। প্রাণীর আশ্রয়স্থলও প্রয়োজন। আশ্রয়স্থল হল প্রাণীর জন্য একটি নিরাপদ স্থান, যা তাকে আক্রমণকারী প্রাণী বা বিরূপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভিন্নতা বিশেষে তাদের আবাসস্থল জলজ বা স্থলজ উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে।

অনুসন্ধান ১.৯: বাস্তুসংস্থান, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যজাল এবং শক্তির প্রবাহ

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

পরিবেশের জড় ও জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। জড় ও জীব সম্প্রদায়ের এ সম্পর্ককে কী বলা হয়? বেঁচে থাকার জন্য একটি জীব অপর জীবকে খাদ্য হিসেবে গহণ করে। প্রাণী খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর অথবা অন্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতাকে কেন্দ্র করে কীভাবে পরিবেশে খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যজাল এবং শক্তির প্রবাহ ঘটে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: পরিবেশে খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যজাল এবং শক্তি প্রবাহ পর্যবেক্ষণের জন্য কী কী কাজ করবেন এবং কীভাবে করবেন?

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালী

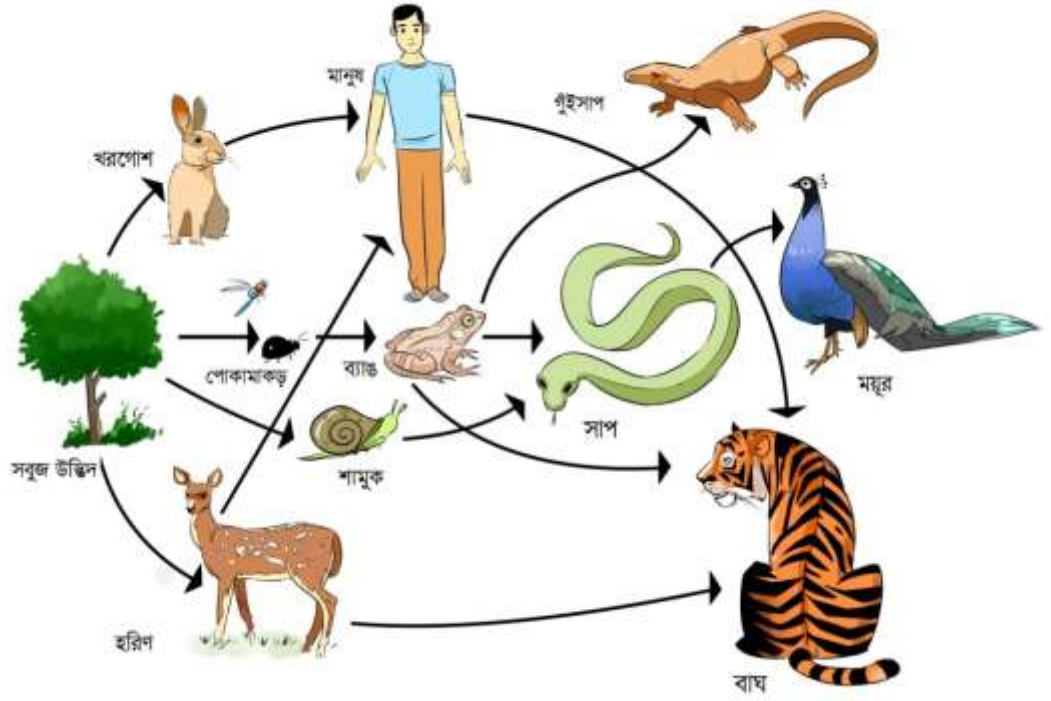
১. পাশের ছবিটি ভাল করে খেয়াল করুন।
২. ছবির প্রাণী ও উদ্ভিদগুলোর মধ্যে কোন সম্পর্ক খুঁজে পান কি? কী ধরনের সম্পর্ক?
৩. এ সম্পর্ক থেকে আপনি কীভাবে খাদ্য শৃঙ্খলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারেন?



কাজ ২:

চিত্র ১.২৪: খাদ্যশৃঙ্খল

- ১। মনোযোগ সহকারে নিচের ছবিটি দেখুন।
- ২। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দলে ভাগ হয়ে খাদ্য শৃঙ্খলের ভিত্তিতে ছবিটি ব্যাখ্যা করুন।
- ৩। খাদ্য শৃঙ্খলগুলো মিলিয়ে দলগতভাবে খাদ্যজালের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
- ৪। আপনার দলের ব্যাখ্যা শ্রেণিতে উপস্থাপন করুন এবং অন্যান্য দলের সাথে আলোচনা করে খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্যজালের ধারণা বিস্তৃত করুন।



চিত্র ১.২৫: খাদ্যজাল

ধারণা গঠন

বেঁচে থাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের জড় ও জীবের মধ্যে কীভাবে সম্পর্ক গড়ে ওঠে? খাদ্য শৃঙ্খল এবং খাদ্যজাল কী? পরিবেশের কীভাবে শক্তি প্রবাহ ঘটে? কোন একটি প্রাণী যদি হঠাৎ করে পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে কী ঘটবে?

পরিবেশে একটি প্রাণী অন্য প্রাণীকে খাওয়ার মাধ্যমে একটি সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যা খাদ্যশৃঙ্খল নামে পরিচিত এবং এই সম্পর্ক যখন একটি জালের মত সৃষ্টি করে তখন সেটি খাদ্যজাল তৈরি করে।

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম কীভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যে কোন একটি বাস্তুসংস্থান পর্যবেক্ষণ করে উদ্ভিদ ও প্রাণীর নির্ভরশীলতা কীভাবে দেখাতে পারবেন? স্টাইরোফোম (Styrofoam) অথবা ককশিট দিয়ে কয়েকটি খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি করুন। এ খাদ্যশৃঙ্খলগুলোকে জালের মতো করে তৈরি করে খাদ্যজাল দেখান।

বাস্তুসংস্থান সম্পর্কিত ধারণা পরিবর্তন

বাস্তুসংস্থান (Ecosystem)

বেঁচে থাকার সবরকম উপাদান আমরা পরিবেশ থেকে পাই। পরিবেশকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—জড় পরিবেশ ও জীব পরিবেশ। জীব ও জড় পরিবেশের সম্বন্ধ নিবিড়। প্রকৃতির জড় ও জীব উপাদানগুলোর

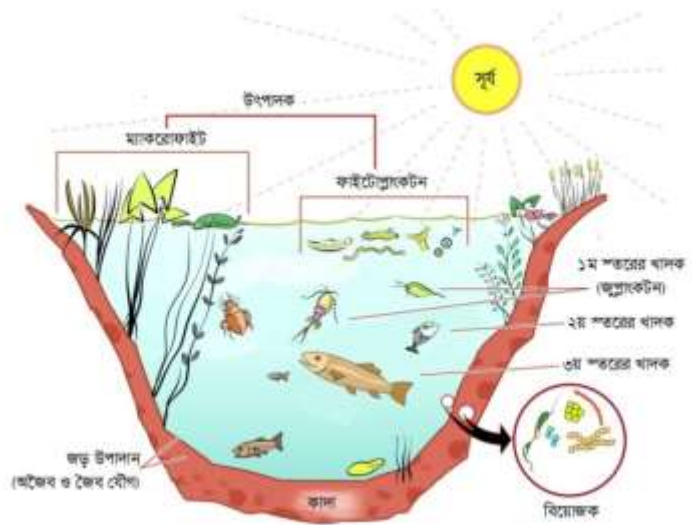
মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলেই পরিবেশে ভারসাম্য বিরাজ করছে। কোনো জিনিসই একেবারে ফুরিয়ে যাচ্ছে না। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাকৃতিক চক্রের কাজের ফলেই এটা সম্ভব হচ্ছে। জড় পরিবেশের মূল উপাদান হচ্ছে মাটি, পানি, বায়ু, আলো ও তাপ। এ উপাদানগুলো জীবের আহার ও আশ্রয় যুগিয়ে থাকে। জীবের বেঁচে থাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় জীব ও জড়ের মধ্যে গড়ে ওঠে নানা রকম সম্পর্ক। কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকার পরিবেশে জীব ও জড় উপাদান এবং তাদের সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গতিময় পদ্ধতিকে বাস্তুসংস্থান বা ইকোসিস্টেম বলে। পরিবেশ অনুসারে বাস্তুসংস্থান প্রধানত দুই রকম। যথা-জলজ বাস্তুসংস্থান এবং স্থলজ বাস্তুসংস্থান। স্থলের বাস্তুসংস্থানের উদাহরণ তৃণভূমির বাস্তুসংস্থান মরুভূমির বাস্তুসংস্থান, অরণ্যের বাস্তুসংস্থান ইত্যাদি। জলজ বাস্তুসংস্থানের মধ্যে পুকুরের বাস্তুসংস্থান, হ্রদের বাস্তুসংস্থান ইত্যাদি হলো মিঠা পানির বাস্তুসংস্থান। সাগর, মহাসাগর এগুলো হলো লবণাক্ত পানির বাস্তুসংস্থান।

একটি পুকুরের বাস্তুসংস্থান বা ইকোসিস্টেম

জলজ বাস্তুসংস্থানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো পুকুর। কারণ পুকুরে বসবাসকারী অজীব ও সজীব উপাদানের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা যায় এবং ভালোভাবে বোঝা যায়। নিম্নের একটি পুকুরের বাস্তুসংস্থান বর্ণনা করা হলো:

১। জড় উপাদান: জড় উপাদানের মধ্যে রয়েছে মাটি, পানি, খনিজ লবণ, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই অক্সাইড। একটি পুকুরের বাস্তুসংস্থানের কার্যকারিতা এসব জড় উপাদানকে জীব উপাদান কেমন করে ব্যবহার করছে তার উপর নির্ভর করে।

২। সজীব উপাদান: বাস্তুসংস্থানের সজীব উপাদানকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়-উৎপাদক, খাদক ও বিয়োজক। নিচে এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-



চিত্র ১.২৬: পুকুরের ইকোসিস্টেম

ক) উৎপাদক : পুকুরের পানিতে ভাসমান ও কিনারায় অগভীর পানিতে জন্মে থাকা সবুজ উদ্ভিদ (যেমন-শেওলা, কচুরিপানা, ক্ষুদিপানা, টোপাপনা ও পানিমরিচ) পুকুরে বাস্তুসংস্থানের উৎপাদক। পানিতে ভাসমান খুদে জীবদের প্লাংকটন বলে। ভাসমান ক্ষুদ্র প্রাণীদের জুয়োপাংকটন বলে। আর সবুজ প্লাংকটন জাতীয় খুদে উদ্ভিদকে বলে ফাইটোপ্লাংকটন (Phytoplankton)। সবুজ জলজ শেওলা ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য প্রস্তুত করে বেঁচে থাকতে পারে, তাই এদের উৎপাদক বলে।

খ) খাদক: জলজ কীটপতঙ্গ, লার্ভা, মাছ, শামুক, বিনুক, ব্যাঙ, বক, গাংচিল, মাছরাঙা ইত্যাদি খাদক পর্যায়াভুক্ত। খাদক স্তরকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

প্রথম স্তরের খাদক:

উদ্ভিদভোজী বিভিন্ন

প্রকার ভাসমান খুদে

পোকা, মশার

শূককীট,

আণুবীক্ষণিক প্রাণী

জুয়োপ্লাংকটন প্রভৃতি

প্রথম স্তরের খাদক।

ভাসমান ক্ষুদ্র

প্রাণীদের

জুয়োপ্লাংকটন বলে।

এ খাদকগুলো নিজের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না এবং সরাসরি উৎপাদককে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে।

দ্বিতীয় স্তরের খাদক: ছোট ছোট মাছ, চিংড়ি, ব্যাঙ, কিছু জলজ প্রাণী দ্বিতীয় স্তরের খাদক। এরা নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না এবং উৎপাদককেও খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে না। এরা প্রথম স্তরের খাদকদের খেয়ে বেঁচে থাকে।

তৃতীয় স্তরের খাদক: যেসব প্রাণী দ্বিতীয় স্তরের খাদক খেয়ে বেঁচে থাকে তারাই তৃতীয় স্তরের খাদক। যেমন-শোল, বোয়াল, চিতল, গজার, ভেটকি প্রভৃতি বড় মাছ, বক, চিল, উদবিড়াল, বাজপাখি, ঈগল ইত্যাদি।

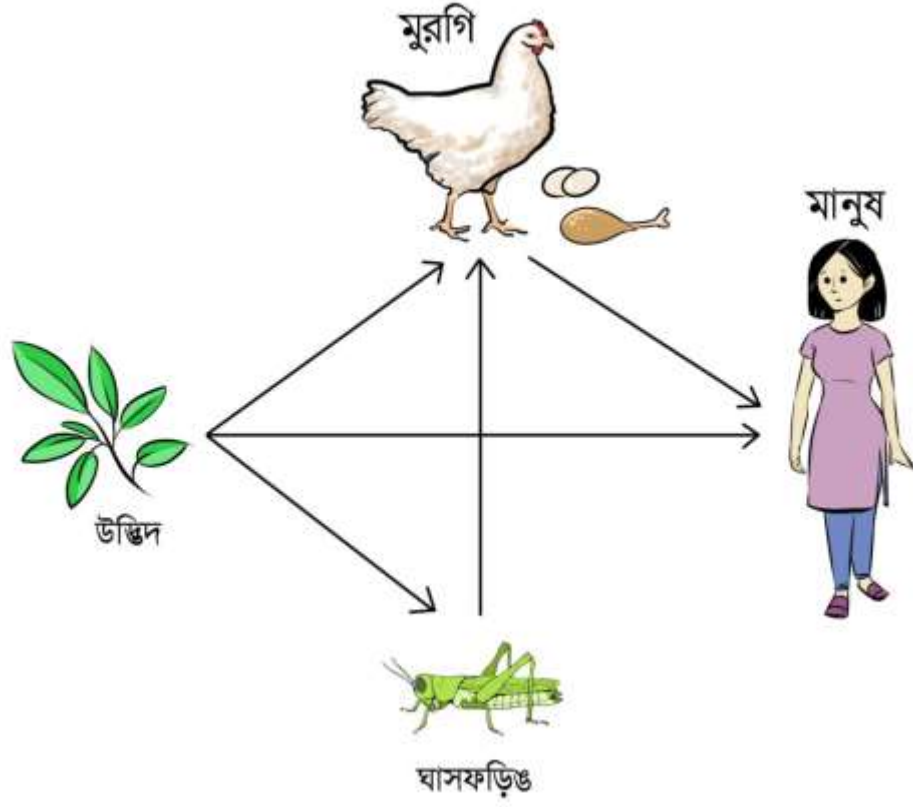
গ) বিয়োজক: পুকুরে বসবাসকারী ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বিয়োজকরূপে কাজ করে। এরা জীবিত অথবা মৃত প্রাণীদের আক্রমণ করে ও পচনে সাহায্য করে, ফলে উৎপাদকের ব্যবহার উপযোগী জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থ পুনরায় সৃষ্টি হয়। এসব বিয়োজিত জৈব ও অজৈব পদার্থ উৎপাদকেরা ব্যবহার করে থাকে। প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে একটি পুকুরের বাস্তুসংস্থানের উপাদানগুলো দেখানো হলো।

খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজাল

আমরা একটু আগেই দেখলাম পুকুরের বাস্তুসংস্থানে খাদ্যের জন্য একে অন্যের উপরে নির্ভর করে। সকল খাদ্য ও শক্তির উৎস সূর্য। সবুজ উদ্ভিদ সূর্যের শক্তিকে খাদ্যে সঞ্চয় করে। এ পৃথিবীতে প্রাণীরা খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ বা ছোট প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। ধরুন, আপনি আজ সকালে ডিম খেয়েছেন। ডিমটি এসেছে মুরগি থেকে। মুরগি শস্যদানা খেয়ে বেড়ে উঠেছে এবং ডিম পেড়েছে। শস্যদানা তৈরি হয়েছে উদ্ভিদে সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে আমরা একটি সরল সম্পর্ক পেলাম।

উদ্ভিদ-মুরগি-মানুষ। এটি একটি খাদ্যশৃঙ্খল।

সবসময় খাদ্যে নির্ভরশীলতার এরকম সরল সম্পর্ক থাকে না। বিভিন্ন সম্পর্ক অর্থাৎ খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পর যুক্ত হয়ে জটিল সম্পর্কে পরিণত হয়। একে খাদ্যজাল বলে। যেমন-উপরের উদাহরণটির ক্ষেত্রেই একটি ঘাসফড়িং উদ্ভিদের পাতা খেতে পারে। মুরগি ঘাসফড়িংটি খেতে পারে। আবার মানুষ ডিম না খেয়ে শস্যদানা খেতে পারে। এভাবে কয়েকটি খাদ্যশৃঙ্খল সমন্বয়ে একটি খাদ্যজাল পাওয়া যায়।



চিত্র ১.২৭: একটি খাদ্যজাল

সকল প্রাণীই শক্তির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ সূর্যের আলো ব্যবহার করে নিজের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে। পোকামাকড় উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে আবার ব্যাঙ পোকামাকড়কে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। একইভাবে সাপ ব্যাঙ খায় এবং ঈগল সাপ খায়। এভাবেই শক্তি উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে প্রবাহিত হয়। বাস্তুসংস্থানে উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে এই শক্তি প্রবাহের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই হল খাদ্য শৃঙ্খল। সবুজ উদ্ভিদ থেকেই প্রতিটি খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু। যেকোনো বাস্তুসংস্থানে অনেকগুলো খাদ্যশৃঙ্খল থাকে। বাস্তুসংস্থানের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী কোন না কোন খাদ্য শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত। একাধিক খাদ্যশৃঙ্খল একত্রিত হয়ে খাদ্যজাল তৈরি করে।

অধ্যায় ২

পরিবেশের উপাদান ও পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশের উপাদান

পরিবেশ মোটা দাগে নিচের অংশসমূহ বা উপাদান নিয়ে গঠিত:

- বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)
- বারিমণ্ডল (Hydrosphere)
- শিলামণ্ডল (Lithosphere)
- জীবমণ্ডল (Biosphere)
- মানবমণ্ডল (Anthrosphere)

উপরিউক্ত অংশগুলির মধ্যে জীবমণ্ডল ও মানবমণ্ডল বাকি তিনটি অংশের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। আবার মানুষ তার কর্মকাণ্ড দ্বারা বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল ও শিলামণ্ডলকে প্রভাবিত করে। আমরা অনুসন্ধানের মাধ্যমে দেখবো মানুষ কীভাবে পরিবেশকে প্রভাবিত করে এবং পরিবর্তিত পরিবেশ মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনকে প্রভাবিত করে।



অনুসন্ধান ২.১: জীবের উপর পরিবেশের প্রভাব

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাস করে। এসকল উদ্ভিদ ও প্রাণী নানা কারণে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। চলুন আমরা জীবের জীবনধারার উপর পরিবেশের কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা জানার চেষ্টা করি।

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: জীবের জীবনধারায় পরিবেশের পরিবর্তনের প্রভাব আমরা কীভাবে যাচাই করতে পারি? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি

কাজ

- ১) প্রথমে চলুন পরিবেশের পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করি।
- ২) নিচের ছকটির মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করুন।

পরিবেশের পরিবর্তন	প্রাকৃতিক কারণ	মানবসৃষ্ট কারণ

- ৩) এবারে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কী কী কারণে পরিবেশ পরিবর্তিত হয় সেগুলো ছকে লিপিবদ্ধ করুন।
- ৪) এসব তৈরিকৃত ছকটি নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন এবং আলোচনার ভিত্তিতে ছকটি হালনাগাদ করুন।
- ৫) এবারে চলুন পরিবেশ পরিবর্তনের এই কারণগুলোর ফলে জীবের জীবনধারা কীভাবে ব্যাহত হয় তা জানার চেষ্টা করি।
- ৬) শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দলে ভাগ হয়ে প্রতিটি দলে নিচের ছকের ন্যায় একটি ছক তৈরি করুন।

উদ্ভিদের জীবনধারায় প্রভাব	পরিবেশের পরিবর্তন	প্রাণীর জীবনধারায় প্রভাব

- ৭) এখন দলগতভাবে আলোচনা করে উপরের ছকটি পূরণ করুন।
- ৮) আপনার দলের ব্যাখ্যা শ্রেণিতে উপস্থাপন করুন এবং অন্যান্য দলের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ছকটি হালনাগাদ করুন।

ধারণা গঠন

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কী কী কারণে পরিবেশ পরিবর্তিত হয়? এ পরিবর্তনের ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারায় কোন প্রভাব পড়ে কি? সেটি কি ধরনের প্রভাব?।

ধারণা প্রয়োগ

পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে জীবের জীবনধারা ব্যাহত হওয়ার ঘটনা আমাদের সমাজে কোন প্রভাব ফেলছে কি? সেটি কেমন?

বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্ধন

উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারায় পরিবেশের প্রভাব

ঝড়, বন্যা এবং খরার মতো প্রাকৃতিক কারণে এবং মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস হচ্ছে। এর ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণী বিপন্ন বা বিলুপ্ত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ থেকে লাল শির ও জাভা গভার এবং রাজ শকুন বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে তালি পাম গাছ ও রয়েল বেঙ্গল টাইগার প্রায় বিপন্ন।

পরিবেশ সংরক্ষণ

আমরা জেনেছি কীভাবে একটি পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাণী ও অন্যান্য উপাদান একে অন্যের উপর নির্ভর করে। পরিবেশের কোনো একটি জড় বা জীব উপাদান যদি বেড়ে যায় বা কমে যায় তাহলে পরিবেশের অন্য উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আপনারা দুটি উদাহরণ বিবেচনা করুন। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে একসময় অনেক খেঁকশিয়াল ও সাপ ছিল। সাপ ও খেঁকশিয়ালেরা ইঁদুর ধরে খেত। বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে বন্যার সময়ে সাপ ও খেঁকশিয়ালদের মেরে ফেলা হয়েছে। ফলস্বরূপ, গ্রামাঞ্চলে এখন ইঁদুরের প্রকোপ অনেক বেড়ে গেছে। ইঁদুর ক্ষেতের ধান খেয়ে ফেলছে। একইভাবে, ফসল ফলাতে বর্তমানে অনেক কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে। সেই কীটনাশক পানিতে মিশছে। আবার, শিল্পকারখানা থেকে রাসায়নিক বর্জ্য পানিতে ফেলা হচ্ছে। ফলে পানিতে বসবাসকারী মাছ ও অন্যান্য জীবের ক্ষতি হচ্ছে। এজন্য মাঝে মাঝে মাছের গায়ে ঘা দেখা যাচ্ছে। সেজন্য মাছের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

উপরের দুটি উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পরিবেশের কোনো একটি উপাদান কমে বা বেড়ে গেলে অন্যদের ক্ষতি হয়। সে কারণে পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য রাখা খুব জরুরি। পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষাই হলো পরিবেশ সংরক্ষণ। পরিবেশের ভারসাম্য প্রাকৃতিকভাবেই সংরক্ষিত হয়ে থাকে। তবে প্রধানত মানুষের নানান কর্মকাণ্ডই পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে থাকে। পরিবেশ সংরক্ষণের মূলনীতি হলো পরিবেশের উপাদানগুলোর ভারসাম্য বজায় রাখা। পরিবেশ সংরক্ষণে নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

জীব উপাদানের ভারসাম্য রক্ষা: কোনো জীবই পরিবেশের জন্য পুরোপুরি ক্ষতিকর নয়। প্রতিটি জীবই কোনো না কোনোভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। মানুষ না জেনে অনেক জীবকে মেরে ফেলছে; অনেক জীবই তাই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যেমন— সাপ আমাদের কাছে বিষধর ও ভয়ংকর, কিন্তু সাপ ইঁদুর মেরে ফসল রক্ষা করে। আমরা সাপ মেরে ফেলায় ইঁদুর বেড়ে যাচ্ছে এবং ফসলের ক্ষতি করছে। তাই আমাদের খেয়াল করতে হবে কোনো জীবই যাতে বিলুপ্ত হয়ে না যায়।

জড় উপাদানের ভারসাম্য রক্ষা: আমরা মানুষেরা আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের জন্য পরিবেশকে নানাভাবে ব্যবহার করি। সঠিকভাবে পরিকল্পনা না করে বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে পরিবেশের কোনো উপাদানকে কমিয়ে ফেলি বা বাড়িয়ে ফেলি, পরিবেশে নতুন উপাদান যোগ করি। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। বিগত কয়েক শতাব্দীতে মানুষ অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়েছে। কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদি ব্যবহার করেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত বর্জ্য, ধোঁয়া এবং কৃষি ক্ষেতে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক পরিবেশে যোগ হয়েছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। মানুষ ও অন্যান্য জীব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ অবস্থাকে আমরা বলে থাকি পরিবেশ দূষণ।

আমরা পরবর্তীতে দেখব কীভাবে মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত হয় এবং কীভাবে আমরা দূষণ রোধ করতে পারি। এখানে একটি মূলনীতির কথা আলোচনা করা হবে, যাকে বলা হয় টেকসই উন্নয়ন। আমরা উন্নয়ন না করে থেমে থাকতে পারব না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে, উন্নয়নের প্রয়োজনে নতুন শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এ ধরনের উন্নয়ন কাজের সময়ে খেয়াল রাখতে হবে যাতে পরিবেশ নষ্ট বা দূষিত হয়ে না যায়। খেয়াল রাখতে হবে যাতে পরিবেশ পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও বাসযোগ্য ও ব্যবহার উপযোগী থাকে। টেকসই উন্নয়নের কিছু লক্ষ্যমাত্রা হলো—

১। একটি স্থিতিশীল বিশ্বজনসংখ্যা যেখানে জন্ম ও মৃত্যুর দুটোই কম থাকবে।

২। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করে উচ্চ উৎপাদনশীল ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো।

৩। প্রাকৃতিক সম্পদকে একেবারে ব্যয় না করে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে সম্পদ শেষ হয়ে না যায়।

৪। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এমন হওয়া যাতে প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পরকে আলাদা বিবেচনা না করা হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি আমাদের জন্য, আবার আমরা প্রকৃতির জন্য—এমন মনোভাব পোষণ করা।

এ লক্ষ্যমাত্রাপুত্রো অর্জন করা গেলে পরিবেশ সংরক্ষণ করা সহজ হবে। সুনির্দিষ্টভাবে নিচের পদক্ষেপপুত্রো পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকরী—

ক. কলকারখানার বর্জ্য পরিশোধন করে তারপর পরিবেশে নির্গত করতে হবে।

খ. গৃহস্থালি বর্জ্য পদার্থ নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে এবং তা পরিশোধন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে (যেমন— বর্জ্যকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কম্পোস্ট সারে পরিণত করা যায়)।

গ. কৃষিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও আগাছানাশক ওষুধের ব্যবহার কমিয়ে সমন্বিত বালাইদমন ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঘ. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সৌর ও বায়ু শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে।

ঙ. স্বাভাবিকভাবে পচে না এমন দ্রব্যের (যেমন পলিথিন) পরিবর্তে পচনশীল দ্রব্য যেমন পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

চ. অপরিবর্জিত বৃক্ষ নিধন বন্ধ এবং বেশি করে গাছ লাগিয়ে বন সৃষ্টি করতে হবে।

ছ. পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করার মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পরিবেশের উপাদান: মাটি

পরিবেশের অন্যতম অংশ শিলামণ্ডল। এই শিলামণ্ডলের উপরিভাগ হল মাটি। আমরা মাটির উপর বসবাস করি। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ মাটিতে জন্মায়। এই উদ্ভিদ থেকে আমরা খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ পাই। এই মাটির সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। পৃথিবীর উপরিভাগের নরম আবরণ প্রকৃত অর্থে মাটির একটি মিশ্রণ। বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে মাটি গঠিত। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে মাটি ব্যবহার করে। তাই মাটির গঠন, আকৃতি, প্রকারভেদ, মাটি ক্ষয় ও এর প্রভাব সংরক্ষণ সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুসন্ধান ২.২: মাটি কী উপাদান দিয়ে তৈরি?

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

আমরা প্রতিদিন খাই এমন কী কী জিনিস আছে যা মাটিতে জন্মায়? মাটি কী দিয়ে তৈরি বলে আপনারা মনে করেন? আপনারা কীভাবে বলতে পারেন যে, মাটি কী দিয়ে তৈরি?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: মাটি কী দিয়ে তৈরি তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এটা আপনারা কীভাবে করবেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও স্বপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন। বিভিন্ন স্থান থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে তা সাদা কাগজের উপর ছড়িয়ে দিয়ে এবং গ্লাসে মাটি নিয়ে তাতে পানি যোগ করে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

উপকরণ: দুটি ভিন্ন জায়গা হতে সংগ্রহীত দুই ধরনের মাটি, চামচ বা কাঠি, কাঁচের গ্লাস, পানি, খবরের কাগজ, সাদা কাগজ, আতসি কাঁচ ইত্যাদি।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

- ১) টেবিলের উপর একটি খবরের কাগজ বিছিয়ে দিন। একটি সাদা কাগজ খবরের কাগজের উপর রাখুন।
- ২) পূর্বেই শ্রেণি কক্ষের বাইরে থেকে সংগ্রহ করে রাখা মাটির ব্যাগ হতে কিছু মাটি সাদা কাগজের উপর রাখুন। মাটিতে কী কী থাকতে পারে তা লিপিবদ্ধ করতে বলুন।
- ৩) এবারে চা চামচের সাহায্যে মাটিকে কাগজের উপর ছড়িয়ে দিন এবং আতসি কাঁচ অথবা খালি চোখে মাটিকে পর্যবেক্ষণ করুন। মাটিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
- ৪) এবার কাঁচের গ্লাসের অর্ধেক পরিমাণ ঐ একই মাটি ভর্তি করে গ্লাসে পানি ঢেলে গ্লাসটি এমন ভাবে পূর্ণ করুন যাতে উপচে না পড়ে। চামচের সাহায্যে মাটি আর পানির মিশ্রণকে একটু নাড়িয়ে দিন এবং কিছুক্ষণ থিতানোর জন্য রেখে দিন। পর্যবেক্ষণ করুন কী ঘটছে? গ্লাসের তলায় কী কী জমা হচ্ছে?
- ৫) পর্যবেক্ষণে যা যা দেখতে পেলেন তা চিত্র এঁকে চিহ্নিত করুন।

ধারণা গঠন

উপরের পরীক্ষায় গ্লাসের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন পদার্থ জমা হতে দেখা যায়। কোন ভাগে কোন ধরনের পদার্থ রয়েছে? এখান থেকে মাটির কী কী উপাদান আছে বলে আপনি ধারণা করতে পারেন?

ধারণা প্রয়োগ

নুড়ি পাথর, বালু, কাদা, পানি, বায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত দেহের পচা অংশ মিলে মাটি তৈরি হয়। এ উপাদান গুলির পরিমাণের ভিন্নতার কারণে মাটিও ভিন্ন হয়। এবারে নদীর পাড়, বিদ্যালয় ও বাড়ির আশেপাশের বিভিন্ন জায়গা হতে মাটির নমুনা নিন। মাটির সংগৃহীত নমুনা গুলির মধ্যে কোন গুলো দেখতে একই রকম? ভিন্ন ভিন্ন জায়গার এই মাটি তুলনা করলে কেমন পার্থক্য হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

অনুসন্ধান ২.৩: মাটি কী কী ধরনের?

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

মাটিতে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বস্তু থাকে। মাটির রং, মাটিতে পানির পরিমাণ, মাটির কণার আকার বিভিন্ন হতে পারে। মাটির বুনের উপর ভিত্তি করেই মাটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি, এঁটেল মাটি। তাহলে কীভাবে প্রমাণ করবেন যে, কোনটি বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি ও এঁটেল মাটি?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: বিভিন্ন ধরনের মাটি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এটা আপনারা কীভাবে করবেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন। তিন ধরনের মাটির নমুনা নিয়ে এর রং, মাটি কণার আকার, হাতে ধরলে অনুভূতি কেমন, পানি ধরে রাখার ক্ষমতা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের মাটি চিহ্নিত করা যেতে পারে। চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি অন্য রকমও হতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

- ১) পূর্বেই তিন ধরনের মাটির নমুনা সংগ্রহ করুন।
- ২) একটি খবরের কাগজ বিছিয়ে তার উপর তিনটি সাদা কাগজ স্থাপন করুন, সাদা কাগজের উপর তিনটি নমুনার মাটি রাখুন এবং লেবেলিং করুন, নমুনা ১, নমুনা-২, নমুনা-৩। কোনটি কোন ধরনের মাটি তা পূর্বানুমান করতে বলুন?
- ৩) নিচের ছকটি খাতায় তুলুন। তিন ধরনের মাটি পর্যবেক্ষণ করতে বলুন এবং বৈশিষ্ট্যগুলো নিচের ছকে লিখতে বলুন।

বৈশিষ্ট্য	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা-৩
মাটির রং			
মাটির কণার আকার			
হাতে ধরলে অনুভূতি কেমন			
পানি ধারণের ক্ষমতা			
অল্প সময়ের মধ্যে পাত্রে জমা পানির পরিমাণ			

- ৪) তিনটি প্লাস্টিকের পানির বোতল কেটে তিনটি ফানেল তৈরি করুন এবং একই পরিমাণ মাটি তিনটি নমুনা হতে নিয়ে তিনটি ফানেলে রাখুন।
- ৫) এবার একটি কাঁচের গ্লাসে মার্কিং করে রাখুন যাতে একই পরিমাণ পানি তিনটি ফানেলে নেয়া যায়। এবার একই পরিমাণ পানি তিনটি ফানেলে ধীরে ধীরে ঢালুন। পানি ঢালার পূর্বে কোন মাটির মধ্যদিয়ে পানি তাড়াতাড়ি পড়বে এবং কোন মাটির নমুনার মধ্যদিয়ে ধীরে ধীরে পড়বে তা পূর্বানুমান করতে বলুন।
- ৬) কোন ফানেলের পানি তাড়াতাড়ি পড়ছে এবং কোন ফানেলের পানি ধীরে ধীরে পড়ছে? কোন পাত্রে কতটুকু পানি জমা হয়েছে? পর্যবেক্ষণ করুন।
- ৭) পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য উপরের ছকে লিখুন।
- ৮) ছকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোনটি কোন ধরনের মাটি তা শনাক্ত করার চেষ্টা করুন।

ধারণা গঠন

উপরের পরীক্ষায় তিন ধরনের নমুনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এরকম হবার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন? এ থেকে মাটির প্রকারভেদ সম্পর্কে আপনি কোন ধারণা করতে পারেন কি? সেটি কীরূপ?

ধারণা প্রয়োগ

নমুনা ১, ২ ও ৩ এর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আপনি বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি ও এঁটেল মাটির বৈশিষ্ট্য লিখুন। আপনার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মাটি নিয়ে সেটি কোন ধরনের মাটি তা যাচাই করুন।

মাটি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্ধন

মাটি

মাটি আসলে কী? তা উপরের পরীক্ষাগুলো হতে আমরা দেখলাম। মাটি হলো একটি মিশ্রণ। বিভিন্ন খনিজ বা অজৈব পদার্থ, জৈব পদার্থ, পানি ও বায়ুর মিশ্রণই মাটি। মাটি বলতে সাধারণত পৃথিবীর নরম ভূ-পৃষ্ঠ বা উপরিভাগকে বুঝায়। মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের মতে ভূ-পৃষ্ঠের যে নরম উপরিভাগে বা যে স্তরে গাছপালা জন্মে এবং যেখান থেকে গাছ পুষ্টি শোষণ করে বড় হয় তাকে মাটি বলে।



চিত্র ২.১: মাটি

মাটির গঠন প্রক্রিয়া

আপনি কি মনে করেন, আমরা এখন যে অবস্থায় মাটিকে দেখছি আদিতে এরূপ ছিল? তাহলে কেমন ছিল? মাটির বর্তমান অবস্থা লাভ করতে বহু বছর লেগেছে। সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন একটি উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ডরূপে পৃথিবীর সৃষ্টি। এ গ্যাসপিণ্ড সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমান্বয়ে ঠাণ্ডা হয় এবং এর উপরিভাগে অনেক বড় বড় শিলার উৎপত্তি হয়। দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় তাপ, শৈত্য, তুষারপাত, বৃষ্টি, বন্যা, বায়ুপ্রবাহ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলাগুলো ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। আরো পরে গাছপালা ও জীবজন্তুর পচা দেহাবশেষ ক্ষুদ্র কণার সাথে মিশে মাটি গঠিত হয়েছে। অতএব, মাটি হচ্ছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শিলাকণা, জৈবকণা, পানি ও বায়ুর সংমিশ্রণে গঠিত একটি মিশ্রণ।

বিভিন্ন স্থানের মাটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে। তাই বিভিন্ন স্থানের মাটি দেখতে ভিন্ন ভিন্ন, গঠনেও ভিন্ন। তবে মাটির উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে অনুসন্ধান করলে সাধারণভাবে কয়েকটি স্তর দেখা যায়। চিত্রে যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি মাটির একদম উপরের স্তরটিতে পচা ও মৃত জীবদেহ মিশে থাকে।

পচা ও মৃত জীবদেহ মিশে তৈরি কালো বা অনুজ্জ্বল উপাদানকে হিউমাস বলে। মাটির উপরের দিকে হিউমাস বেশি থাকে। এ হিউমাস থেকে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পায়। দ্বিতীয় স্তরে হিউমাস কমে আসে, এজন্য মাটি কম কালো বা কিছুটা উজ্জ্বল হয়। তৃতীয় স্তর মূলত ক্ষুদ্র শিলাকণা দ্বারা গঠিত। সবশেষে নিচের স্তরটি কেবল শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত।

বাংলাদেশের নদীর কাছাকাছি স্থানে বন্যা হয়। এসব স্থানের মাটির উপরিভাগ বন্যার পানি দ্বারা বয়ে আনা পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এসব স্থানের মাটির উপরের স্তর সেজন্য খুব পুরনো হয় না। এ মাটি ফসল চাষের জন্য খুব উপযোগী।

মাটি গঠনের উপাদান: মাটির গঠন উপাদান মূলত চারটি। এ চারটি উপাদান মাটিতে বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। এর মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ খনিজ বা অজৈব পদার্থ, ৫ ভাগ জৈব পদার্থ, ২৫ ভাগ পানি ও ২৫ ভাগ বায়ু। এছাড়া ব্যাকটেরিয়াও মাটির অন্যতম উপাদান।

১। খনিজ বা অজৈব পদার্থ: মাটির খনিজ পদার্থের উৎস ভূ-পৃষ্ঠের আদি শিলা। সূর্যের তাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে আদি শিলা ক্ষয় হয়ে খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। মাটিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। বালিকণা, কাদার কণা, পলিকণা ইত্যাদি খনিজ পদার্থ। খনিজ পদার্থ নানাভাবে মিশে মাটির বুনট সৃষ্টি করে।



২। **জৈব পদার্থ:** জৈব পদার্থ মাটির প্রাণ। মৃত গাছপালা, জীবজন্তু মাটিতে মিশে জৈব পদার্থ সৃষ্টি হয়। একে হিউমাসও বলে। জৈব পদার্থ মাটিকে উর্বর করে। যে মাটিতে জৈব পদার্থের উপাদান যত বেশি সে মাটি তত উর্বর। জৈব পদার্থ মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়। জৈব পদার্থের অণুজীব ক্রিয়াশীল হয়, ফলে কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী হয়।

৩। **পানি:** পানি মাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে পানি জমা থাকে। পানি উদ্ভিদের খাদ্য উপাদানকে দ্রবীভূত করে গ্রহণ উপযোগী করে। পানি মাটিকে রসালো রাখে। মাটিতে পানি থাকে বলেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। বৃষ্টি ও সেচের পানিই মাটির পানির প্রধান উৎস।

৪। **বায়ু:** বায়ু মাটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে বায়ু থাকে। বীজের অঙ্কুরোদগম ও মূলের শ্বাসপ্রশ্বাসে বায়ুর প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন অণুজীবের বংশবিস্তারেও বায়ু দরকার হয়। জমি চাষ দিলে মাটিতে বায়ুর পরিমাণ বাড়ে।

মাটির প্রকারভেদ

মাটিতে অজৈব অংশের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। অজৈব অংশের বালিকণা, সূক্ষ্মকণা, পলিকণা মিলেমিশে মাটির বুনট তৈরি করে। মাটির বুনটের ওপর ভিত্তি করেই মাটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা-বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি ও এঁটেল মাটি।

বেলে মাটি: এ ধরনের মাটিতে বালিকণার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে। এ মাটির কণাগুলো আকৃতিতে বড় বলে মাটিতে যথেষ্ট ফাঁক থাকে এবং অনায়াসে পানি ও বায়ু প্রবেশ করতে পারে। এ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম এবং মাটির উপরের স্তর অনুর্বর। সমুদ্র উপকূল, চর এলাকা ও মরুভূমিতে এ মাটি দেখা যায়। তরমুজ, শসা, ফুটি, চীনাবাদাম, গোল আলু ও মিষ্টি আলু ইত্যাদি এ ধরনের মাটিতে ভালো জন্মে।



চিত্র ২.৩: বেলে মাটি

দো-আঁশ মাটি: এ ধরনের মাটিতে বালি, পলি ও কদম কণা প্রায় সমান পরিমাণে থাকে। দো-আঁশ মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি। এ মাটির পানি শোষণ ও ধারণ ক্ষমতা দুই-ই বেশি। দো-আঁশ মাটি কৃষিকাজের জন্য বেশি উপযোগী। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের মাটিই দো-আঁশ মাটি। কৃষিক্ষেত্রে দো-আঁশ মাটিকে আদর্শ মাটি বলা হয়। দো-আঁশ মাটিকে আবার বিভিন্ন ভাগে



চিত্র ২.৪: দো-আঁশ মাটি

ভাগ করা হয়েছে, যেমন-বেলে দো-আঁশ, পলি দো-আঁশ, এঁটেল দো-আঁশ। নিচে বিভিন্ন ধরনের দো-আঁশ মাটির পরিচয় দেওয়া হলো।

ক) বেলে দো-আঁশ: এ ধরনের দো-আঁশ মাটিতে বালিকণার পরিমাণ বেশি এবং পলি ও কদম মিশ্রিত থাকে। এ মাটি ঝরঝরে প্রকৃতির এবং শস্য জন্মানোর খুবই উপযোগী। তিস্তার অববাহিকায় এ মাটির আধিক্য লক্ষ করা যায়। মুলা, তামাক, মরিচ ও কচু এ মাটিতে ভালো জন্মে।

খ) পলি দো-আঁশ: এ ধরনের দো-আঁশ মাটিতে পলিকণার পরিমাণ বেশি এবং জৈব ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ থাকে। এ মাটি অত্যন্ত উর্বর ও সব ধরনের ফসলের উপযোগী। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পলি দো-আঁশ মাটি দেখা যায়। ধান, পাট, আখ, নানাবিধ সবজি এ মাটিতে ভালো জন্মে।

গ) এঁটেল দো-আঁশ: এ ধরনের দো-আঁশ মাটিতে কদম কণার পরিমাণ বেশি থাকে। পানি ও জৈব ধারণ ক্ষমতা বেশি। বেশি বৃষ্টিপাত ও অনাবৃষ্টি ছাড়া সহজে চাষ উপযোগী। গঙ্গার অববাহিকা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ধান, তুলা, গম, ডাল, তেল ফসল ভালো জন্মে।

এঁটেল মাটি: এ ধরনের মাটিতে কদম কণার পরিমাণ বেশি থাকে। এঁটেল মাটিকে ভারী মাটি বলা হয়। এ মাটিতে বালিকণার চেয়ে পলিকণার পরিমাণ বেশি। পানি ধারণ ক্ষমতা বেশী কিন্তু নিষ্কাশন ক্ষমতা কম। পানির সংস্পর্শে এঁটেল মাটি নরম হয় আবার শুকালে খুবই শক্ত হয়। ধান, পাট, আখ ও শাকসবজি এ মাটিতে ভালো জন্মে।



চিত্র ২.৫: এঁটেল মাটি

অনুসন্ধান ২.৪: মাটি ক্ষয় ও এর প্রভাব

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

আপনারা কী কখনো খেয়াল করে দেখেছেন, মুষলধারে বৃষ্টির সময় পানি প্রবাহের সাথে কীভাবে মাঠ বা বাড়ির উঠানের মাটি পানির সাথে মিশে যায় বা ক্ষয় হয়ে যায়? মুষলধারে বৃষ্টি, ঝড়ো হওয়া, বন্যার কারণে বেশি মাটি ক্ষয় হয়। কিন্তু এই মাটি ক্ষয় সকল জায়গায় একই রকম হয় না। কোথাও কম বা কোথাও বেশি। তাহলে কীভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাবে কী কী কারণে বা কিসের প্রভাবে মাটি ক্ষয় হয়ে যায়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: বিভিন্ন কারণে মাটি ক্ষয় হয়। কীভাবে মাটি ক্ষয় হয় তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এটা আপনারা কীভাবে করবেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্ত শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন। তিন ধরনের মাটির নমুনা নিয়ে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের মাটি ক্ষয় চিহ্নিত করা যেতে পারে। চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি অন্য রকমও হতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

- ১) দুটি খালি প্লাস্টিকের পানির বোতল নিয়ে উপরের কিছুটা অংশ কেটে ফেলুন এবং একটি বোতলের নীচের অংশে পেরেক অথবা নিডল দিয়ে দশটি ছোট ছিদ্র করুন এবং দ্বিতীয় বোতলটিতে প্রথমটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় করে দশটি ছিদ্র করুন।
- ২) একটি চায়ের প্লেটে মাটি নিন এবং মাটির উপরের অংশ একটি পেন্সিল দিয়ে সমান করে দিন। মাটি ভর্তি প্লেটটিকে অন্য একটি বড় পাত্রে যেমন প্লাস্টিকের বোলের মাঝখানে রাখুন।

- ৩) এবার মাটি ভর্তি প্লেটের মাঝখানে একটি মিটার স্কেল অথবা অন্য কোন স্কেল খাড়াভাবে স্থাপন করুন।
- ৪) ছোট ছিদ্র যুক্ত প্লাস্টিকের বোতলটিকে মাটি ভর্তি প্লেট হতে ২ ফুট উপরে ধরুন এবং আধাকাপ পানি এত ঢালুন। মনে করুন এটা বৃষ্টি।
- ৫) যখন প্লাস্টিক বোতল হতে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হবে তখন প্লেটের মাটি এবং বড় বোল পর্যবেক্ষণ করুন।

ধারণা গঠন

আপনি কি কখনো মাটি ক্ষয় পর্যবেক্ষণ করেছেন? সেটা কী ধরনের? ভারী বৃষ্টি কি মাটি ক্ষয়ে প্রভাব ফেলে? প্লেটে বেলে মাটি ও শক্ত মাটি নিয়ে একই ভাবে পরীক্ষা করুন এবং কি ঘটে তা দেখুন। তুলনা করুন। প্লেটের মাটি কে গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে এবং অন্য প্লেটে না ঢেকে একইভাবে পরীক্ষাটি করুন। কীভাবে মাটি ক্ষয় হয় তা পর্যবেক্ষণ করুন।

ধারণা প্রয়োগ

কী কী উপায়ে মাটি ক্ষয় হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? কোন অবস্থায় মাটি ক্ষয় বেশী হয়? যদি বৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে ঢেকে রাখা মাটি এবং শক্ত মাটি (Compact soil) মাটি ক্ষয়ের ক্ষেত্রে কী ধরনের ভিন্নতা দেখা দিতে পারে এবং কেন?

ধারণা পরিবর্ধন

মাটি ক্ষয়: আমরা পরিবেশের চারপাশ পর্যবেক্ষণ করলে দেখব বর্ষাকালে নদীর পাড় ভেঙে যায় এবং মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার কারণে পানি প্রবাহের ফলে মাঠ/উঠান থেকে মাটি পানির সাথে মিশে যায় এবং মাটির কণা ভেঙে গিয়ে ক্ষয় হয়। ঝড়ো হাওয়া, জলোচ্ছ্বাস ও সাগরের ঢেউ দ্বারা মাটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। অতিরিক্ত জমি চাষ, অতিরিক্ত পশুচারণ ও বনাঞ্চল ধ্বংস করে মানুষ মাটি ক্ষয় করে। এখন প্রশ্ন হলো মাটি ক্ষয় আসলে কী? পানি, বায়ু ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের মাটি অন্যত্র চলে যাওয়াকে মাটি ক্ষয় বলে।



চিত্র ২.৬: মাটি ক্ষয়

মাটি ক্ষয়ের ফলে মাটির উপরিভাগের উর্বরতা ও পুষ্টি চলে যায়। এভাবে ক্ষয় হতে হতে একসময় মাটি চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। মাটি ক্ষয়ের কারণে নদী-নালা ভরাট হয়। নদীতে চর জাগে, বন্যা হয়। আমরা জানি যে, উদ্ভিদ ও প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য নানাভাবে মাটির উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য মাটি প্রয়োজন। মাটির ফাঁকে ফাঁকে যে পানি ও খনিজ লবণ থাকে তা উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির কাজে লাগে। আমাদের মৌলিক চাহিদা যেমন-অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার জন্য আমরা উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। শুধু মানুষ ও পশু-পাখি নয়, অন্যান্য ছোট জীবও মাটির উপর প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে

নির্ভরশীল। তাই মানুষসহ সকল জীবের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য মাটির ক্ষয় রোধ এবং মাটি সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

অনুসন্ধান ২.৫: মাটি সংরক্ষণ

অনুসন্ধান আমন্ত্রণ

মাটি ক্ষয়ের ফলে মাটির উপরিভাগের উর্বরতা ও পুষ্টি চলে যায়। এভাবে ক্ষয় হতে হতে এক সময় মাটি চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তাহলে কীভাবে মাটি ক্ষয় রোধ করে মাটি সংরক্ষণ করা যেতে পারে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: কীভাবে মাটি ক্ষয় রোধ করে মাটি সংরক্ষণ করা যায়? তা নিয়ে এক অন্যের সাথে আলোচনা করুন। মাটি ক্ষয়রোধ ও সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি

- ১) শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করুন এবং প্রত্যেক দলকে সম্ভাব্য মাটি ক্ষয় রোধে তাদেরকে একটি করে উপায় নিচের ছক অনুযায়ী যুক্তিসহ লিখতে বলুন।
- ২) এবার অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।
- ৩) আপনার দলের ছকের সাথে ২টি নতুন উপায় যোগ করুন।

মাটির ক্ষয়ের কারণ	প্রতিকারের উপায় (যুক্তিসহ)
সমতল ভূমিতে বৃষ্টির ফলে	
পাহাড়ী অঞ্চলে মাটি ধস	
বন্যার ফলে মাটি ক্ষয়	

ধারণা গঠন

বিভিন্ন কারণে মাটি ক্ষয় হয়। এজন্য মাটি ক্ষয়ের কারণগুলি উদ্ঘাটন করে তা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিলে মাটি সংরক্ষণ করা যেতে পারে। সমতল অঞ্চলে মাটি ক্ষয়ের সাথে পাহাড়ী অঞ্চলে মাটি ক্ষয়ের পার্থক্য আছে কি? আবার বিভিন্ন ধরনের মাটি যেমন বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি, এঁটেল মাটির ক্ষেত্রে কি একই রকম ক্ষয় হয়? এক্ষেত্রে কোন মাটি সংরক্ষণে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম বিভিন্ন ধরনের মাটি ক্ষয় হয়। তাহলে আপনার এলাকায় মাটিকে কীভাবে সংরক্ষণ করবেন? বিশেষ করে বৃষ্টি এবং বন্যাজনিত মাটি ক্ষয় কীভাবে রোধ করা যাবে?

ধারণা পরিবর্ধন

মাটি সংরক্ষণের উপায়: নিচের উপায়গুলো অনুসরণ করে মাটি সংরক্ষণ করা যায়।

- ১) বৃষ্টির পানি মাটি ক্ষয় করে। পানির বেগ কমিয়ে দিলে মাটির ক্ষয় কম হবে। জমিতে পানি প্রবাহের দিকে বাঁধ/আইল দিয়ে, ছোট ছোট নালা সমান করে দিয়ে, বড় বড় নালা ধারে আগাছার বেড়া ও শেষ প্রান্তে তারের জাল দিলে পানিপ্রবাহের বেগ কমবে এবং নালাগুলো ভরাট হয়ে জমি সমান হবে। ফলে মাটির ক্ষয় হবে না।
- ২) বৃষ্টির পানির কারণে মাটির ক্ষয় রোধ করতে হলে পানি নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা নিতে হবে। বৃষ্টির পানি সরার জন্য মাটির নিম্নস্তরে টাইল নালা করে দিতে হবে যাতে পানি ধীর গতিতে সরে যায়।
- ৩) জমিতে অধিক পরিমাণে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করলে মাটির শোষণ ক্ষমতা বাড়ে। ফলে কম পরিমাণ পানি নিচের দিকে গড়ায়। অর্থাৎ জৈব পদার্থের ব্যবহার বৃদ্ধি করলে মাটির ক্ষয় রোধ হয়।
- ৪) পাহাড়ি ঢালে ধাপে ধাপে কেটে জমি চাষ করলে বৃষ্টি দ্রুত গড়াতে পারে না। ফলে মাটি ক্ষয় কম হয়।
- ৫) পাহাড়ি ঢালে আড়াআড়ি লাইন করে দীর্ঘস্থায়ী ফসল চাষ করলে মাটির ক্ষয় কম হয়।
- ৬) পাহাড়ি ঢালে আড়াআড়িভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি তৈরি করে চাষ করলে মাটি ক্ষয় কম হয়।
- ৭) বন-জঙ্গল সৃষ্টি করে পানি ও বাতাস প্রবাহের গতিরোধ করলে মাটি ক্ষয় কম হয়।
- ৮) অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণের ফলে মাটির উপরিভাগ ঘাসশূন্য হয় ফলে মাটি আলগা হয়ে পড়ে। এতে মাটির ক্ষয় বাড়ে। পশুচারণে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করলে মাটি ক্ষয় কম হবে।
- ৯) বন্যার ফলে মাটির ক্ষয় হয়। ব্যাপক বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা হলে উল্লেখযোগ্যভাবে মাটি ক্ষয় রোধ হবে।



চিত্র ২.৭: মাটি ক্ষয় রোধে ধাপে ধাপে মাটি কেটে পাহাড়ি ঢালে চাষ পদ্ধতি

অনুসন্ধান ২.৬: মাটি দূষণের কারণ

অনুসন্ধান আমন্ত্রণ

মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ মাটিতে ফেলে মাটি দূষিত করে থাকে। এই মাটি দূষণের ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। চলুন তো দেখি আমরা জানার চেষ্টা করি কী কী কারণে এই মাটি দূষিত হচ্ছে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: কীভাবে মাটি দূষিত হয়? তা নিয়ে এক অন্যের সাথে আলোচনা করুন। মাটি কীভাবে দূষিত হয় তা অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানতে তাদের পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

- ১) শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করুন এবং প্রত্যেক দলকে মাটি দূষণের সম্ভাব্য কারণসমূহ যুক্তিসহ নিচের ছক অনুযায়ী লিখতে বলুন।

মাটি দূষণের কারণসমূহ	যেভাবে দূষণ ঘটায়

- ২) এবার অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।

- ৩) আপনার দলের ছকের সাথে ২টি নতুন কারণ যুক্তিসহ যোগ করুন।

ধারণা গঠন

বিভিন্ন কারণে মাটি দূষণ হয়। মানুষের কী কী কার্যক্রম মাটি দূষণের জন্য দায়ী বলে আপনি মনে করেন? এ সকল কারণ কীভাবে এই দূষণ ঘটায়?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম বিভিন্ন কারণে মাটি দূষণ হয়। এবারে আপনি আপনার গ্রামের ফসলী জমির মাটি দূষণের কারণগুলো চিহ্নিত করুন।

ধারণা পরিবর্ধন

মাটি দূষণ: আমাদের জীবন ধারণের জন্য মাটি অত্যাবশ্যিক। মাটিতে বিভিন্ন ফসল ফলে যা আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। শুধু খাদ্যই নয় জীবনধারণের সবকিছুই আমরা যেমন- বাসস্থান, বস্ত্র, ঔষুধ ইত্যাদির জন্য আমরা যে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল তাও মাটিতেই জন্মায়। উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর

জীবন ধারণের জন্যও মাটি অপরিহার্য। বর্তমানে মাটিকে আমরা বিভিন্নভাবে দূষিত করছি। যার ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। প্লাস্টিক, পলিথিন দ্রব্য ছাড়াও মাটিকে আমরা বিভিন্নভাবে দূষিত করছি। এসবের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আবর্জনাসহ কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ব্যবহার এবং শিল্পকারখানার বর্জ্য ইত্যাদি।



চিত্র ২.৮: মাটি দূষণ

অনুসন্ধান ২.৭: মাটি দূষণ রোধে করণীয়

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

মাটি দূষণের ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের জীবনযাত্রাই দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ দূষণ রোধ করা না গেলে পরিবেশে জীবনধারণ হুমকির সম্মুখীন হবে। এবারে চলুন তাহলে আমরা দেখি যে কী কী উপায়ে এই মাটি দূষণ রোধ করতে পারি?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: কীভাবে মাটি দূষণ রোধ করা যায়? তা নিয়ে এক অন্যের সাথে আলোচনা করুন। মাটি দূষণ রোধের জন্য করণীয়সমূহ নির্ধারণে শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

- ১) শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করুন এবং প্রত্যেক দলকে মাটি দূষণ রোধে সম্ভাব্য করণীয়সমূহ লিখতে বলুন।

মাটি দূষণ রোধে করণীয়সমূহ

- ২) এবার অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।
- ৩) আপনার দলের ছকের সাথে ২টি নতুন করণীয় কাজ যোগ করুন।

ধারণা গঠন

আপনার কী কী কার্যক্রম মাটি দূষণ রোধে সহায়তা করতে পারে বলে আপনি মনে করেন? এসকল করণীয়সমূহ কীভাবে মাটি দূষণ রোধ করতে পারবে?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে মাটি দূষণ রোধ করা যায়। এবারে আপনি আপনার বাড়ির আঙ্গিনা ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মাটি দূষণ রোধে কী কী করবেন? তা নির্ধারণ করুন। মাটি দূষণ রোধে আপনার পরিবারের সদস্যদের আপনি কীভাবে সচেতন করবেন?

ধারণা পরিবর্ধন

মাটি দূষণের প্রভাব ও মাটি দূষণ রোধে করণীয়: মাটি দূষণের অন্যতম কারণ হচ্ছে মাটিতে বর্জ্যের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। মাটি দূষণের জন্য দায়ী বিভিন্ন কঠিন ও রাসায়নিক বর্জ্য। এসব বর্জ্য যেখানে সেখানে ফেলার কারণে পরিবেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাটিতে ফেলে দেওয়া কাঁচ, এলুমিনিয়াম, পলিথিন ইত্যাদি মাটিতে সহজে মিশে না। ফলে মাটি তার উর্বরতা হারায়। তোমরা জেনে অবাক হবে এলুমিনিয়ামের মাটির সাথে মিশতে লাগে এক'শ বছর। কাঁচের লাগে দু'শ বছর এবং পলিথিনের লাগে প্রায় সাড়ে চার'শ বছর। এছাড়াও এগুলো আমাদের নর্দমা, জলাশয়কে ভরাট করে এবং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এগুলো পুকুর, নদী, সাগর এসব স্থানেও স্থানান্তরিত হয়। যার ফলে সকল জীবের বেঁচে থাকার জন্য এগুলো হুমকীর কারণ হয়। কৃষিজমিতে যে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় তা সকল জীবের জন্য ক্ষতিকর। এসব রাসায়নিক দ্রব্য খাদ্যের সাথে মিশে ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ রোগের সৃষ্টি হতে পারে। মাটি দূষণ রোধে প্লাস্টিক, পলিথিন ইত্যাদি যেগুলো পঁচনশীল নয় সেগুলোর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। জমিতে কীটনাশক, রাসায়নিক সার ব্যবহার বর্জন করতে হবে। এছাড়াও যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা চলবে না।

পরিবেশের উপাদান: পানি

অনুসন্ধান ২.৮: পানির উৎস ও ব্যবহার

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

কাপড় ধোঁয়া, গোসল করা, রান্না, চাষাবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে আমরা প্রতিদিন পানি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে থাকি। এই পানি আমরা কোথা থেকে পাই? আপনারা যখন পানি পান করতে চান তখন কোন পানি পান করেন?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: কোন কোন উৎস হতে আমরা পানি পাই তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এটা আপনারা কীভাবে তা করতে পারেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

- ১) শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দলে ভাগ হয়ে নিচে প্রদত্ত ছকের ন্যায় একটি ছক তৈরি করুন।
- ২) চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে আপনি মাটির কী কী ব্যবহার দেখতে পান তা আলোচনাপূর্বক ছকে লিপিবদ্ধ করুন।

পানির উৎস

- ৩) এখন অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।
 ৪) এবারে নিচের ছকের মতো আরেকটি ছক তৈরি করুন।

প্রাকৃতিক উৎস	মানুষের সৃষ্ট উৎস

- ৫) দলগতভাবে আলোচনা করে উপরের ছকটি পূরণ করুন।
 ৬) এবার অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।
 ৭) আপনার দলের ছকের সাথে ৩টি করে নতুন উৎসের নাম যোগ করুন।

ধারণা গঠন

কী কী উৎস থেকে আপনি পানি পেতে পারেন? বৃষ্টি পানির কি ধরনের উৎস এবং কেন?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন উৎস হতে আমরা পানি পাই। বাস্তব জীবনে কোন উৎসের পানি কীভাবে ব্যবহার করি অর্থাৎ পানির উৎস ও ব্যবহার এর মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে নিচে ছকটি পূরণ করুন।

পানির উৎস	পানির ব্যবহার

ধারণা পরিবর্তন

পানির উৎস

আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা পানি পেয়ে থাকি। এগুলোর মধ্যে কিছু প্রাকৃতিক উৎস আর কিছু কৃত্রিম উৎস। প্রকৃতিতে প্রধানত যে যে উৎস থেকে আমরা পানি পাই, সেগুলো হলো বৃষ্টি, ভূগর্ভ, নদী ও সমুদ্র। নিচে এসব উৎস থেকে প্রাপ্ত পানি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১। বৃষ্টির পানি : প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত পানির মধ্যে বৃষ্টির পানিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। আমাদের দেশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ বৃষ্টির পানি ধরে রেখে আমরা পান করতে পারি। বৃষ্টির পানি আমরা

কৃষিকাজে ব্যবহার করি। এছাড়া বৃষ্টির পানি পুকুর, হাওড়, বিল ও লেক-এ সঞ্চিত হয় যা আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি।

২। ভূগর্ভস্থ পানি: বৃষ্টির পানি ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়ে ধীরে ধীরে মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এ সময়ে বালি, মাটি ও পাথর দ্বারা পানি পরিশ্রুত হয়ে ভূ-অভ্যন্তরে জমা হয়। এ ভূ-গর্ভস্থ পানিতে বিভিন্ন খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকে। বিভিন্ন উপায়ে আমরা ভূ-গর্ভস্থ পানি পেয়ে থাকি। পাহাড়ি অঞ্চলে এ পানি ঝরনার আকারে বের হয়ে আসে। সমতল অঞ্চলে আমরা কূপ খনন করে এবং নলকূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি পেয়ে থাকি। গ্রামের কৃষি ক্ষেত্রে মোটর চালিয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে সেচকাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বর্তমানে শহর অঞ্চলে মোটর চালিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে ঘরে ঘরে সরবরাহ করা হয়।

৩। নদীর পানি : ঝরনার পানি, বৃষ্টির পানি এবং পাহাড়ের বরফ ও তুষারগলা পানি নদীর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। নদীর স্রোত তার গতিপথে অনেক জিনিস নিয়ে নেয়। এর মধ্যে লবণ জাতীয় পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত থাকে আর বালি, কাদামাটি, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি অদ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। নদীর পানি বিশোধন না করে পান করা নিরাপদ নয়। বড় শহরে নদীর পানি উত্তোলন করে শোধন করে পানযোগ্য করা হয়।

৪। সমুদ্রের পানি : সমুদ্র পানির প্রধান উৎস (মুক্তাকী, আখতার, বেগম ও সুলতানা, ২০০৩)। তবে সমুদ্রের পানি লবণাক্ত বলে তা পানের অযোগ্য। নদীর স্রোত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তার গতিপথে অনেক লবণ বহন করে সমুদ্রে নিয়ে আসছে। এ কারণে সমুদ্রের পানি লবণাক্ত। কোনো কোনো দেশে সমুদ্রের পানিকে লবণমুক্ত করে পানযোগ্য করা হয়; তবে তা অনেক কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল।

উপরে বর্ণিত উৎসগুলো ছাড়াও খাল, বিল ও লেক থেকে আমরা পানি পাই। তবে এসব উৎসের পানি বৃষ্টি, নদী বা ভূ-গর্ভ থেকে আসে।

অনুসন্ধান ২.৯: উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য পানি

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

পানির অপর নাম জীবন। জীবন ধারণের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলেরই পানি প্রয়োজন। আচ্ছা চলুন তো দেখি উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য পানি অপরিহার্য কেন?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে পানি কী কী ভাবে কাজে লাগে তা জানা প্রয়োজন। এটা আপনারা কীভাবে তা করতে পারেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

- ১) শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দলে ভাগ হয়ে নিচে প্রদত্ত ছকের ন্যায় একটি ছক তৈরি করুন।
- ২) উদ্ভিদ ও প্রাণী তাদের জীবনধারণের জন্য কী কী ভাবে পানি ব্যবহার করে তা দলগতভাবে আলোচনাপূর্বক ছকে লিপিবদ্ধ করুন।
- ৩) এখন অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।

জীব	পানির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা
উদ্ভিদ	
প্রাণী	

৪) আপনার দলের ছকের সাথে ৩টি করে নতুন ব্যবহার যোগ করুন।

ধারণা গঠন

কী কী ভাবে উদ্ভিদ তার জীবনে পানি ব্যবহার করে? মানুষের জীবনধারণের জন্য পানি প্রয়োজন কেন?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম জীবের বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য। বাস্তব জীবনে আমরা পানির উপর কী কী ভাবে নির্ভরশীল? পানির অপর নাম জীবন, এ ব্যাপারে আপনার মতামত যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।

ধারণা পরিবর্তন

উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের জন্য পানি

জীবের জন্য পানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পানি ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না।

উদ্ভিদের জন্য পানি: উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য পানি প্রয়োজন। উদ্ভিদের দেহের প্রায় ৯০ ভাগ পানি। উদ্ভিদ খাদ্য তৈরিতেও পানি ব্যবহার করে। মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ ও বিভিন্ন অংশে পরিবহনের জন্য উদ্ভিদের পানি প্রয়োজন। পানি ছাড়া উদ্ভিদ মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান শোষণ করতে পারে না। প্রচণ্ড গরমে পানি উদ্ভিদের দেহ শীতল করতে সহায়তা করে। বীজের অঙ্কুরোদগম থেকে আরম্ভ করে যতদিন উদ্ভিদ বেঁচে থাকে ততদিন উদ্ভিদের পানি প্রয়োজন হয়।

প্রাণীর জন্য পানি: বেঁচে থাকার জন্য প্রাণীদেরও পানি প্রয়োজন। মানবদেহের ৬০-৭০ ভাগ পানি। অধিকাংশ প্রাণী পানি পান না করে অল্প কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে। আমরা যখন খাদ্য গ্রহণ করি তখন পানি সেই খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। পুষ্টি উপাদান শোষণেও দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গে পরিবহনের জন্য পানি প্রয়োজন। পানি আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

অনুসন্ধান ২.১০: পানি চক্র কী?

অনুসন্ধানের আমন্ত্রণ

সাধারণ অবস্থায় আপনারা প্রায়ই দেখতে পান যে, বৃষ্টির পর মাটিতে পানি জমে থাকে। কিছুক্ষণ পর সেই পানি অদৃশ্য হয়ে যায়। ভেজা কাপড় রোদে রেখে দেওয়ার পর পানি কোথায় যায়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: পৃথিবীতে পানি ধারাবাহিক চক্রের মাধ্যমে বা বিভিন্ন ধাপে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় যায়। এই বিভিন্ন ধাপে পানির কী ধরনের পরিবর্তন হয় তা পরীক্ষা করে ব্যাখ্যা করা দরকার।
যেমন: পানি বাষ্পে পরিণত হতে পারে, আপনারা এ পরিবর্তনটুকু কীভাবে জানবেন? একটি গামলায় পানি ভর্তি করে তা যদি সূর্যের আলোতে অথবা সূর্যের আলো না থাকলে অন্য কোন লাইটের নিচে রেখে দেওয়া হয় তাহলে কী ঘটবে? যদি গামলাকে ছায়াতে রাখা হয় তাহলে কী ঘটবে? তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি অন্যরকমও হতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি: (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে)।

- ১) একটি গামলায় পানি ভর্তি করে তা যদি সূর্যের আলোতে অথবা সূর্যের আলো না থাকলে অন্য কোন লাইটের নিচে রেখে দেওয়া হয় তাহলে কী ঘটবে? যদি গামলাকে ছায়াতে রাখা হয় তাহলে কী ঘটবে? তা পূর্বানুমান করুন।
- ২) শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দলে ভাগ হয়ে দুইটি করে গামলা নিন।
- ৩) প্রত্যেক গামলায় এক চামচ করে পানি রাখুন।
- ৪) একটি গামলাকে সূর্যের আলোতে অথবা সূর্যের আলো না থাকলে অন্য কোন লাইটের নিচে রাখুন।
- ৫) অন্য গামলাকে ছায়াতে রাখুন।
- ৬) গামলার পানির কী ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করুন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।

ধারণা গঠন

কোন গামলার পানি দ্রুত বাষ্প হয়ে গেছে? যে গামলাটি সূর্যের আলোতে ছিল সেটির? বাষ্প হয়ে পানি কোথায় গেল? পানিকে যখন তাপ দেওয়া হয়, তখন তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়ে বাতাসে চলে গেল।

ধারণা প্রয়োগ

যে প্রক্রিয়ায় পানি বাতাসে চলে যায় তাকে বাষ্পীভবন বলে। ভূপৃষ্ঠের যেখানে পানি আছে তা সব জায়গাতে বাষ্পীভবন হয়ে থাকে। তাহলে এক্ষেত্রে কীভাবে পানি বাতাসে চলে গেল? বাষ্পীকরণ হয়ে যাওয়ার পর পানির অবস্থার ক্ষেত্রে কী ঘটল? পানি অদৃশ্য হয়ে বা বাষ্প হয়ে কোথায় গেল? সূর্যের আলো এই বাষ্পীভবনের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করেছে? যখন বৃষ্টি হয় তখন আসলে পানি কোথা হতে আসে? কীভাবে মেঘ তৈরি হয়? যখন বৃষ্টির পানি মাটিতে পড়ে এবং পড়ার পর সাধারণত ঐ পানির ক্ষেত্রে কী ঘটে?

অনুসন্ধান ২.১১: কীভাবে মেঘ সৃষ্টি হয়?

অনুসন্ধানের আমন্ত্রণ

ভূপৃষ্ঠে পানি কোথায় থাকে? মাটি, সমুদ্র, নদী, পুকুর, খালবিল ইত্যাদি। যখন বাতাসে বাষ্প ঘনিভূত হয় তখন কী হয় বলে আপনি মনে করেন? আপনারা মেঘ কোথায় দেখতে পান? মেঘ কী? মেঘ কীভাবে সৃষ্টি হয়? বায়ুর তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, ঘনীভবন এবং মেঘ সৃষ্টির মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক আছে বলে আপনি মনে করেন?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। বায়ুতে বাষ্প কীভাবে ঠাণ্ডা হয়ে মেঘে পরিণত হয় তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এটা আপনারা কীভাবে করতে পারেন? পাশাপাশি দুজনে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

- ১) একটি বড় প্লাস্টিকের পরিষ্কার বোতল কেটে (পানির বোতল হতে পারে) কন্টেইনার তৈরি করুন এবং এতে কিছু গরম পানি ঢালুন।
- ২) প্লাস্টিকের ব্যাগে কিছু বরফ রাখুন এবং কন্টেইনারের উপরে এটা রাখুন।
- ৩) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন এবং পরিবর্তনসমূহ লক্ষ্য করুন। মেঘ কী সৃষ্টি হয়েছে?
- ৪) কিছু সামান্য ধোঁয়া কন্টেইনারের মধ্যে যোগ করুন। এটা ঘনীভূত হতে সাহায্য করবে, অর্থাৎ মেঘ ভালভাবে বোঝা যাবে।

ধারণা গঠন

কন্টেইনারের মধ্যে মেঘ কীভাবে এলো? পরীক্ষাটিতে আপনি পর্যবেক্ষণ করে কী দেখতে পেলেন? এই পরীক্ষার সাথে মেঘ সৃষ্টি হওয়াকে মেলাতে পারেন?

ধারণা প্রয়োগ

বায়ুতে পানি থাকে কি? মেঘ সৃষ্টির কারণ যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।

ধারণা পরিবর্তন

পানিচক্র: পৃথিবীতে পানি সবসময় এক অবস্থায় থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের মধ্যে থাকে। সূর্যতাপ ভূ-পৃষ্ঠের (মাটি, পুকুর, খাল, বিল, নদী ও সমুদ্রের) পানিকে বাষ্পে পরিণত করে। একে জলীয়বাষ্প বলে। জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলের যতই উপরের দিকে উঠতে থাকে ততই ঠাণ্ডা হয়ে ক্ষুদ্র পানিকণায় পরিণত হয়। এভাবে তৈরি হওয়া অসংখ্য পানিকণা একত্র হয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়। আমরা তখন একে মেঘ বলি। মেঘের পানিকণাগুলো একত্রিত হয়ে আকারে বড় হলে তখন আর বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকতে পারে না-বৃষ্টিরূপে মাটিতে পড়ে। মেঘের পানিকণাগুলো খুব বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তা বরফে পরিণত হয় এবং শিলাবৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে নেমে আসে। এভাবে ভূ-পৃষ্ঠের পানি থেকে জলীয়বাষ্প, জলীয়বাষ্প

থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি হিসেবে পানি আবার মাটি, পুকুর, খাল-বিল, নদী ও সমুদ্রে অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে চক্রাকারে ফিরে আসাকে পানিচক্র বলে।



চিত্র ২.৯: পানি চক্র

কখনো কখনো বায়ুপ্রবাহের কারণে জলীয়বাষ্প মেঘরূপে উড়ে গিয়ে পর্বতের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে মেঘের পানিকণা ঠাণ্ডায় বরফে পরিণত হয়। এ বরফ গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে গলে পানি হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে। এভাবে ছোট পাহাড়ি নদীর উৎপত্তি হয়। এ পাহাড়ি নদী বৃষ্টির পানির সাথে মিলে সমতলে বড় নদীতে পরিণত হয়। এ নদীর পানি সবশেষে সমুদ্রে গিয়ে মেশে।

অনুসন্ধান ২.১২: পানি দূষণ ও এর কারণ

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

প্রকৃতিতে যত পানি পাওয়া যায় তার সবটুকুই পানের উপযোগী নয়। অনেক পানিতে ময়লা বা রোগজীবাণু থাকে। সেই পানিকে বলা হয় দূষিত পানি। আর যে পানিতে ময়লা, রোগজীবাণু বা ক্ষতিকর কিছু থাকেনা তাকে বলা হয় বিশুদ্ধ পানি। প্রশ্ন হচ্ছে পানি কীভাবে দূষিত হয়? দূষিত পানির প্রভাবে কী হতে পারে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন

বিভিন্ন কারণে বা বিভিন্নভাবে পানি দূষিত হতে পারে। পানি দূষণের কারণ গুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। কীভাবে পানি দূষণের কারণ গুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন।

এক্ষেত্রে পানি দূষণের কারণ পর্যবেক্ষণের জন্য পাশের নদী/ডোবা/খাল পর্যবেক্ষণ করানো যেতে পারে।
অথবা পানি দূষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি পর্যবেক্ষণ ও তা নিয়ে দলে আলোচনা করা যেতে পারে।
সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

১। নিচের ছক অনুযায়ী ছক তৈরি করুন।

পানি দূষণের কারণ

২। যদি পাশেই দূষিত নদী/ডোবা/খাল/পুকুর থাকে তাহলে সকলকেই শ্রেণিকক্ষের বাইরের ঐ দূষিত পানির উৎসের কাছে যান। যদি না থাকে সেক্ষেত্রে দলগতভাবে আলোচনা করে উপরের ছকটি পূরণ করুন।

৩। এখন অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।

৪। এবারে নিচের ছকের মতো আরেকটি ছক তৈরি করুন।

প্রাকৃতিক কারণ	মানব সৃষ্ট কারণ

৫। দলগতভাবে আলোচনা করে উপরের ছকটি পূরণ করুন।

৬। এবার অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।

৭। আপনার দলের ছকের সাথে ৩টি করে নতুন কারণ যোগ করুন।

ধারণা গঠন

বাইরের দূষিত নদী/ডোবা/খালা/পুকুর অথবা ছবি পর্যবেক্ষণ করে পানি দূষণের কী কী কারণ পেলেন ?
পানিতে কী কী বস্তু দেখতে পেলেন ? পানি দূষণের সাথে মানুষের কী সম্পর্ক আছে বলে মনে করেন ?
কোন কোন প্রাকৃতিক কারণে পানি দূষিত হয় ? পানি দূষণের ফলে মানুষ ও পরিবেশের উপর কী কী প্রভাব পড়ছে ?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম যে, বিভিন্ন কারণে পানি দূষিত হয়। এর মধ্যে মানবসৃষ্ট কারণ ও প্রাকৃতিক কারণ উল্লেখযোগ্য। তাহলে কীভাবে পানি দূষণ রোধ করা যেতে পারে?

বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্তন

দূষিত পানি, বিশুদ্ধ ও নিরাপদ (polluted, Pure and safe water)

পানিতে খুব সহজেই অনেক পদার্থ মিশতে পারে। খাল-বিল, নদ-নদীর পানিতে ময়লা-আবর্জনা, রোগ-জীবাণু ইত্যাদি মিশে থাকে। কোনো কোনো নলকূপের পানিতে আর্সেনিক নামক ক্ষতিকর খনিজ পদার্থ মিশে থাকে। এসব নলকূপের পানি এবং খাল-বিল, নদ-নদীর পানি পান করা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এরকম পানি দূষিত পানি।

বিশুদ্ধ পানি বলতে বোঝায় যে পানিতে পানি ছাড়া আর কোনো পদার্থ মিশ্রিত বা দ্রবীভূত থাকে না। এ হিসেবে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত কোনো পানিই পুরোপুরি বিশুদ্ধ নয়। বৃষ্টির পানি তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ, তারপরও বৃষ্টির পানিতে অক্সিজেন, কার্বন-ডাই অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস দ্রবীভূত থাকে। ভূ-গর্ভস্থ পানিতেও বিভিন্ন খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকে। তাই এ পানিও পুরোপুরি বিশুদ্ধ নয়। কেবল ল্যাবরেটরিতেই বিশুদ্ধ পানি তৈরি সম্ভব।

পানি পুরোপুরি বিশুদ্ধ পাওয়া না গেলেও অসুবিধা নেই। বরং পানিতে কিছু খনিজ লবণ মিশ্রিত থাকলে তা আমাদের শরীরের জন্য ভালো। যেমন-ঝরনার পানি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো কারণ এতে সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদির উপকারী লবণ দ্রবীভূত থাকে। বৃষ্টির পানি, নলকূপের পানি (যদি আর্সেনিক না থাকে) ও ফুটানোর পর অন্যান্য উৎসের পানি পান করা যায়, এসব পানি শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়। যে পানিতে আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোন কিছু থাকে না তা নিরাপদ পানি।

পানিদূষণের কারণ

মানুষের অসাবধানী কর্মকাণ্ডই পানিদূষণের প্রধান কারণ। প্রাকৃতিক কারণেও পানি দূষিত হতে পারে। নিচে পানিদূষণের প্রধান কারণগুলো উল্লেখ করা হলো—

মানবসৃষ্ট কারণসমূহ: পুকুর বা নদীর পানিতে বাসন-কোসন মাজা, গোসল করা, ময়লা কাপড় কাচা, গরু-মহিষ গোসল করানো, পাট পচানো, পায়খানা-প্রস্রাব করা, প্রাণীর মৃতদেহ ফেলা প্রভৃতি উপায়ে নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুরের পানি দূষিত হয়। (শামসুদ্দোহা, মিয়া, ওহাব ও খান, ২০০০)

- ১। কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত রোগীর মলমূত্র, বিছানাপত্র, জামা-কাপড় পুকুর, খাল বা নদীর পানিতে ধুলে এ রোগগুলোর জীবাণু পানিতে মিশে পানি দূষিত করে। (শামসুদ্দোহা, মিয়া, ওহাব ও খান, ২০০০)
- ২। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ পরিশোধন না করে নদীতে বা খালে ফেললে পানি দূষিত হয়, কারণ এ বর্জ্য পদার্থে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মিশে থাকে।
- ৩। কৃষিকাজে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করলে তা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে খাল-বিল ও নদীর পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে।
- ৪। অতিরিক্ত সার ব্যবহার করলে, অতিরিক্ত সার বৃষ্টি বা সেচের পানির মাধ্যমে নদী ও খাল-বিলের পানিতে মেশে। এর ফলে শৈবালসহ ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ দ্রুত বাড়ে এবং তারা পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন শোষণ করে নেয়। ফলে পানিতে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় যা ঐ পানিতে বসবাসকারী মাছ ও অন্যান্য জীবের জন্য ক্ষতিকর। এভাবে জমিতে অতিরিক্ত সার পানিকে পরোক্ষভাবে দূষিত করে।

প্রাকৃতিক কারণে পানিদূষণ

- ১। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে পানি দূষিত হয়। বন্যার ফলে গ্রাম ও শহর অঞ্চল প্লাবিত হয়। এতে মানুষ ও গৃহপালিত পশুপাখির মলমূত্র পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে। বন্যার এ দূষিত পানি পুকুর, কুয়া ও নলকূপের পানিতে মিশে পানযোগ্য পানিকে দূষিত করে পানের অযোগ্য করে তোলে। একইভাবে, সুনামি এবং জলোচ্ছ্বাসের ফলে সমুদ্রের পানি নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের পানিতে মিশে পানিকে লবণাক্ত করে দূষিত করে ফেলে।
- ২। আর্সেনিক দূষণ : প্রাকৃতিক কারণে (ভূ-তাত্ত্বিক কারণে) মূলত আর্সেনিক দূষণ হয়ে থাকে। ভূ-অভ্যন্তরে আর্সেনিকের খনিজ থাকে। আর্সেনিক ভূ-গর্ভের পানির স্তরের সংস্পর্শে এলে তা পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে। আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নলকূপের পানিতে আর্সেনিকযুক্ত পানি পাওয়া যায়। পানিতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি আর্সেনিক মিশে থাকলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। পানীয়জলে বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রা প্রতি লিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রাম। ইতোমধ্যে দেশের সব জেলায় নলকূপের পানি পরীক্ষা করে এ মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিকযুক্ত (অর্থাৎ) নলকূপ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ঐ নলকূপগুলোকে লাল রং দেওয়া হয়েছে। তাই লাল ক্রস বা কাটা চিহ্নযুক্ত নলকূপের পানি খাওয়া উচিত নয়।

পানিদূষণের প্রভাব: পানিদূষণ মানুষ ও পরিবেশের অনেক ক্ষতি করে। নিচে পানিদূষণের প্রভাব আলোচনা করা হলো:

- ১। পানিবাহিত রোগের বিস্তার: কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত রোগীদের মলমূত্র ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র দ্বারা দূষিত পানি পান করলে আমরা এসব রোগে আক্রান্ত হতে পারি।
- ২। কলকারখানার বর্জ্য দ্বারা দূষিত পানি ব্যবহার করলে পেটের পীড়া ও চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিল্প-কারখানার বর্জ্য দ্বারা দূষিত পানি মাছকে অসুস্থ করে তোলে। এ কারণে বিভিন্ন সময়ে মাছের গায়ে আমরা ক্ষত বা ঘা দেখতে পাই।
- ৩। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত অতিরিক্ত কীটনাশক ও সার নদী ও খাল-বিলের পানিকে দূষিত করে যা নদী ও খাল-বিলের মাছের বৃদ্ধি ব্যবহৃত করে ও মাছকে বিষাক্ত করে তোলে।
- ৪। বন্যার ফলে পুকুর, নলকূপ ও কুয়ার পানি পান করলে ডায়রিয়া, আমাশয় প্রভৃতি রোগ হতে পারে। আমাদের দেশে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর এ ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সুনামি ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের পানি লবণাক্ত হওয়ার ফলে মিঠাপানির মাছ ও জলজ উদ্ভিদের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- ৫। আর্সেনিকযুক্ত পানি দীর্ঘদিন পান করলে হাত-পায়ে একধরনের ক্ষত বা ঘা তৈরি হয় যা আর্সেনিকোসিস রোগ নামে পরিচিত। এ রোগের সহজ কোনো চিকিৎসা নেই। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ ধরা পড়লে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করা বন্ধ করলেই সুস্থ হওয়া যেতে পারে। এ রোগ প্রাণঘাতী না হলেও এ থেকে ত্বকের ক্যানসারের মতো রোগ দেখা দিতে পারে (World Health Organization, ২০১২)। আরো মনে রাখা ভালো যে এ রোগ সংক্রামক নয় অর্থাৎ আর্সেনিকোসিস রোগীদের সংস্পর্শে গেলে অন্যদের এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

অনুসন্ধান ২.১৩: পানিদূষণ রোধে করণীয়

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

পানি দূষণের ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের জীবনযাত্রাই দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ দূষণ রোধ করা না গেলে পরিবেশে জীবনধারণ হুমকির সম্মুখীন হবে। এবারে চলুন তাহলে আমরা দেখি যে কী কী উপায়ে এই পানি দূষণ রোধ করতে পারি?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: কীভাবে পানি দূষণ রোধ করা যায়? তা নিয়ে এক অন্যের সাথে আলোচনা করুন। পানি দূষণ রোধের জন্য করণীয়সমূহ নির্ধারণে তাদের পরিকল্পনা ও স্বপক্ষে যুক্তি গুলো শুনুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

১। শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করুন এবং প্রত্যেক দলকে পানি দূষণ রোধে সম্ভাব্য করণীয়সমূহ লিখতে বলুন।

পানি দূষণ রোধে করণীয়সমূহ

২। এবার অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।

৩। আপনার দলের ছকের সাথে ২টি নতুন করণীয় কাজ যোগ করুন।

ধারণা গঠন

আপনার কী কী কার্যক্রম পানিদূষণ রোধে সহায়তা করতে পারে বলে আপনি মনে করেন? এসকল করণীয়সমূহ কীভাবে পানিদূষণ রোধ করতে পারবে?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পানি দূষণ রোধ করা যায়। এবারে আপনি আপনার বাড়ির আঙ্গিনা ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের পানি দূষণ রোধে কী কী করবেন? তা নির্ধারণ করুন। পানি দূষণ রোধে আপনার পরিবারের সদস্যদের আপনি কীভাবে সচেতন করবেন?

ধারণা পরিবর্ধন

পানি দূষণ রোধে করণীয়

পানিদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচার মূল উপায় হচ্ছে পানিদূষণ রোধ। পানিদূষণ রোধ করতে হলে পানিদূষণের কারণগুলো বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করলে পানিদূষণ রোধ করা যায়।

- ১। বাড়ির ময়লা-আবর্জনা, প্রাণীর মৃতদেহ, মলমূত্র পানিতে ফেলা যাবে না।
- ২। যে পুকুরের পানি রান্না পান করার কাজে ব্যবহৃত হয় সেখানে কাপড় কাচা ও বাসন-কোসন ধোয়া যাবে না। পুকুর থেকে পানি তুলে ব্যবহার করতে হবে এবং লক্ষ রাখতে হবে যে ব্যবহৃত পানি পুকুরের পানিতে গিয়ে না মেশে।
- ৩। কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত রোগীকে পুকুর, নদী বা খাল-বিলে গোসল করানো বা ব্যবহৃত জামা-কাপড়, বিছানাপত্র ইত্যাদি ধোয়া যাবে না।
- ৪। জলাশয়ের পাশে খোলা পায়খানা নির্মাণ করা যাবে না।
- ৫। কলকারখানার বর্জ্য পরিশোধন না করে নদী বা খালে ফেলা যাবে না।
- ৬। কৃষিকাজে জৈব সার ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাতে হবে।
- ৭। কুয়া বা পুকুরের চারপাশে উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে যাতে বন্যার সময় দূষিত পানি না ঢোকে।
- ৮। নলকূপ উঁচু স্থানে বসাতে হবে যাতে বন্যার পানি প্রবেশ করে নলকূপের পানি দূষিত করতে না পারে।
- ৯। নলকূপের পানি পরীক্ষা করে দেখতে হবে তাতে আর্সেনিকের মাত্রা বেশি আছে কি না। বেশি থাকলে নলকূপটিকে লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে যাতে কেউ এ পানি পান না করে।
- ১০।
পক্লীয় অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে যাতে জলোচ্ছ্বাস ও সুনামির পানি স্থলভাগে প্রবেশ করতে না পারে।

উ

অনুসন্ধান ২.১৪: পানি বিশুদ্ধকরণ

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

বিভিন্ন কারণে পানি দূষিত হয়। এই দূষিত পানি পান করলে বিভিন্ন রোগ যেমন, ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, জন্ডিস ইত্যাদি হয়। পানি বাহিত রোগ থেকে বাঁচার জন্য পরিকল্পনা ও নিরাপদ পানি পান করা উচিত। দূষিত পানি কী কী উপায়ে এবং কীভাবে বিশুদ্ধ করা যেতে পারে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন

দূষিত পানিকে কী কী উপায়ে এবং কীভাবে বিশুদ্ধ করা যায় তা নিয়ে পরীক্ষা করা দরকার। আপনারা আপনাদের বাড়িতে বা নিজ জীবনে এটা কীভাবে করে থাকেন তা নিয়ে একে অপরের সাথে আলোচনা করুন। শ্রেণি কক্ষে কাজটি কীভাবে করা যেতে পারে তার পরিকল্পনা ও স্বপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন। ছাকন, থিতানো, ফুটানো ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে যে বিশুদ্ধ করা যায় তা বলুন। চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি ভিন্ন রকমও হতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

- ১। একটি দূষিত ও অপরিষ্কার পানি পূর্ণ পাত্র নিন।

২। আরেকটি খালি পাত্রের মুখ পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে নিন।

৩। এবার পাতলা কাপড় দিয়ে মুখ মোড়ানো পাত্রে দূষিত ও অপরিষ্কার পানি পূর্ণ পাত্র থেকে পানি ধীরে ধীরে ঢালুন এবং শিক্ষার্থীদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।

ধারণা গঠন

ছাঁকনের পর পানি কেমন দেখাচ্ছে? ছাঁকনের পর পাতলা কাপড় বা ছাঁকনিতে কিছু দেখা যাচ্ছে কী না? আপনারা কী মনে করেন ছাঁকনের মাধ্যমে প্রাপ্ত পানি পান করা নিরাপদ? কেন নিরাপদ নয়? ছাঁকনের মাধ্যমে কঠিন ও দানাদার বস্তু দূর করা যায়। কিন্তু জীবাণু অথবা অত্যন্ত ক্ষুদ্র কণা দূর করা যায় না। তাহলে আমরা কীভাবে জীবাণু ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কণা দূর করতে পারি?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম যে, উপরোক্ত বিভিন্ন ছাঁকন পদ্ধতিতে অপরিষ্কার পানি থেকে বিভিন্ন কঠিন ও দানাদার ময়লা দূর করা যায়। আপনি বাসায় পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য কি উপায় গ্রহণ করবেন যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করুন?

বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্ধন

পানি শোধন

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের জীবাণু ও ক্ষতিকর পদার্থমুক্ত পানি পান ও ব্যবহার করতে হবে। উপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করলেও উন্মুক্ত জলাশয়ের পানিকে পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত রাখা যায় না। তাই পানিকে পান বা ব্যবহার করার পূর্বে শোধন করে নিতে হয়। বিভিন্ন উপায়ে পানিকে একমাত্র পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানি বিশুদ্ধ করা যায়। তাই এখানে শোধন করা হয়েছে। নিচে এ উপায়গুলো বর্ণনা করা হলো।

- ১। **ছাঁকন :** পুকুর, খাল-বিল ও নদীর পানিতে কাদা ও ময়লা মিশে থাকে। পাতলা কাপড় বা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে এ পানি পরিষ্কার হলেও জীবাণুমুক্ত হয় না। আজকাল শহরের অনেক বাড়িতে উন্নতমানের ছাঁকনযন্ত্র বা ফিল্টার রয়েছে। কুমিল্লায় তৈরি চীনা মাটির ফিল্টারও এখন যথেষ্ট জনপ্রিয়। এ ধরনের ফিল্টার দ্বারা পানিকে বেশিরভাগ জীবাণু থেকে মুক্ত করা গেলেও কোনো কোনো জীবাণু রয়ে যেতে পারে। পানিকে পুরোপুরি নিরাপদ করতে হলে পানিকে ফুটাতে হবে।
- ২। **থিতানো:** নদী বা পুকুরের খোলা পানি কোনো কলস বা পাত্রে রেখে দিলে পাত্রের তলায় তলানি জমে এবং উপরের অংশে পানি পরিষ্কার হয়ে যায়। তলানি জমে যাবার পর কলস বা পাত্রটি অল্প কাত করে উপরের পানি অন্য পাত্রে ঢেলে নেওয়া হয়। এভাবে পরিষ্কার পানি আলাদা করার পদ্ধতিকে থিতানো বলে। পাত্রের পানিতে অল্প ফিটকিরি দিলে তাড়াতাড়ি তলানি জমে এবং পানি কিছুটা জীবাণুমুক্ত হয়।
- ৩। **ফুটানো:** পুকুর, নদী বা ট্যাপের পানি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করতে চাইলে পানিকে ফুটাতে হবে। পানি ফুটতে শুরু করলে আরো ২০ মিনিট তাপ দিলে পানিতে থাকা জীবাণু মারা যায়। এরপর পানিকে ঠাণ্ডা করে ছেঁকে পান করলে তা নিরাপদ।
- ৪। **রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে পানি বিশুদ্ধকরণ:** অনেক সময় বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের কারণে পানি ফুটানো সম্ভব হয় না। তখন ফিটকিরি, ব্লিচিং পাউডার, হ্যালোজেন ট্যাবলেট ইত্যাদি

পরিমাণমতো মিশিয়ে পানিকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। বড় বড় শহরে নদীর পানি শোধন করে ঘরে ঘরে সরবরাহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ছাঁকন ও থিতানোর পর ক্লোরিন মিশিয়ে পানিকে নিরাপদ করা হয়। এজন্য ঢাকা শহরে সরবরাহকৃত পানিতে কখনো কখনো ক্লোরিনের গন্ধ পাওয়া যায়।

আর্সেনিকযুক্ত পানি বিশুদ্ধ বা নিরাপদ করা যায় কি?

আর্সেনিকযুক্ত পানি বিশুদ্ধ করা খুবই কঠিন। উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোতে পানিকে আর্সেনিকমুক্ত করা যায় না। ফুটালে বা প্রচলিত রাসায়নিক পদার্থ যোগ করলে পানিকে আর্সেনিকমুক্ত করা যায় না। কেবল একধরনের বিশেষ ফিল্টারের সাহায্যে পানি ছাঁকলে বা ফিল্টার করলে পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা কমিয়ে পানিকে পানযোগ্য করা যায়। বাংলাদেশের দুই উদ্ভাবক অধ্যাপক আবুল হুসাম ও ডা. এ কে এম মুনির আর্সেনিকমুক্ত করার সনো-ফিল্টার উদ্ভাবন করেন।

পানির অপচয় রোধ

পৃথিবীর পৃষ্ঠের চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ পানি হলেও ব্যবহার উপযোগী পানি কিন্তু সীমিত। বিশেষ করে পানের যোগ্য পানি খুবই সীমিত। বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের বেশিরভাগ গৃহে যে পানি সরবরাহ করা হয় তার উৎস ভূ-গর্ভ। এমনিতেই নানা কারণে ভূ-গর্ভের পানির স্তর নেমে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আমরা যদি বেহিসেবি পানি খরচ করি তাহলে কিছুদিন পর আর ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা যাবে না। তাই পানি ব্যবহারে আমাদের হিসেবি হওয়া উচিত। কিছু সহজ অভ্যাসের মাধ্যমে পানির অপচয়/বেহিসেবি ব্যবহার রোধ করা যায়। যেমন- টিউবওয়েল, শাওয়ার/ট্যাপের পানিতে সরাসরি কোনো কিছু না ধুয়ে বালতিতে পানি ধরে তারপর তা ব্যবহার করা (খালা বাসন, হাত-পা ধোয়া বা গোসল করা), ঘরের পানি সরবরাহ লাইনে কোনো ছিদ্র বা লিক থাকলে তা দ্রুত মেরামত করা।

পরিবেশের উপাদান: বায়ু

অনুসন্ধান ২.১৫: বায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

পৃথিবীর সর্বত্র বায়ু আছে। বায়ুকে চোখে দেখা যায় না। অথচ আমরা বায়ুর সমুদ্রে ডুবে আছি। তাহলে কীভাবে বুঝবো যে আমাদের চারপাশে বায়ু আছে?

উপকরণ: পানির বেসিন, কাচের গ্লাস, পানির বোতল, পরিষ্কার কনটেইনার, প্লাস্টিক ব্যাগ, পানি, এক টুকরো কাগজ।

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আমাদের চারপাশে বায়ু আছে কী না তা আপনারা কীভাবে পরীক্ষা করতে পারেন? একে অন্যের সাথে আলাচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন। একটি কাচের গ্লাসের নিচে এক টুকরো কাগজকে আটকে দিয়ে তা পানি ভর্তি একটি পাত্রে উপুড় করে তা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যেতে পারে কী ঘটে?

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে)

- ১। একটি কাচের গ্লাসে বা পরিষ্কার কনটেইনারের নিচে এক টুকরো কাগজ আটকে দিন এবং পরে কাগজ যুক্ত গ্লাসটি পানির মধ্যে উপুড় করে রাখুন। গ্লাসটি পানির মধ্যে উপুড় করার পর কী ঘটবে তা পূর্বানুমান করুন।
- ২। যদি বায়ু কিছু না হয় তাহলে গ্লাসের ভিতরে কাগজের অবস্থা কী ঘটবে? আর যদি বায়ু কিছু একটা হয় তাহলে ভিতরে কাগজের অবস্থা কী ঘটবে?
- ৩। গ্লাসের তলায় কাগজটিকে কুণ্ঠিত করে আটকে দিয়ে এটাকে ধীরে ধীরে খাড়াভাবে পানির নিচে চাপা দিয়ে ধরুন।
- ৪। পানির মধ্য থেকে এটাকে বের করে আনুন এবং দেখুন কাগজের কী ঘটবে? শুকনো নাকি ভেজা?
- ৫। ঠিক একইভাবে অন্য একটি কাচের গ্লাসে বা পরিষ্কার কনটেইনারের নিচে এক টুকরো কাগজকে আটকে দিন এবং কাগজ যুক্ত গ্লাসটিকে পানির মধ্যে ধীরে ধীরে ঠেলে ধরুন। বায়ু বের করার জন্য গ্লাসটিকে একটু কাত করুন। দেখা যাবে পানির মধ্য থেকে কিছু বুদ বুদ বের হচ্ছে।
- ৬। পানির মধ্যে থেকে এটাকে বের করে আনুন এবং কাগজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন।

ধারণা গঠন

প্রথম গ্লাসটির কাগজের কী অবস্থা হয়েছে? পানি কেন কাগজটিকে ভিজাতে পারেনি? ২য় গ্লাসটির কাগজের কী অবস্থা হয়েছে? কেন কাগজটি ভিজে গিয়েছিল? গ্লাস থেকে বের হওয়া বুদ বুদ গুলো আসলে কী? তাহলে কি বোঝা গেল বায়ু দেখা যায় না কিন্তু আমরা তা অনুভব করি। বায়ু এমন একটা কিছু যা জায়গা দখল করে।

ধারণা প্রয়োগ

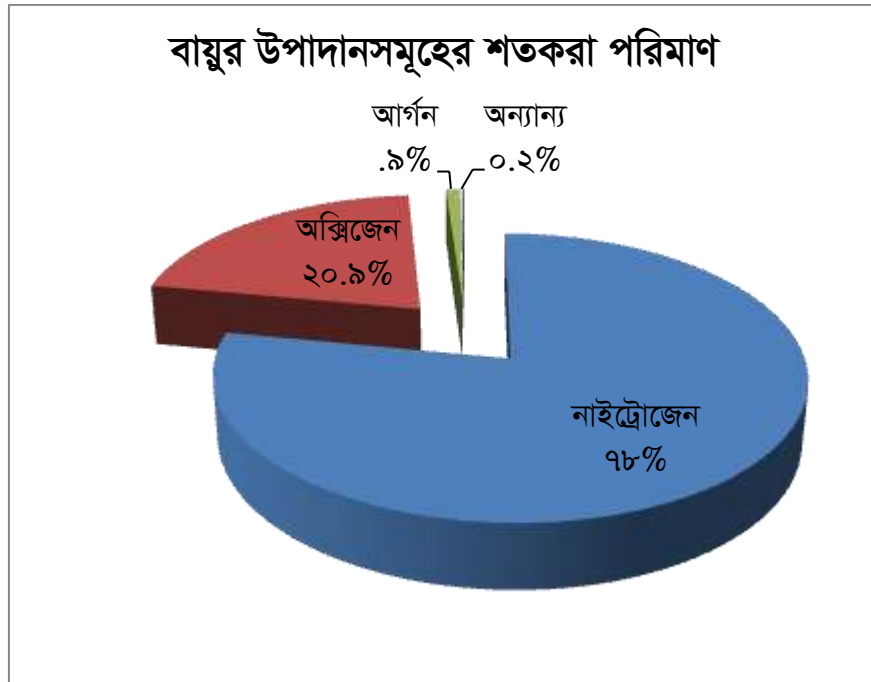
আমরা দেখলাম যে আমাদের চারপাশে সর্বত্র বায়ু আছে। আর কীভাবে আমরা বায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি? আমাদের জীবনে বায়ু কেন প্রয়োজন?

ধারণা পরিবর্ধন

বায়ুর অস্তিত্ব: বায়ু পরিবেশের একটি উপাদান। বায়ুকে আমরা দেখতে পাই না। তবে সহজেই এর অস্তিত্ব বোঝা যায়। ফসলের মাঠে তাকালে দেখা যায় ধান, পাট বা অন্য ফসলের গাছ নড়ছে। গাছপালার দিকে তাকালে দেখা যায় পাতা নড়ছে। আপনার গায়ে কখনো কখনো কিছু একটা যেন আরামদায়ক পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। কে ফসলের গাছ নাড়াচ্ছে, গাছের পাতা নাড়াচ্ছে, কে-ই বা গায়ে পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই বলবেন বায়ু। এভাবে বায়ুর অস্তিত্ব বোঝা যায়। কখনো কখনো গাছের পাতা নড়েনা, গায়ে এসে কোনো কিছু পরশ বুলিয়ে যায় না। আমরা তখন বলি বাতাস নেই। বাতাস নেই অর্থ কি বায়ু নেই? বাতাস নেই অর্থ হলো বায়ুর প্রবাহ নেই। বায়ু প্রবাহিত না হলেও বায়ু আছে। একটি হাতপাখা কিংবা একটি বই হাতে নিয়ে আমাদের গায়ের কাছে নাড়ালেই আমাদের গায়ে বায়ুর পরশ পাই। বুঝতে পারি বায়ু আমাদেরকে ঘিরে আছে। বায়ু সবসময় প্রবাহিত না হলেও পৃথিবীকে ঘিরে আছে বায়ু।

বায়ুর উপাদান

আপনারা জানেন যে, বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন হলো বায়ুর প্রধান দুইটি উপাদান। এছাড়া বায়ুর মধ্যে রয়েছে সামান্য পরিমাণে জলীয়বাষ্প, কার্বন-ডাই অক্সাইড, নিক্রিয় গ্যাস (হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন ইত্যাদি) এবং ধূলিকণা। অবশ্য বায়ুর এ মিশ্রণের অনুপাত একেবারে স্থির নয়—এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, সময়ের ব্যবধানেও বায়ুর গঠন কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। আয়তন এবং ওজন অনুসারে বায়ুতে যে বিভিন্ন উপাদান আছে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার হার নির্ণীত হয়েছে।



অনুসন্ধান ২.১৭: আগুন জ্বালানোর জন্য বায়ুর প্রয়োজন আছে কি?

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

কী কী উপায়ে আপনারা মোমবাতির জ্বলনকে বন্ধ করতে পারেন? বায়ু কি কোনভাবে মোমবাতিকে জ্বলতে সাহায্য করে? একটি জ্বলন্ত মোমবাতিকে একটি কাচের গ্লাস দিয়ে ঢেকে দিলে কতক্ষণ জ্বলতে পারে বলে মনে করেন?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: একটি মোমবাতিকে জ্বলতে হলে বায়ুর প্রয়োজন আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এটা আপনারা কীভাবে করতে পারেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন। একটি মোমবাতিকে জ্বালিয়ে তা বিভিন্ন সাইজের (বড়, ছোট, মাঝারি) গ্লাস দিয়ে ঢেকে দিয়ে মোমবাতি জ্বলনের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন হয় বা কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি অন্যরকমও হতে পারে।

উপকরণ: মোমবাতি, দেয়াশলাই, থালা, বিভিন্ন সাইজের গ্লাস (বড়, ছোট, মাঝারি), ঘড়ি, কাদা/প্লাস্টিক ইত্যাদি।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।):

- ১) থালার মাঝখানে একটু কাদা/প্লাস্টিক আটকে দিন এবং একটি মোমবাতিকে খাড়া ভাবে কাদায় আটকে দিন।
- ২) জ্বলন্ত মোমবাতিকে যদি বিভিন্ন সাইজের গ্লাস দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় তাহলে কি হতে পারে তা সকল কে পূর্বানুমান করতে বলুন।
- ৩) মোমবাতিটিকে জ্বালিয়ে দিন। প্রথমে মাঝারি গ্লাসটি দিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতিটিকে প্রদর্শিত চিত্রের মত করে ঢেকে দিন।
- ৪) মোমবাতিটি কতক্ষণ সময় ধরে জ্বলে তা ঘড়ি দেখে সময় রেকর্ড করুন।
- ৫) এভাবে পয়ত্রিশে দেখে এবং বড় গ্লাসটি দিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে তা ঢেকে দিয়ে কতক্ষণ জ্বলে তা পর্যবেক্ষণ করুন ও সময় রেকর্ড করুন।
- ৬) জ্বলন্ত মোমবাতিকে যদি বিভিন্ন সাইজের গ্লাস দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় তা হলে কী হতে পারে তা সকলকে পূর্বানুমান করতে বলুন।

ধারণা গঠন

১ম পরীক্ষণে কতক্ষণ সময় ধরে মোমবাতি জ্বলেছিলো? ঠিক একই ভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরীক্ষণে মোমবাতি কতক্ষণ জ্বলেছিলো?

মোমবাতি নিভে গেল কেন? গ্লাসের সাইজ যদি ভিন্ন হয় তা হলে জ্বলনের সময়ের ক্ষেত্রে তা কি প্রভাব ফেলবে। কোন গ্লাসটি দিয়ে মোমবাতি ঢাকার ফলে তা আগে নিভে গিয়েছিল? কেন?

ধারণা প্রয়োগ

পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে যখন বায়ু থাকে তখন মোমবাতি জ্বলে। মোমবাতি কতক্ষণ জ্বলবে তা গ্লাস দিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতি ঢেকে দেওয়া পর গ্লাসের ভিতরে বাতাসের পরিমাণ এর উপর

নির্ভর করে। প্রকৃত পক্ষে বায়ুর অক্সিজেনের পরিমানের উপর নির্ভর করে। তাহলে কি গ্লাসের বিভিন্ন সাইজ আগুন কতক্ষণ জ্বলবে তাতে পার্থক্য সৃষ্টি করে?

অনুসন্ধান ২.১৮: বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি

অনুসন্धानে আহবান

বায়ুর কয়েকটি উপাদান আছে। যেমন অক্সিজেন বায়ুর একটি উপাদান। তেমনি কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে বায়ুর অন্যতম একটি উপাদান। তাহলে কীভাবে প্রমাণ করা যায় যে বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এটা আপনারা কীভাবে করতে পারেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন। একটি পাত্রে কিছু বেকিং পাউডার রেখে তার সাথে ভিনেগার যোগ করে কিছুক্ষণ পর তার উপর একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই পাত্রের মুখের উপরে ধরলে কি অবস্থা হবে তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে) :

- ১) একটি পাত্রে কিছু বেকিং পাউডার রেখে তার সাথে ভিনেগার যোগ করুন।
- ২) এক মিনিট পর একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই পাত্রের মুখের সামানে ধরলে কী হতে পারে তা পূর্বানুমান (**predict**) করতে বলুন।
- ৩) কি ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করুন।

ধারণা গঠন

পাত্রের বেকিং পাউডার এবং ভিনেগার কি উৎপন্ন করেছিলো? আগুন নিভে গেল কেন?

ধারণা প্রয়োগ

আগুনের জন্য অক্সিজেনের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। কীসের উপস্থিতি আগুনকে নিভিয়ে দিতে সাহায্য করে?

ধারণা পরিবর্ধন

বায়ুর প্রয়োজনীয়তা

বায়ুর প্রয়োজনীয়তা অনেক। আমরা যদি বায়ুর তিনটি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা জানতে পারি তাহলে সহজেই বুঝতে পারব এর ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ।

অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা: শ্বাস নেওয়া ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না। শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি। সেই অক্সিজেন কোষে গিয়ে খাদ্য থেকে পাওয়া গ্লুকোজকে ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করে। সেই শক্তি আমাদের দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে, দেহের বিভিন্ন কাজ ও আমাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য শক্তি যোগায়। তাই বায়ুতে অক্সিজেন না থাকলে আমরা শক্তি পেতাম না। আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না। এমনিভাবে কোনো জীবই আসলে বেঁচে থাকতে পারত না। আগুন জ্বালাতে অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা মোমবাতি দিয়ে পরীক্ষণের মাধ্যমে সহজেই বোঝা গেছে। আগুন জ্বালাতে না পারলে কী হতো? খাবার রান্না করতে পারতাম না। কলকারখানা চলত না, বেশিরভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যেত। কোনো ইঞ্জিনই চলত না। আমরা এখনো আদিম থেকে যেতাম।

কার্বন-ডাই অক্সাইডের প্রয়োজনীয়তা: নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, গাছপালা কি খাদ্য সংগ্রহের জন্য মানুষের মতো চারিদিকে চলাফেরা করতে পারে? তারা কীভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে? গাছের পাতার ক্লোরোফিল সূর্যের আলোর সাহায্যে কার্বন-ডাই অক্সাইড ও পানি থেকে খাদ্য প্রস্তুত করে। উদ্ভিদের তৈরি খাদ্য জমা হয় শস্যদানায় ও উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে। মানুষ ও অন্যান্য অনেক প্রাণী শস্য ও শাকসবজি খেয়ে বেঁচে থাকে। তাই সকল জীবের খাদ্য সরবরাহের জন্য কার্বন-ডাই অক্সাইড অত্যাবশ্যক।

নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তা : বায়ুর নাইট্রোজেন মাটিতে নানাভাবে মেশে। আবার ইউরিয়া (ইউরিয়া নাইট্রোজেন থেকে উৎপাদিত হয়) মিশিয়েও মাটিতে নাইট্রোজেন দেয়া হয়। মাটির নাইট্রোজেন উদ্ভিদের পাতার সবুজ অংশ অর্থাৎ ক্লোরোফিল তৈরি করে। কার্বন-ডাই অক্সাইড আর পানি থেকে উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি হয় পাতার সবুজ অংশে। নাইট্রোজেন না থাকলে ক্লোরোফিল বা পাতার সবুজ অংশ তৈরি হতো না। সবুজ অংশ না তৈরি হলে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করতে পারত না। মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীরাও খাদ্য পেত না।

আপনারা দেখলেন যে, বায়ুর তিনটি প্রধান উপাদান উদ্ভিদ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য খুব দরকার। পানির মতো বায়ুও জীবের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। উপরের প্রয়োজনগুলো ছাড়াও বায়ুকে আমরা নানাভাবে ব্যবহার করি।

বায়ুর উপাদানসমূহের ব্যবহার

অক্সিজেনের ব্যবহার

- যে সমস্ত রোগী শ্বাসকষ্টে ভোগে তাদের জন্য সিলিভারের তরল অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়।
- উঁচু পর্বতের আরোহীরা সিলিভারের অক্সিজেন ব্যবহার করে থাকেন।
- বিমান চালক ও উঁচু আকাশে ভ্রমণকারী যাত্রীগণ সিলিভারের অক্সিজেন ব্যবহার করে থাকেন।
- ডুবুরিরা নদী বা সমুদ্রের তলদেশে কোনো কিছুর সন্ধানে গেলে অক্সিজেন সিলিভার ব্যবহার করে থাকেন।
- নানান প্রকার ঝালাইয়ের কাজে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়।
- খনিজ সম্পদ আহরণের সময় শ্রমিকরা সিলিভারের অক্সিজেন ব্যবহার করে থাকে।
- অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা অক্সিজেন মুখোশ ব্যবহার করে থাকেন।

কার্বন ডাই অক্সাইডের ব্যবহার

- আগুন নেভানোর কাজে কার্বন-ডাই অক্সাইড ব্যবহার করা হয়।
- ঠাণ্ডা পানীয় যেমন-কোকাকোলা, আরসি, ফান্টা, সেভেন-আপ ইত্যাদিতে কার্বন-ডাই অক্সাইড ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রোজেনের ব্যবহার

- ইউরিয়া সার উৎপাদনের প্রধান উপাদান হিসেবে নাইট্রোজেন ব্যবহার হয়।
- খাবার (মাছ, মাংস, ফল, সবজি ইত্যাদি) বিশেষ করে পচনশীল খাদ্য সংরক্ষণে নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়।
- খাবার (চিপস, ক্রিস্পি) টাটকা রাখতে প্যাকেটে নাইট্রোজেন ব্যবহার হয়।

অনুসন্ধান ২.১৮: বায়ু দূষণ ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

আমাদের শ্বাসকার্য চালানোর জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন। দূষিত বায়ু থেকে নানা ধরনের রোগ হতে পারে। বিভিন্নভাবে বায়ুতে নানা কিছু যোগ হতে পারে। আবার কখনো কখনো বিভিন্ন কারণে বায়ুর উপাদানগুলোর পরিমাণ কমে বা বেড়ে যেতে পারে। বায়ুর উপাদানের স্বাভাবিক মিশ্রণের পরিবর্তন হওয়াকে বায়ু দূষণ বলে। প্রশ্ন হচ্ছে বায়ু কীভাবে দূষিত হয়? পরিবেশের উপর দূষিত বায়ুর প্রভাবে কী হতে পারে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন : বিভিন্ন কারণে বা বিভিন্নভাবে বায়ু দূষিত হতে পারে। দূষিত বায়ু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এজন্য বায়ু দূষণের কারণ গুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। কীভাবে বায়ু দূষণের কারণ গুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। এক্ষেত্রে বায়ু দূষণের উপর কোন ভিডিও ক্লিপস দেখানো যেতে পারে অথবা বায়ু দূষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি প্রদর্শন করে প্রথমে একাকী ও পরে জোড়ায় আলোচনা করে বায়ু দূষণের কারণগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে। চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি অন্যরকমও হতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

- ১। বায়ু দূষণ সম্পর্কিত ভিডিও বা চিত্র প্রদর্শন করুন।
- ২। বায়ু দূষণের ভিডিও বা চিত্র দেখে বায়ু কীভাবে দূষিত হচ্ছে তা জোড়ায় আলোচনা করে তার কারণ নিচের ছকে উল্লেখ করুন।

কী কী কারণে বায়ু দূষিত হয় ?

- ৩। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দল গঠন করে দলগতভাবে আলোচনা করে বায়ু দূষণের কারণগুলোর মধ্যে কোনগুলো মানবসৃষ্ট ও কোনগুলো প্রাকৃতিক তা নিচের ছক অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করুন।

মানবসৃষ্ট কারণ	প্রাকৃতিক কারণ

- ৪। এবার অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।

- ৫। আপনার দলের ছকের সাথে ৩টি করে নতুন কারণ যোগ করুন।

ধারণা গঠন

বায়ু দূষণের উপর ভিডিও বা চিত্র দেখে বায়ু দূষণের কী কী কারণ পাওয়া গেল। বায়ু দূষণের সাথে মানুষের সম্পর্ক কী? বায়ু দূষণের ফলে মানুষ ও পরিবেশের উপর কী কী প্রভাব পড়ছে?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম যে, বিভিন্ন কারণে বায়ু দূষিত হয়। এর মধ্যে মানবসৃষ্ট কারণ ও প্রাকৃতিক কারণ উল্লেখযোগ্য। তাহলে কীভাবে বায়ু দূষণ রোধ করা যেতে পারে?

ধারণা পরিবর্ধন

বায়ুদূষণ কী

স্বাভাবিক বায়ু আমাদের জন্য খুবই উপকারী। কিন্তু বিভিন্নভাবে বায়ুতে নানা কিছু যোগ হতে পারে। আবার বিভিন্ন কারণে বায়ুর উপাদানগুলোর পরিমাণ কমে বা বেড়ে যেতে পারে। বায়ুর স্বাভাবিক গঠন পরিবর্তন হলে তা পরিবেশ ও আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বায়ুর উপাদানের স্বাভাবিক মিশ্রণের পরিবর্তন হওয়াকে বায়ুদূষণ বলে। আর পরিবর্তিত বায়ু যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর তাকে দূষিত বায়ু বলে।

বায়ুদূষণের কারণ ও তার ক্ষতিকর প্রভাব: প্রাকৃতিক কারণে কখনো কখনো বায়ু দূষিত হতে পারে। যেমন-আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাস বায়ুতে মিশে। তবে বায়ু প্রধানত দূষিত হয় মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে। আপনারা দেখেছেন আধা শুকনা গাছের ডাল ও পাতা পোড়ালে কেমন ধোঁয়া হয়? কাছে গেলে ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে। তেমনি ইটের ভাটা, কলকারখানা, বাস, রেলগাড়ি, টেম্পো, বেবিট্যাক্সি থেকে কালো ধোঁয়া বাতাসে মেশে। এরকম ধোঁয়ায় থাকে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন কণা, কার্বন-ডাই অক্সাইড। এরকম কালো ধোঁয়া মিশলে বায়ু দূষণ হয়।

কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হওয়ার আরেকটা স্থান হলো রান্নার চুলা। চুলায় প্রাকৃতিক গ্যাস বা কাঠ পোড়ানোর সময় পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাবে তা ভালোভাবে না পুড়ে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন করে। উৎপন্ন কার্বন মনোক্সাইড বেশ বিষাক্ত এবং মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বায়ুতে কার্বন-ডাই অক্সাইড বেড়ে গেলে বায়ু দূষিত হয়। এ সম্পর্কে আবহাওয়া ও জলবায়ু অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। জীবাশ্ম জ্বালানি অর্থাৎ কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানোই বায়ুতে কার্বন-ডাই অক্সাইড বৃদ্ধির কারণ। আবার কয়লা পোড়ালে এতে মিশে থাকা সালফার পুড়ে বায়ুতে সালফারের অক্সাইড নির্গত হয়। সালফারের অক্সাইডসমূহ বৃষ্টির পানিতে মিশে বৃষ্টির পানিকে এসিডযুক্ত করে। একে এসিড বৃষ্টি বলে। এভাবেও বায়ু দূষিত হয়।

যে ব্যক্তি ধূমপান করে তার নানা অসুখ হয়। সাথে সাথে বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া বায়ুকে দূষিত করে। ফলে কাছের মানুষদেরও ক্ষতি হয়। আবার যক্ষ্মা ও বসন্ত রোগীদের হাঁচি-কাশি থেকে জীবাণু মিশে বায়ুকে দূষিত করে। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেললে ও পায়খানা-প্রস্রাব করলে বায়ুতে দুর্গন্ধ ছড়ায়। এভাবেও বায়ু দূষিত হয়।

আমরা জানি যে, দূষিত বায়ু মানুষের শ্বাসকার্যে ব্যাঘাত ঘটায় এবং দেহে নানান রোগ সৃষ্টি করে। দূষিত বায়ুর ধূলিকণা, ধাতব কণা, নানাবিধ বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদির প্রভাবে মানবদেহে এলার্জি, কাশি, হাঁপানি, ব্রংকাইটিস, উচ্চ রক্তচাপ, মাথাব্যথা, ফুসফুসে ক্যানসার, দেহের আঙ্গিক বিকৃতি ইত্যাদি মারাত্মক রোগের কারণ। বায়ুদূষণের ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। অনেক উপকারী কীটপতঙ্গ, পাখি, জীবজন্তু প্রভৃতি মারা গিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হতে পারে। বর্তমানে সারা বিশ্বে বহুল আলোচিত “বৈশ্বিক উষ্ণায়ন” বায়ুদূষণেরই ফলাফল। বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাবের হাত থেকে বাঁচার জন্য বায়ুদূষণ রোধ করা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব। তাই এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসা উচিত।

অনুসন্ধান ২.১৯: বায়ু দূষণ রোধের উপায়

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

দূষিত বায়ু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এখন প্রশ্ন হলো কীভাবে বায়ু দূষণ রোধ করা যায়।

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: বিভিন্ন কারণে বা বিভিন্নভাবে বায়ু দূষিত হতে পারে। দূষিত বায়ু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এজন্য বায়ু দূষণের কারণ গুলো চিহ্নিত করে তা রোধ করা প্রয়োজন। কীভাবে বায়ু দূষণ রোধ করা যেতে পারে? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। এক্ষেত্রে বায়ুদূষণ রোধের উপর কোন ভিডিও ক্লিপস দেখানো যেতে পারে অথবা শিক্ষার্থীদেরকে বায়ু দূষণের কারণ সম্বলিত ছবি দেখিয়ে তাদেরকে বায়ু দূষণ রোধের সম্ভাব্য উপায় বলতে বলা যেতে পারে। চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি অন্যরকমও হতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে)

- ১। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দলে ভাগ করে দলগতভাবে আলোচনা করে তাদেরকে বায়ু দূষণের কারণ, ক্ষতিকর দিক ও দূষণ বন্ধ করার উপায়ের নীচের তালিকাটি তৈরী করুন।

বায়ু দূষণের কারণ	বায়ু দূষণের ক্ষতিকর দিক	বায়ু দূষণ বন্ধ করার উপায়

- ২। এবার অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা তালিকাটি পর্যালোচনা করুন।
- ৩। আপনার দলের তালিকার সাথে ২টি করে বায়ু দূষণের নতুন কারণ, ক্ষতিকর দিক এবং বন্ধ করার উপায় যোগ করুন।
- ৪। বায়ু দূষণ রোধকল্পে অন্যকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন তা বলতে বলুন ও এ সম্পর্কে তাদের ধারণা বিনিময় করতে বলুন। (বিভিন্ন স্লোগানসহ পোস্টার তৈরি করানো যেতে পারে যেমন- যেখানে সেখানে থুথু ফেলবেন না, নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলুন ইত্যাদি)।

ধারণা গঠন

বায়ু দূষণের উপর ভিডিও বা চিত্র দেখে কী কী উপায়ে বায়ু দূষণ রোধের করা যেতে পারে। বায়ু দূষণের ফলে পরিবেশের কি কি ক্ষতি হতে পারে?

ধারণা প্রয়োগ

বায়ু দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আপনার পরিবারের সদস্যদের কীভাবে সচেতন করবেন? মানবসৃষ্ট বায়ু দূষণ রোধে আমরা কি কি পদক্ষেপ নিতে পারি?

ধারণা পরিবর্তন

বায়ুদূষণ প্রতিরোধ

বায়ুদূষণ কীভাবে হয় তা মনে রাখলে বায়ুদূষণ প্রতিরোধ করা যায়। নিম্নে উল্লেখিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বায়ুকে দূষণমুক্ত রাখা যেতে পারে—

- মাত্রাতিরিক্ত শিল্প কারখানা তৈরি না করে এবং কলকারখানা, যানবাহন প্রভৃতির পরিত্যক্ত ধোঁয়া বিশেষ পদ্ধতিতে পরিস্রুত করে নির্গমনের ব্যবস্থা করে।
- বনভূমি সংরক্ষণ করে এবং নিয়মিত ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে নতুন বনভূমি সৃষ্টি করে।
- কালো ধোঁয়া উৎপাদনকারী ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে এবং কম জ্বালানি ব্যবহার হয় এমন উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।
- জ্বালানিকার্যে সৌরশক্তি ও অন্যান্য পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা করে।
- পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে এবং রাসায়নিক কারখানা ও পারমাণবিক কেন্দ্রের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- ধূমপান না করে, বিশেষ করে অন্য মানুষের নিকটে বা বন্ধ স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ করে।
- রান্নাঘরে বায়ু চলাচলের ভালো ব্যবস্থা তৈরি করে।
- সর্বোপরি গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে বায়ুদূষণের ভয়াবহ ফলাফল এবং রোধের উপায় সম্পর্কে সমগ্র বিশ্ববাসীকে সচেতন করে।

অধ্যায় ৩

খাদ্য ও পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যবিধি

একজন মানুষের নিরাপদ ও সুস্থভাবে জীবন যাপনের জন্য তার জানা প্রয়োজন কোন খাদ্য গ্রহণে কোন পুষ্টি পাওয়া যাবে, কোন পুষ্টি উপাদান আমাদের কোন কাজে লাগে, কীভাবে রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং কোন দূর্ঘটনায় পড়লে তার প্রাথমিক চিকিৎসা কী? এ অধ্যায়ে এ বিষয়গুলো খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি এবং প্রাথমিক চিকিৎসা এ তিনটি থিমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত অনুসন্ধান

অনুসন্ধান ৩.১: খাদ্যে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট এর উপস্থিতি প্রমাণ করা।

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

আমাদের দৈনিক খাদ্যের উপাদানগুলোর মধ্যে শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। কোন কোন খাদ্যে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট আছে? কী করে জানবেন?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: কোন কোন খাদ্যে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট আছে তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এটা আপনারা কীভাবে করবেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।):

১. একটি টেস্টিউবে ভাতের মাড়, একটিতে ছেঁড়া খেতলানো পাতা এবং এর অন্য একটি টেস্টিউবে আটা নিন। প্রতি টেস্টিউবে সামান্য পানি মিশান।
২. এবার টেস্টিউব তিনটিতে ২/৩ ফোঁটা আয়োডিন মিশান। পরীক্ষার পূর্বে পূর্বানুমান করুন কোনটি নীল বর্ণ ধারণ করবে।
৩. কী ঘটে পর্যবেক্ষণ করুন।

ধারণা গঠন

১. কোন কোন খাদ্যের নমুনাতে শর্করা আছে বলে মনে হয়? কোনটিতে শর্করা নেই?
২. যদি আয়োডিন মেশানোর পর টেস্ট টিউবের দ্রবণটি নীলবর্ণ ধারণ করে তাহলে উক্ত দ্রবণে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট আছে।

ধারণা প্রয়োগ

একইভাবে বিভিন্ন খাদ্যের নমুনা নিয়ে তাতে আয়োডিন মিশিয়ে পরীক্ষা করুন। প্রতি ক্ষেত্রেই খাদ্যের নমুনাকে গুড়া করে নিন।

১. কোন কোন খাবারে শর্করা আছে তা পূর্বানুমান করুন এবং তার তালিকা তৈরি করুন।
২. এবার আয়োডিন দিয়ে পরীক্ষা করুন।
৩. বিভিন্ন খাদ্য পরীক্ষা করুন এবং পূর্বানুমান সঠিক হয়েছে নাকি ভুল হয়েছে তার তালিকা তৈরি করুন।

অনুসন্ধান ৩.২: খাদ্যে স্নেহ বা চর্বির উপস্থিতি প্রমাণ করা।

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

কোন কোন খাদ্যে স্নেহ বা চর্বি আছে ?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: কোন কোন খাদ্যে স্নেহ পদার্থের উপস্থিতি আছে তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এটা কীভাবে করবেন? একে অপরের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও স্বপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি: (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

১. একটি সাদা রং এর কাগজের উপর এক ফোঁটা সয়বিন তৈল নিন। সাধারণত স্নেহ হচ্ছে তৈল বা চর্বিজাতীয় খাবার।
২. এবার তৈলের ফোঁটার পাশে এক ফোঁটা পানি নিন এবার তা শুকাতে দিন।

ধারণা গঠন

তৈল ও পানির ফোঁটা শুকানোর পর কাগজটি আলোর সামনে ধরুন। এক্ষেত্রে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ?

১. কাগজের উপর পানি ও তৈলের ফোঁটার স্পটের পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করুন। তৈলের স্পটটি থেকে পানির স্পটটি আপনি কীভাবে আলাদা করতে পারেন ?

ধারণা প্রয়োগ

তাহলে কোন কোন খাদ্যে তৈল আছে বলে আপনি মনে করেন? যে সমস্ত খাদ্যে তৈল আছে সেগুলির একটি তালিকা তৈরি করুন এবং পরীক্ষা করুন। এজন্য প্রতিটি খাদ্যের একটি ছোট নমুনা নিয়ে তা কাগজের উপর একটু ঘষুন এবং কোন খাদ্যের দলে কাগজে তৈলাক্ত দাগের সৃষ্টি হয় তার রেকর্ড সংরক্ষণ করুন। আপনার প্রাপ্ত ফলাফল হতে কি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তা নিয়ে চিন্তা করুন।

খাদ্য ও পুষ্টির ধারণা পরিবর্ধন

প্রাণীকে বেঁচে থাকতে হলে খাদ্যের প্রয়োজন। প্রাণীদেহের বৃদ্ধি, শক্তির জন্য খাদ্য অপরিহার্য। মানব দেহকে সুস্থ সবল রাখার জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন। পরিবেশের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে আমরা নানা রকম খাদ্য দ্রব্য পেয়ে থাকি। উদ্ভিদ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য যেমন, চাল, ডাল, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদিকে উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্য এবং প্রাণী থেকে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্যসমূহ যেমন, ডিম, দুধ, মাংস ইত্যাদিকে প্রাণীজ খাদ্যদ্রব্য হিসেবে ধরা হয়। আমরা বিভিন্ন খাদ্যের তালিকা তৈরি করে তা বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করতে পারি। আবার আমরা যদি পুষ্টির কথা চিন্তা করি তাহলে খাদ্যকে ৬টি পুষ্টি উপাদানের ভিত্তিতে ভাগ করা যায়। এই ৬টি পুষ্টি উপাদান হল: আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি।

খাদ্য ও পুষ্টি

আমরা যদি একটু ভেবে দেখি, ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে? কয়লা, ডিজেল, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি জ্বালানী ব্যবহার করে ইঞ্জিন চালানো হয়। আসলে জ্বালানীর কাজ কী? এ জ্বালানী পুড়ে শক্তি উৎপাদন করে। এ শক্তি ইঞ্জিনগুলোকে কাজ করতে সাহায্য করে। মানব দেহ অনেকটা একটি ইঞ্জিনের মত। অন্যান্য ইঞ্জিনের মতো আমাদের দেহ নামক ইঞ্জিনকে চালানোর জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। তাহলে

মানব দেহ কোথা হতে এ শক্তি পায়? আমরা প্রতিদিন যে খাদ্য খাই তা দেহের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে এবং শক্তি যোগায়। আমরা মূলত উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে খাদ্য পাই। খাদ্য বিভিন্ন যৌগের সমন্বয়ে গঠিত হয়। খাদ্য বলতে সেই জৈব উপাদানকে বুঝায়, যেসব দ্রব্য আহার করলে জীবের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন হয় এবং এর মাধ্যমে দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে। যেমন, ভাত, মাছ, ডাল, মাংস, রুটি, দুধ, ডিম, পানি, ফলমূল, শাক সবজি ইত্যাদি।

পুষ্টি কী?

পুষ্টি হলো একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াতে খাদ্য বস্তু খাওয়ার পর পরিপাক হয় এবং খাদ্য ভেদে সরল উপাদানে পরিণত হয়। এ সরল উপাদান দেহ কোষ শোষণ করে নেয়। শোষিত হওয়ার পর খাদ্যের উপাদান দেহের সকল অঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের পুনর্গঠন ও দেহ বৃদ্ধির জন্য নতুন কোষ তৈরি করে ও তাপ সৃষ্টি করে, রোগ প্রতিরোধ করে এবং স্বাস্থ্য ভাল রাখে।

কোন খাদ্যে কী পরিমান ও কত রকম খাদ্য উপাদান থাকে তার উপর নির্ভর করে ঐ খাদ্যের পুষ্টিমান বা পুষ্টিমূল্য। তাই কোন খাদ্য উপাদানের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জানতে হলে ঐ খাদ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। খাদ্যের প্রকৃতি বলতে এটা কি মিশ্র খাদ্য নাকি বিশুদ্ধ খাদ্য তাকে বোঝায়। মিশ্র খাদ্যে একের অধিক পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। যেমন- দুধ, সিম, খিচুড়ি, পেঁয়াজ ইত্যাদি। অন্যদিকে বিশুদ্ধ খাদ্যে শুধুমাত্র একটি খাদ্য উপাদান থাকে। যেমন- চিনি, গ্লুকোজ। এতে শর্করা ছাড়া আর কোন উপাদান থাকে না।

পুষ্টি উপাদান

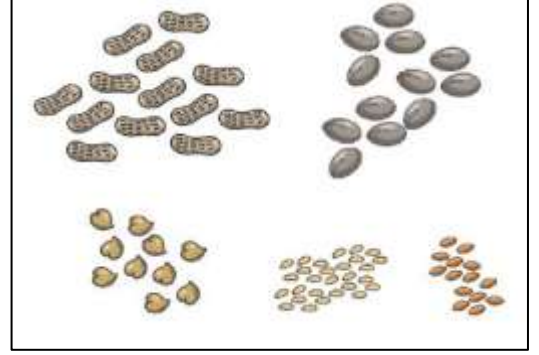
খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এ রাসায়নিক উপাদানগুলোকে খাদ্য উপাদান বা পুষ্টি উপাদান বলা হয়। খাদ্য থেকেই আমরা বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান পেয়ে থাকি। পুষ্টি উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হল-

১. আমিষ বা প্রোটিন- যা ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও দেহ গঠন করে।
২. শর্করা বা শ্বেতসার- এ ধরনের খাদ্য শক্তি উৎপাদন করে।
৩. স্নেহ বা চর্বি- যা তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে।
৪. খাদ্য প্রাণ বা ভিটামিন- রোগ প্রতিরোধ, শক্তি বৃদ্ধি, বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদ্দীপনা যোগায়।
৫. খনিজ লবণ- বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ার অংশ নেয়।
৬. পানি- এটি সরাসরি পুষ্টি উপাদান না হলেও দেহে পানির সমতা রক্ষা করে কোষের গুণাবলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষ অঙ্গাণুসমূহকে ধারণ ও তাপের সমতা রক্ষা করে।

বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান ও উৎস

আমিষ বা প্রোটিন

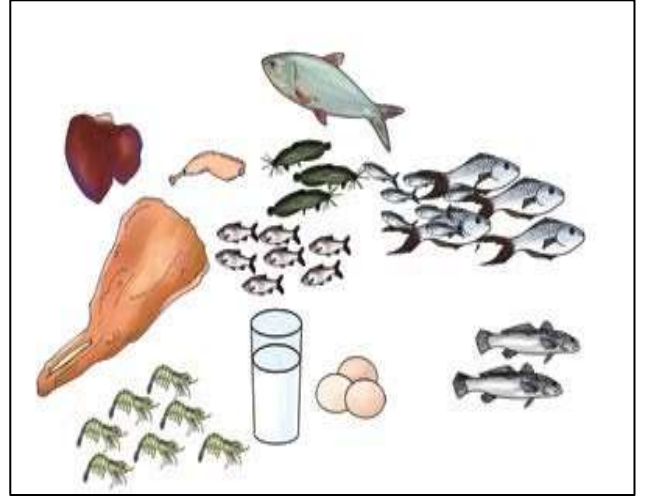
আমিষ আমাদের দেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ এবং বৃদ্ধি সাধন করে। আমিষ হলো অ্যামাইনো এসিডের একটি জটিল যৌগ। পরিপাক প্রক্রিয়া দ্বারা আমিষ বা প্রোটিনজাতীয় খাবার দেহে শোষণ উপযোগী অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। এ অ্যামাইনো এসিড আমাদের শরীরে প্রোটিন গঠন করে। সবশেষে সেই প্রোটিন আমাদের দেহ কোষ গঠন করে।



চিত্র ৩.১: উদ্ভিজ্জ প্রোটিন

আমিষ বা প্রোটিনের উৎস

প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের খাদ্য থেকে আমরা আমিষ পেয়ে থাকি। উদ্ভিদ থেকে যে আমিষ পাওয়া যায় তাকে উদ্ভিজ্জ আমিষ বলে। যেমন- মটরশুটি, ডাল, বাদাম, শিমের বিচি, ছোলা ইত্যাদি হলো উদ্ভিজ্জ আমিষ। আবার প্রাণী থেকে যে আমিষ পাওয়া যায় তাকে প্রাণিজ আমিষ বলে। যেমন- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি।



চিত্র ৩.২: প্রাণিজ প্রোটিন

আমিষের প্রয়োজনীয়তা

আমিষের কাজ: আমিষের কাজ মূলত:

দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ত তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ

করা। আমিষ এ কাজগুলো করে থাকে নতুন কোষ, অ্যান্টিবডি, জারক রস ও হরমোন তৈরির মাধ্যমে। এছাড়াও দেহে শক্তির অভাব দেখা দিলে আমিষ ভেঙ্গে গিয়ে শক্তি উৎপাদন করে।

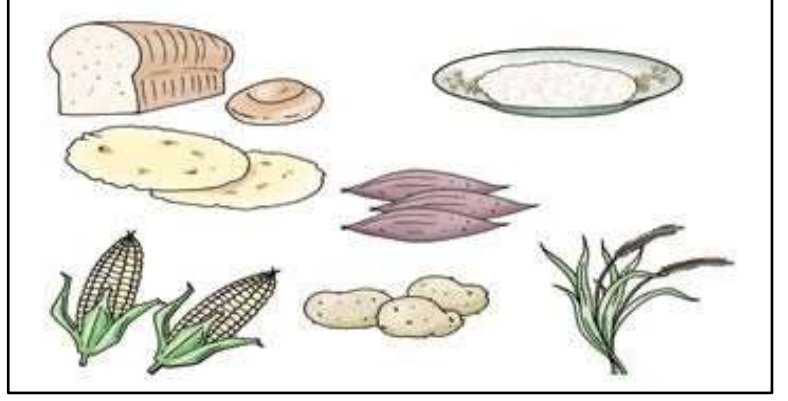
খাদ্যে আমিষের অভাবের ফল: আমিষ দেহ গঠনের ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। শিশুর খাদ্যে আমিষের অভাব হলে তাদের দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ফলে তাদের ওজন হ্রাস পায়, ত্বক ও চুলের রং ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দিক থেকেও শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। মেজাজ খিটখিটে হয়। সাধারণত ২-৪ বছর বয়সে শিশুদের আমিষের অভাব হলে কোয়াশিয়রকর রোগ হয়। এ রোগে শিশুর বৃদ্ধি হ্রাস পায়, পেটের পীড়াও দেখা যায়। পেশি ক্ষয় হতে থাকে, পানি জমে শরীর ফুলে যায়। এছাড়া আমিষের অভাবে মেরাসমাস রোগও দেখা দিতে পারে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে আমিষের অভাব শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়। রক্তস্বল্পতা জনিত রোগ হয়। মায়েদের আমিষের অভাবে মৃত সন্তান, গর্ভপাত, অসময়ে অপরিণত শিশুর জন্ম ইত্যাদির হার বেড়ে যায়।

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান গুলোর মধ্যে শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে। সকল শর্করাই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, আলু, পাউরুটি ইত্যাদি শর্করা জাতীয় খাদ্য। শর্করা শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য। শর্করা

দেহের কর্মক্ষমতা যোগায়। যদি আমরা এক চামচ চিনি একটি টেস্ট টিউবে নিয়ে তাপ দেই তাহলে ধীরে ধীরে কালো রং ধারণ করবে এবং পানি বাষ্পে পরিণত হবে। কালো উপাদানটিই হচ্ছে কার্বন। পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত। সামান্য পরিমাণ শর্করা কে তাপ দেয়া হয় তাহলে আবারও কার্বন, পানি ফিরে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ চিনি ও শর্করা উভয়ই হলো কার্বোহাইড্রেট যাতে কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে।

শর্করার উৎস: আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় শর্করা সাধারণত উদ্ভিদ হতে আসে। যেমন- ধান, ভুট্টা, আলু, সবজি, বীজ ইত্যাদি। তবে মাছ ও প্রাণীর যকৃৎ ও বৃক্ক হতে অতি সামান্য পরিমাণ শর্করা পাওয়া যায়।



চিত্র ৩.৩: শর্করা উৎস

শর্করার প্রয়োজনীয়তা

শর্করার কাজ: শর্করার প্রধান কাজ প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করা। এছাড়া দেহের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় ও ধারণ করা, কোষের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অঙ্গাণু গঠন এবং লিপিড মেটাবলিজমে সাহায্য করে।

খাদ্যে শর্করার অভাবের ফল: শর্করাজাতীয় খাবার দেহে শক্তি উৎপাদন ও ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। খাদ্যে শর্করার অভাব হলে দেহে শক্তির ঘাটতি দেখা দেয়। শক্তি সঞ্চয় ও ধারণ ব্যাহত হয় বলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি পেশিসমূহও সুগঠিত হয় না। সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দিক থেকেও শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। মেজাজ খিটখিটে হয়।

স্নেহ বা চর্বি

আমাদের অনেকের কাছেই চর্বিজাতীয় খাবার অনেক পছন্দের। মূলত তৈল ও দুগ্ধজাতীয় খাবার থেকেই আমাদের দেহে প্রয়োজনীয় স্নেহ পদার্থের যোগান ঘটে।

স্নেহ বা চর্বির উৎস: আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় স্নেহ বা চর্বি উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় প্রকার উৎস হতেই আসে। উদ্ভিদজাত বিভিন্ন ধরনের তেল যেমন সয়াবিন তেল, নারিকেল তেল, সরিষার তেল এবং প্রাণীজ দুগ্ধজাত বিভিন্ন খাদ্যবস্তু যেমন দুধ, ঘি, মাখন, পনির ইত্যাদি স্নেহ বা চর্বিও চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

স্নেহ বা চর্বির প্রয়োজনীয়তা

স্নেহ বা চর্বির কাজ: স্নেহ বা চর্বির আমাদের দেহে শক্তি যোগায় এবং দেহের তাপমাত্রা ঠিক রাখে। এছাড়া আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিডসমূহ সরবরাহ করে।

খাদ্যে স্নেহ বা চর্বিৰ অভাবের ফল: খাদ্যে স্নেহ বা চর্বিৰ অভাব হলে দেহে শক্তির ঘাটতি দেখা দেয়। ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যায়, মানসিক বিষন্নতা দেখা দেয়। এমনকি হৃৎপিণ্ডও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

ক্যালরি: খাদ্যের তাপশক্তি মাপার একক হল কিলোক্যালরি। যেসব খাদ্যে শর্করা, আমিষ ও চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকে, সেসব খাদ্যে বেশি ক্যালরি পাওয়া যায়। আর যেসব খাবারে পানি ও সেলুলোজের পরিমাণ বেশি থাকে সেসব খাবারে ক্যালরির পরিমাণ কম থাকে। তেল বা চর্বি জাতীয় পদার্থে ক্যালরির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে।

ভিটামিন

আমাদের দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি উপাদান হল ভিটামিন। দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে এর কার্যকরী ভূমিকা বিদ্যমান। চোখ ও হাড়সহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ সম্পাদনেও সহায়তা করে। ভিটামিন ৬ ধরনের হয়ে থাকে। এগুলো হল: ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, ই এবং ভিটামিন কে। ভিটামিন বি বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন নিয়ে গঠিত হয় বলে একে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বলা হয়।

ভিটামিনের উৎস: আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিনসমূহ আমরা উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ উভয় প্রকার খাদ্যদ্রব্য থেকেই পেয়ে থাকি। শাকসবজি, ফলমূল, মাছ, মাংস এবং দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যে ভিটামিন পাওয়া যায়। এবার আমরা বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, এদের উৎস, কাজ এবং অভাবজনিত রোগ সম্পর্কে জানবো।

সারণি ২.১: বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, এদের উৎস, কাজ এবং অভাবজনিত রোগ

খাদ্য দল	উৎস	কাজ	অভাবজনিত রোগ
ভিটামিন এ	ছোট মাছ, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, পালংশাক, দুধ, ডিমের কুসুম ইত্যাদি	দৃষ্টি শক্তির স্বাভাবিকতা বজায় রাখে, সুস্থ ত্বক ও দাঁত গঠন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে	রাতকানা
ভিটামিন বি কমপ্লেক্স	মাছ, কলিজা, দানাশস্য, দুগ্ধজাত খাদ্য, মটরশুঁটি, সবুজ শাকসবজি ইত্যাদি	দেহে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে	বেরিবেরি, মুখে ও জিভে ঘা, অ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতা
ভিটামিন সি	বিভিন্ন শাকসবজি যেমন- টমেটো, বাঁধাকপি, ব্রকলি ইত্যাদি এবং ফল যেমন- পেয়ারা, আমলকী, কমলা, লেবু ইত্যাদি	দেহের বৃদ্ধি সাধন করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং দেহকে কর্মক্ষম রাখতে সহায়তা করে	স্কার্ভি, মাড়ির রোগ
ভিটামিন ডি	মাছের তেল, ডিমের কুসুম, সূর্যরশ্মি ইত্যাদি	হাড়ের বৃদ্ধি ও গঠনে সহায়তা করে	রিকেটস বা হাড় বেঁকে যাওয়া
ভিটামিন ই	উদ্ভিজ্জ তেল, বাদাম, কলিজা ইত্যাদি	রক্ত কোষগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে	দুর্বল পেশি, বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া
ভিটামিন কে	পাতা বিশিষ্ট সবুজ শাকসবজি, টেঁড়স, সয়াবিন ইত্যাদি	কেটে যাওয়া স্থানে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে	যকৃৎের রোগ, রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা কমে যাওয়া

খনিজ লবণ

দেহকোষ ও দেহ তরলের জন্য খনিজ লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, আয়োডিন, লৌহ, সালফার ইত্যাদি লবণ জাতীয় দ্রব্য খাদ্যের সাথে দেহে প্রবেশ করে ও দেহ গঠনে সাহায্য করে। এসব উপাদান দেহে মৌলিক উপাদান হিসেবে থাকে না, অন্য পদার্থের সঙ্গে জৈব ও অজৈব যৌগ রূপে থাকে। প্রধানত দুই ভাবে খনিজ লবণ দেহে কাজ করে। যথা- দেহ গঠন উপাদান রূপে ও দেহ অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

খনিজ লবণের উৎস: আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় প্রকার উৎস হতেই পাওয়া যায়। মাংস, সামুদ্রিক মাছ, ডিম, দুধ, শাকসবজি, খাবার লবণ, আঁখের গুড় এবং ফল খনিজ লবণের প্রধান উৎস।

খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা

খনিজ লবণের কাজ: খনিজ লবণ আমাদের দেহে অস্থি, দাঁত, এনজাইম ও হরমোন গঠনে ভূমিকা রাখে। এছাড়া পেশি সংকোচন নিয়ন্ত্রণ। দেহের জলীয় অংশে সমতা রক্ষা ও বিভিন্ন এনজাইম সক্রিয় রাখার জন্য অপরিহার্য।

খাদ্যে খনিজ লবণের অভাবের ফল: খাদ্যে খনিজ লবণের অভাব হলে হাড় ও দাঁতের সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া খনিজ লবণের অভাবে ক্রোটিনিজম ও গলগণ্ড নামক রোগ হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে খনিজ লবণের অভাবে রক্তস্বল্পতা দেখা দিতে পারে।

পানি

জীবন ধারণের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান হল পানি। জীবন রক্ষার কাজে অক্সিজেন এর পরেই পানির অবস্থান। আমাদের দেহের ৬০-৭০ ভাগই হল পানি। প্রায় সব ধরনের খাদ্যেই কম-বেশি পানি থাকে। তবে আমরা আলাদাভাবে পানি পান করে দেহের চাহিদা মেটাই। দেহ গঠন ছাড়াও পানি দেহের সব অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। পানি দেহে দ্রাবক রূপে কাজ করে। পানির জন্যই দেহে রক্ত সঞ্চালন ও তাপ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। পানি দেহ থেকে দূষিত পদার্থ নিঃসরণের কাজটিও করে থাকে। পানির অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়, বিপাক ক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে। খাদ্য ছাড়া মানুষের পক্ষে কয়েক সপ্তাহ বাঁচা সম্ভব হলেও পানি ছাড়া কয়েক দিনও বাঁচতে পারে না।

আঁশযুক্ত তন্তু বা রাফেজ

শস্যদানা, ফল ও সবজির কিছু অংশ যা হজম বা পরিপাক হয় না এমন তন্তুময় বা আঁশযুক্ত অংশ রাফেজ নামে পরিচিত। ফল ও সবজির রাফেজ মূলত সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর। এটি হজম হয় না, পরিপাকের পরেও অপরিবর্তিত থাকে। তবে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য রাফেজ একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। আঁশযুক্ত খাবার আমাদের কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে রক্ষা করে।

সুষম খাদ্য

সুষম খাদ্য বলতে আমরা সে সকল খাবারকে বুঝি যাতে আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান পরিমাণ মতো থাকে। বিভিন্ন ধরনের খাবার মিশিয়েও সুষম খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে। এ খাদ্যে আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন, আঁশ ও খনিজ লবণের উপাদান থাকা আবশ্যিক। স্বাভাবিক বৃদ্ধি, কর্মশক্তি উৎপাদন ও শরীরকে রোগমুক্ত রাখার জন্য আমাদের নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যিক।

কাজ: সুস্বাদু খাদ্যের তালিকা নির্বাচন

কী করতে হবে:

১. নিচে প্রদত্ত ছকের ন্যায় একটি ছক তৈরি করুন।

বিভিন্ন দলের খাদ্য	খাদ্য দ্রব্যের নাম
আমিষ	
শর্করা	
চর্বি	
ভিটামিন	
খনিজ লবণ	
আঁশজাতীয় খাদ্য	

২. প্রদত্ত খাদ্য তালিকা থেকে উপরোক্ত ছক অনুযায়ী বিভিন্ন দলের খাদ্য নির্বাচন করুন।

খাদ্য তালিকা	মাছ, মিষ্টি কুমড়া, রুটি, মুরগির মাংস, দুধ, ভুট্টা, কাঁঠাল, ডিম, ভাত, ফুলকপি, লালশাক, আলু, পেয়ারা, পালংশাক, শিমের বিচি, পুঁইশাক, বিভিন্ন বীজ, ঘি, আমড়া, গাজর, টমেটো, বরই, কলিজা, সামুদ্রিক মাছ, কচুশাক।
--------------	---

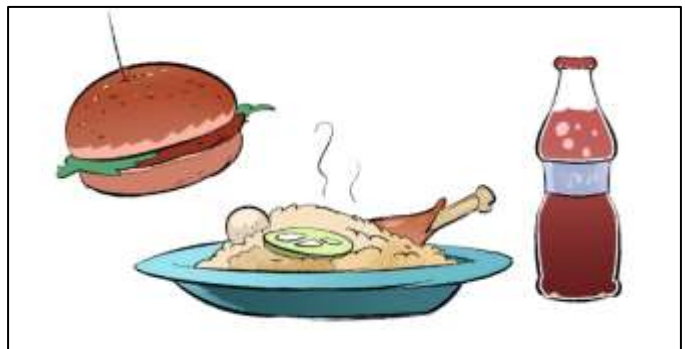
৩. দুপুরের খাবারের জন্য একটি সুস্বাদু খাদ্যের তালিকা তৈরি করুন।

অসুস্বাদু খাদ্য

কোন খাদ্য তালিকায় ৬টি উপাদানের একটি কম থাকলে বা না থাকলে তাকে অসুস্বাদু খাদ্য বা অসম খাদ্য বলে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লকের খাদ্যই অসম। খাদ্যে পুষ্টি উপাদানমুহুরে কোনটি কম থাকলে কিংবা না থাকলে দেহে পুষ্টির অভাব ঘটে। দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবজনিত ঘটনাকে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলা হয়।

জাঙ্ক ফুড

জাঙ্ক ফুড বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় খাবার। তবে জাঙ্ক ফুড সুস্বাদু হলেও সুস্বাদু খাদ্য নয়। এতে অত্যধিক চিনি, শর্করা, লবণ ও চর্বি থাকে যা আমাদের শরীরের পুষ্টির চাহিদা সুস্বভাবে না মিটিয়ে সমস্যা তৈরি করে। সাধারণ খাবারের পরিবর্তে জাঙ্ক ফুড খেলে পুষ্টিহীনতা, ওজন বৃদ্ধি বা মোটা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা হতে



চিত্র ৩.৪: জাঙ্ক খাবার

পারে। জাঙ্কফুড এর মধ্যে যেমন দেশি খাবার রয়েছে তেমন রয়েছে বিদেশী খাবারও। বিদেশী খাবারের মধ্যে রয়েছে চকলেট, আইসক্রীম, বার্গার, পিৎজা, পটেটো চিপস, বিস্কুট, পেস্ট্রি, কোমল পানীয় (যেমন কোকা কোলা, স্প্রাইট, সেভেন আপ, পেপসি কোলা, মোজো) ইত্যাদি। আবার আমাদের দেশীয় খাবার যেমন আলুর চপ, তেহারী, বিরিয়ানী এগুলোও জাঙ্ক ফুড।

খাদ্য সংরক্ষণ

আমরা সবসময় সব ধরনের খাদ্য দ্রব্য পাই না। তাই বিভিন্নভাবে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করতে হয়। চাল, ডাল, গম, ইত্যাদি রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। মাছ, মাংস, সবজি, ফল ইত্যাদি ফ্রিজের ঠাণ্ডায় বেশ কিছুদিন ভাল থাকে। এছাড়া হিমাগাওে শাকসবজি, শস্য ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়। ফল থেকে তৈরি জ্যাম, জেলি, আচার ইত্যাদি বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। আবার চিনি, সিরকা বা তেল দিয়ে জলপাই, বরই, আম ইত্যাদি খাদ্য অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। খাদ্য সংরক্ষণ অপচয় রোধ করে এবং দ্রুত পচন থেকে খাদ্যকে রক্ষা করে।

খাদ্যে রাসায়নিকের ব্যবহার

খাবারকে সংরক্ষণ, আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করতে কোন কোন খাদ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়। যেমন- মিষ্টি, চকলেট, আইসক্রিম, কেক, কোমল পানীয় ইত্যাদিতে কৃত্রিম রং মেশানো হয় যা মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অনেক সময় ফল পাকানোর জন্য কার্বাইড ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়। এছাড়া খাবার সংরক্ষণের জন্য ফরমালিনসহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার মানবদেহের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাবারে এসকল কৃত্রিম রং ও রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের ফলে মানুষের ক্যান্সার, অস্থিরতা, অমনোযোগিতা ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া বৃক্ক ও যকৃত অকার্যকর হবার মতো ঘটনাও দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত অনুসন্ধান

অনুসন্ধান ৩.৩: আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ঘটতে পারে এমন সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ও এর উৎস বা কারণ।

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুর্ঘটনা হঠাৎ করে ঘটে। দুর্ঘটনার ফলে আমাদের শরীর ও সম্পদের ক্ষতি হয়। তাহলে চলুন দেখি কী কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটতে যেতে পারে।

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আপনাদের জীবনে কী কী দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বা ঘটে থাকে তা জানা। এ সকল দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাব্য কারণ এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কোনগুলো তা জানা দরকার। তাহলে কীভাবে তা আপনারা জানবেন সে বিষয়ে এক অন্যের সাথে আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি: (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

কাজ: দৈনন্দিন জীবনে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার একটি তালিকা তৈরি।

কী করতে হবে:

১. নিচে প্রদত্ত ছকের ন্যায় একটি ছক তৈরি করুন।
২. আপনার পূর্বজ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ছকটি পূরণ করুন।

বিপদ বা দুর্ঘটনা	বিপদের সম্ভাব্য উৎস/কারণ	ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ/কাজ

ধারণা গঠন

সচরাচর আমরা যে সকল দুর্ঘটনার শিকার হই সেগুলি তাহলে কী কী? সেগুলোর মধ্যে রয়েছে পুড়ে যাওয়া, কেটে যাওয়া, বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়া, সাপে কাটা, পানিতে ডুবে যাওয়া ইত্যাদি। এ সকল দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন কি ডাক্তার বা হাসপাতালে নেওয়ার আগে রোগীকে কোন প্রকার চিকিৎসা দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না? তাহলে এটাকে অভিজ্ঞতা থাকলে তা বলুন। আমরা কী ধরনের চিকিৎসা বলতে পারি? প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে একটি ব্যবহারিক বা তাৎক্ষণিক চিকিৎসা যাতে বা হঠাৎ করে শারীরিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তির তাৎক্ষণিক চিকিৎসা যাতে করে ঐ ব্যক্তির অবস্থার অবনতি না হয়। এক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রোগীকে সাময়িকভাবে সুস্থ বা বাঁচিয়ে রাখা যায়।

ধারণা প্রয়োগ

আপনার বা প্রতিবেশী কেউ উপরোক্ত দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে থাকলে তার সম্ভাব্য উৎস এবং কারণ কী ছিল বলে আপনি মনে করেন? ১/২ জনের কাছ থেকে তাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা শুনুন।

ধারণা পরিবর্ধন

প্রাথমিক চিকিৎসা

মনে করুন রাত্রিবেলা হঠাৎ করে আপনার মায়ের নাক দিয়ে রক্ত পড়া আরম্ভ হলো। কী করবেন? আশপাশে ওষুধের দোকান বা চিকিৎসকও নেই যে ডাকবেন। তাহলে আপনাকেই চিকিৎসা দিতে হবে হাসপাতালে বা ক্লিনিকে নেওয়ার আগ পর্যন্ত। অবশ্য এ চিকিৎসা পদ্ধতি আপনার জানা থাকতে হবে। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো:

আপনার মাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিন এবং সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে বলুন। অথবা তা সম্ভব না হলে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিন কিন্তু মাথা এবং কাঁধ বালিশ দিয়ে উঁচু করে রাখার ব্যবস্থা করুন। এর পর নাকের নরম অংশ হাত দিয়ে ১০ মিনিটের মতো একভাবে চাপ দিয়ে রাখুন। মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বলুন। প্রয়োজনে বরফ বা ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করুন।

এ যে আপনি চিকিৎসকের কাছে না নেওয়া পর্যন্ত আপনার মায়ের চিকিৎসা দিলেন এটাকেই প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। তাহলে প্রাথমিক চিকিৎসার অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে? প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে একটা ব্যবহারিক এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা, যা আহত ব্যক্তির বা হঠাৎ করে শারীরিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তির তাৎক্ষণিক চিকিৎসা যাতে করে ঐ ব্যক্তির অবস্থার অবনতি না হয়। একইভাবে পুড়ে যাওয়া, সাপে কামড়ানো, পা পিছলে পড়ে যাওয়া, গাড়ি দুর্ঘটনা, শ্বাসকষ্ট, পানিতে ডুবে যাওয়া, বিদ্যুৎস্পৃষ্টতা, কেটে যাওয়া, হাড় ভাঙা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রোগীকে সাময়িকভাবে সুস্থ বা বাঁচিয়ে রাখা যায়। অবশ্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক সময় সাধারণ দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসাই যথেষ্ট। তাহলে প্রাথমিক চিকিৎসার অর্থ কী? কোনো দুর্ঘটনায় পতিত বা উপরে উল্লেখিত ক্ষেত্রে চিকিৎসকের কাছে না নেওয়া পর্যন্ত জীবন বাঁচানোর জন্য যে চিকিৎসা তা-ই প্রাথমিক চিকিৎসা। কোনো দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে যে ব্যবহারিক চিকিৎসা দেওয়া হয় তা-ই প্রাথমিক চিকিৎসা।

অনেক সময় খুব ছোটখাটো ইনজুরি বা আঘাত প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। যেমন সাপে কাটা, রক্তপাত ইত্যাদির তাৎক্ষণিক বা প্রাথমিক চিকিৎসা যদি দেয়া না হয় তাহলে চিকিৎসকের কাছে নিতে নিতে রোগী মারাও যেতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসা জানা থাকলে আপনি শিক্ষক হিসাবে বা পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে কী ধরনের সাহায্য করতে পারেন? যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনায় জীবন বাঁচানোর জন্য আপনি জরুরীভাবে চিকিৎসা দিয়ে দুর্ঘটনার ভয়াবহতা থেকে ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন। যেমন রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে তার রক্তপাত বন্ধ করতে পারেন, যাতে করে তার জীবন বাঁচানো যায়। আপনি জানেন নিশ্চয় এ ধরনের দুর্ঘটনায় খুব রক্তপাত হয়ে থাকে। এ রক্তপাত বন্ধ না করতে পারলে, চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে নিতে নিতে ঐ ব্যক্তি মারা যেতে পারে।

অনুসন্ধান ৩.৪: সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ভয়াবহ পরিণাম থেকে পরিত্রাণের উপায়

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। ছোট বড় নানান রকমের দুর্ঘটনার কারণে অনেক সময় মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে দেখা যায়। অথচ একটু সতর্কতা আর প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞানের মাধ্যমে দুর্ঘটনার প্রভাব অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব। তাহলে চলুন তো দেখি কী কী ভাবে এই দুর্ঘটনাসমূহের প্রভাব কমানো যেতে পারে।

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আপনাদের জীবনে কী কী দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বা ঘটে থাকে তা আমরা মোটামুটি জেনেছি। এখন কীভাবে ঐ সকল দুর্ঘটনার ক্ষতি কমিয়ে আনা যায় তার উপায়সমূহ জানা দরকার। তাহলে কীভাবে সেটি আপনারা জানবেন? এ বিষয়ে একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি: (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

কাজ: দৈনন্দিন জীবনে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার তালিকা।

কী করতে হবে:

১. নিচে প্রদত্ত ছকের ন্যায় একটি ছক তৈরি করুন।

বিপদ বা দুর্ঘটনা	প্রাথমিক চিকিৎসা
পানিতে ডোবা	
সাপে কাটা	
আগুনে পোড়া	
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া	

২. আলোচনাপূর্বক উপরোক্ত ছকটি পূরণ করুন।

৩. ধারণা বিবর্ধন শেষে ছকটি পর্যালোচনা করুন।

ধারণা গঠন

সচরাচর আমরা যে সকল দুর্ঘটনার শিকার হই সেগুলি তাহলে কী কী? সেগুলোর মধ্যে রয়েছে পুড়ে যাওয়া, কেটে যাওয়া, বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়া, সাপে কাটা, পানিতে ডুবে যাওয়া ইত্যাদি। এ সকল দুর্ঘটনা

যখন ঘটে তখন কি ডাক্তার বা হাসপাতালে নেওয়ার আগে রোগীকে কোন প্রকার চিকিৎসা দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না? অভিজ্ঞতা থাকলে তা বলুন। কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা কী পদক্ষেপ নিতে পারি?

ধারণা প্রয়োগ (concept application)

আপনার বা প্রতিবেশী কেউ যদি উপরোক্ত দুর্ঘটনায় যাতে পতিত না হয় সেটাকে কীভাবে প্রতিরোধ করবেন? প্রতিরোধের উপায় গুলো কি কি হতে পারে। ১/২ জনের কাছ থেকে তাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা শুনুন।

ধারণা পরিবর্তন

বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার কারণ, প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা

পানিতে ডুবে যাওয়া

পানিতে ডোবা আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ এবং বর্ষাকালে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি কিংবা বিদ্যালয়ের চারপাশ প্লাবিত হয়। তাছাড়া, খাল-বিল ও পুকুরেও পানি থাকে। শিশুদের কাছে পানি বরাবরই আকর্ষণীয় জায়গা। শিশুরা পানিতে নেমে খেলতে পছন্দ করে। কিন্তু শিশুদের পানিতে নামা সবসময়ই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সাঁতার না জেনে কিংবা অল্প সাঁতার জেনে শিশুরা পানিতে খেলতে নামলে বা পড়ে গেলে শিশুরা মারা যেতে পারে। তাই সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে বড়দের চোখের আড়ালে শিশুরা পানিতে না নামে।

কাউকে পানিতে ডুবে যেতে দেখলে প্রথমে পানিতে ডুবতে থাকা ব্যক্তির হাতের নাগালে লম্বা দড়ি বা লাঠি ধরার চেষ্টা করব। তা না হলে ভেসে থাকতে পারে এমন বস্তু যেমন - বড় কাঠের টুকরা, কলাগাছ ইত্যাদি পানিতে ভাসিয়ে দিব। সেটি ধরে ডুবে থাকা ব্যক্তি যেন ভাসতে পারে ও উঠে আসতে পারে।

ডুবে যাওয়া মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা

পানিতে ডোবা রোগীর তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দিলে তাকে বাঁচানো সম্ভব। পানি থেকে ওঠানোর পর প্রথমেই শনাক্ত করুন রোগীর জ্ঞান আছে কি না অথবা শ্বাস নিচ্ছে কিনা। যদি মনে হয় রোগী শ্বাস নিচ্ছে না তাহলে তার মাথাটি বুক থেকে উঁচু করে রাখুন এবং আধ মিনিট পর পর রোগীর মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে শ্বাস দিন। মাঝে মাঝে রোগীকে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় দিন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।

আর যদি রোগীর জ্ঞান থাকে তবে নিচের কাজগুলো করুন।

- নাক-মুখের পানি মুছে দিয়ে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে দিন। রোগীর মাথা তার একটি হাতের উপর রেখে কাত করে শুইয়ে দিন। দাঁতের ফাঁকে শক্ত কিছু একটা দিয়ে মুখ হাঁ করে রাখুন। পরিষ্কার ও নরম কাপড় দিয়ে মুখ ও গলার ভিতর পরিষ্কার করে দিন।
- এবার রোগীর পেটের নিচে একটা বালিশ রাখুন। রোগীর পিঠের দুই পাশে হাত রেখে কিছুক্ষণ পর পর জোরে চাপ দিন। কয়েকবার চাপ দেওয়ার পর মুখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসবে। শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হবে। যতশীঘ্র সম্ভব রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান অথবা ডাক্তার ডেকে আনুন।



চিত্র ৩.৫: পিঠে চাপ দিয়ে পেট থেকে পানি বের করার দৃশ্য

প্রাণীর আঘাত/কামড়

প্রাণীর আঘাত/কামড় বলতে আমরা কী বুঝব? যখন কোনো প্রাণীর দাঁত দ্বারা কারো শরীরের চামড়া কেটে ফেলে তাকেই আমরা কামড় বলি। প্রাণীর শিং বা পায়ের আঘাতেও শিশুরা বিপদে পড়তে পারে। প্রাণীর আঘাতে বা কামড়ে একটা কঠিন রোগ হয়, যার নাম ধনুষ্টংকার। কোনো অসুস্থ প্রাণীর কামড়ে রেবিস ও জলাতঙ্ক ধরনের রোগ হতে পারে। প্রাণীর আঘাতের কারণ

- কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য পোষা প্রাণীদের উত্ত্যক্ত করা।
- গৃহপালিত পশু বিশেষ করে গরু, মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদির কাছে শিশুদের যাওয়া।
- বাড়ির আশেপাশে ঝোঁপঝাড় বা জঙ্গল থাকা।
- অনেক সময় ঘরের কোনায় রাখা পাতিল/পাত্রে খেলার ছলে হাত দেওয়া। এ ধরনের পাত্রে সাপ আশ্রয় নিতে পারে।

প্রাণীর আঘাত প্রতিরোধের উপায়সমূহ

- শিশুরা বিড়াল, কুকুর ও অন্যান্য পোষা প্রাণীকে যাতে উত্ত্যক্ত না করে সে দিকে লক্ষ রাখা।
- গৃহপালিত প্রাণী নির্দিষ্ট স্থানে রাখা।
- এলাকায় পাগলা কুকুর থাকলে তাকে মেরে ফেলাই শ্রেয়।

প্রাণীর কামড়ের প্রাথমিক চিকিৎসা

- আঘাতের স্থান সাবান পানি দ্বারা ভালোমতো ধুয়ে ফেলুন, কমপক্ষে পাঁচ মিনিট সময় নিন।
- রক্তপাত বন্ধ করুন।
- জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ অথবা কাপড় দ্বারা আঘাতের স্থান বেঁধে ফেলুন।

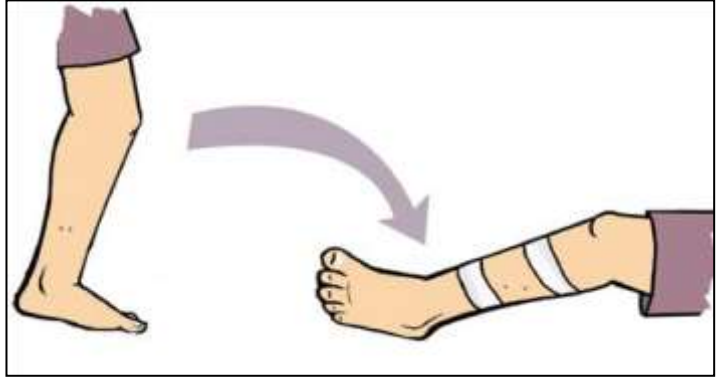
- অবশ্য মনে রাখতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চিকিৎসা নিতে হবে। এমনকি টিটেনাস ইনজেকশন নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।
- কুকুর বা সাপ কামড়ালে দ্রুত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

পোকা-মাকড় এবং মাকড়সার কামড়

এদের কামড়ে সাধারণত কামড়ের স্থানে ব্যথা হয়। অবশ্য এলার্জির কারণে এ ব্যথা ছড়িয়ে পড়তে পারে। মাকড়সার কামড় ভয়াবহ হতে পারে যাতে কিনা চিকিৎসকের পরামর্শের দরকার হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- কামড়ের স্থানে ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- এরপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুতে হবে। একটুকরা ভিজা কাপড় দ্বারা চাপ দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করতে হবে।
- যদি জ্বর এবং সংক্রামক কিছু দেখা দেয় তাহলে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।



চিত্র: ৩.৬ সাপে কাটার ক্ষেত্রে ব্যান্ডেজ বাঁধার নিয়ম

সাপের কামড়

যদি কোনো ব্যক্তিকে বিষাক্ত সাপ কামড়ায়, তাহলে কী করবেন? তাহলে আপনি নিম্নের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

- উক্ত ব্যক্তিকে মেঝেতে শুইয়ে দিন। নড়াচড়া করতে মানা করুন।
- কাপড় বা ব্যান্ড দিয়ে ক্ষতস্থানের চারিদিকে ২-৪ ইঞ্চি উপরে বেঁধে দিন। কিন্তু কো-জয়েন্টের চারিদিকে নয়। তবে এ বাঁধন কোনোমতেই শক্ত বা টাইট করে বাঁধা যাবে না।
- যতদ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের কাছে নিন বা চিকিৎসককে ডেকে আনুন। সাপের কামড়ের রোগীকে ওঝার কাছে কখনোই নেবেন না।

পুড়ে যাওয়া প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা

এটা একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা। অথচ সামান্য সতর্ক থাকলে পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। আগুন যেমন আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। ঠিক তেমনি সামান্যতম অসাবধানতার কারণে আগুনে পুড়ে জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে।

পুড়ে যাওয়ার কারণ

- ছোট বাচ্চাদের রান্নাঘরে বা রান্না করার স্থানে খেলতে দেওয়া।
- যেখানে-সেখানে গরম ছাই বা কয়লা ফেলা।
- গরম খাবার বা পানি ছোটদের হাতের নাগালের মধ্যে রাখা।
- কুপি বা মোমবাতি ব্যবহার করা।
- শিশুদের জ্বলন্ত কিছু নিয়ে খেলতে দেয়া।
- শীতকালে অনিরাপদ ভাবে আগুন পোহানো।
- আতশবাজি পোড়ানো।

- আগুন নিয়ে খেলা।

পুড়ে যাওয়ার প্রতিরোধ

- কুপিবাতি বা মোমবাতির পরিবর্তে হারিকেন ব্যবহার করা।
- গরম ছাই পানি দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া।
- আগুন নিয়ে খেলা যাবে না।
- গরম কিছু না ধরা।
- রান্নার জায়গা ঘিরে দিতে হবে যাতে করে শিশুরা ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।
- আগুন পোহানোর সময় সতর্ক থাকতে হবে।
- আগুন, গরম পানি, গরম ভাত, ফেন ইত্যাদি শিশুদের নাগলের বাইরে রাখতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: হালকা পোড়া, ছেঁকা লাগা বা প্রাথমিক স্তরের পোড়া হলে চামড়ার উপরিভাগ লাল হয়ে যায়। সামান্য ফুলতে পারে বা ব্যথাও পেতে পারে, তবে ফোসকা পড়ে না। বেশি পুড়লে বা দ্বিতীয় স্তরের পোড়া চামড়ার গভীর পর্যন্ত পুড়ে যায়। আর বেশি লাল দাগ দেখায় ও ফোসকা পড়ে। খুব বেশি ফুলে যায় এবং ব্যথাও বেশি হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের পোড়ার প্রাথমিক চিকিৎসা নিম্নরূপ—

- পোড়া স্থানে ঠাণ্ডা পানি ঢালুন বা পোড়া স্থানটি ঠাণ্ডা পানিতে (বরফ নয় কিন্তু) রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বালাপোড়া না কমে। প্রাথমিক স্তরের পোড়ার জন্য ১৫-২০ মিনিট সময় যথেষ্ট কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের পোড়ার ক্ষেত্রে ১ ঘণ্টারও বেশি পানি ঢালতে হতে পারে।



চিত্র ৩.৭: পুড়ে গেলে যেভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে

- পরে মুছে শুকিয়ে ফেলুন এবং ক্ষতস্থানটিকে পরিষ্কারভাবে ড্রেসিং করে ঢেকে রাখুন। ডিম বা টুথপেস্ট দেয়া যাবে না।
- ফোসকা উঠলে তা ফাটিয়ে ফেলা যাবে না।
- যদি খুব বেশি জায়গা জুড়ে পুড়ে যায় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া একান্ত জরুরি।

তৃতীয় মাত্রার পোড়া (খুব বেশি মাত্রার পোড়া)

এ স্তরের পোড়া খুবই মারাত্মক, এ ক্ষেত্রে চামড়ার পুরা স্তর, চামড়ার নিচে মাংসপেশি ও স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: এ ধরনের পোড়ার ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তবে তার আগে পোড়া জায়গায় ঠাণ্ডা পানি ঢালতে হবে। রোগীর শ্বাসকার্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

রাসায়নিক পোড়া

রাসায়নিক উপাদানের সংস্পর্শে কোনো ব্যক্তির শরীর পুড়ে যেতে পারে। যেমন বাগানের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যেমন সার, ব্লিচ, এমোনিয়া এবং আরো অনেক রাসায়নিক উপাদান সাবধানে ব্যবহার না করলে ব্যক্তির শরীরে পড়ে তার শরীর মারাত্মকভাবে পুড়ে যেতে পারে। এসিড সলভাসের কারণেও কারো শরীর পুড়ে যেতে পারে। রাসায়নিক পদার্থের কারণে শরীর পুড়ে গেলে নিচে দেওয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে পুড়ে যাওয়া স্থানটি কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধরে ধুতে হবে। ক্ষতস্থানে কাপড়ের টুকরা থাকলে তা সরিয়ে ফেলুন।
- পুড়ে যাওয়া স্থানটি জীবাণুমুক্ত ড্রেসিং সামগ্রী দ্বারা ঢাকা দিয়ে দিন।
- দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিন অথবা চিকিৎসককে ডেকে আনুন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টতার কারণ, প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা

বিদ্যুৎ ছাড়া আমাদের এক মুহূর্ত চলে না। বিদ্যুৎ না থাকলে আলো জ্বলে না, টিভি চলে না, লিফট চলে না, পাখা চলে না, কলকারখানা চলে না। বিদ্যুৎ কি আমাদের ক্ষতির কারণ হতে পারে? বিদ্যুৎ আমাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে যদি আমরা সতর্ক না থাকি। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া জীবনের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টতার কারণ

- বৈদ্যুতিক সংযোগসমূহ ভালোভাবে নিরাপদ টেপ দিয়ে না বাঁধা।
- শিশুদের হাতের কাছে বৈদ্যুতিক সংযোগ বা প্লাগ স্থাপন করা।
- বাড়িবৃষ্টির সময় বাইরে থাকা।
- বৈদ্যুতিক স্থাপনা নিয়ে খেলাধুলা।
- ভেজা হাতে বিদ্যুতিক সরঞ্জামাদি স্পর্শ করা।
- খালি পায়ে বৈদ্যুতিক সংযোগের তারে হাত দেওয়া।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে স্পর্শ করা।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টতা প্রতিরোধ

- বিদ্যুৎ সংযোগ নিরাপদ করা।
- বৈদ্যুতিক স্থাপনা, সংযোগ বা প্লাগ শিশুদের হাতের কাছে না রাখা।
- বজ্রপাতের সময় বা বিদ্যুৎ চমকানোর সময় বাইরে না যাওয়া, কেননা এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- শিশুদের বৈদ্যুতিক তার ও পোলের নিকটে খেলাধুলা করতে না দেওয়া।
- ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক স্থাপনায় হাত না দেওয়া।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে খালি হাতে না ধরে শুকনো লাঠি বা কাঠ দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। মেইন সুইচ বন্ধ করে এটি করা গেলে ভালো।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- বিদ্যুৎস্পৃষ্টতার পরে যদি জ্ঞান থাকে তাহলে তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিতে হবে। পা দুটো কিছু উপরের দিকে রাখতে হবে।
- যদি ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে যায় তখন তাকে কাত করে শুইয়ে দিতে হবে এবং মাথার নিকটে একটা বালিশ রাখা যেতে পারে।
- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বিষক্রিয়া প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা

জব্বার সাহেব গ্রামের বাড়িতে গেছেন। কোকাকোলার বোতলে অন্য কোনো বিষাক্ত দ্রব্য রাখা ছিল। জব্বার সাহেব কোকাকোলা মনে করে খেয়ে অঘটন ঘটিয়ে ফেললেন। ধারে-কাছে হাসপাতাল বা চিকিৎসক নেই, এ অবস্থায় কী করবেন? হ্যাঁ, প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে জব্বার সাহেবকে বাঁচানো যেতে পারে। শিশুরাও প্রায়ই খেলাচ্ছলে বিষ খেয়ে ফেলে। তাদেরকে রক্ষাও করা যেতে পারে প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্যে।

বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা

- বিষাক্ত বস্তু কোনো খাবারের পাত্রে রাখা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় কোমল পানীয়ের বোতলে কেরোসিন রাখা।
- বিষাক্ত দ্রব্য ও বড়দের ওষুধ শিশুদের হাতের কাছে রাখা।
- ওষুধ বা বিষাক্ত দ্রব্য যেমন এরোসল, পিঁপড়া মারার ওষুধ, ইঁদুর মারার ওষুধ বা অন্যান্য বিষের বোতলে বিষ শব্দটি না লিখে রাখা বা কোনো সতর্ককারী চিহ্ন না দেওয়া। ফলে বড়রাও এগুলো সরিয়ে রাখে না।

বিষক্রিয়া প্রতিরোধের উপায়

- ওষুধ ও বিষাক্ত দ্রব্য শিশুদের হাতের কাছে না রাখা।
- বিষাক্ত বস্তু খাবার পাত্র বা পানির বোতলে না রাখা। বিষাক্ত বস্তুর পাত্রের গায়ে বিষ শব্দটি লিখে রাখা অথবা কোনো সতর্ককারী চিহ্ন দিয়ে রাখা।

বিষ আসলে কী? বিষ হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা শরীরের ভিতরে প্রবেশ করলে শরীরের ক্ষতিসাধন করে, এমনকি চিকিৎসার অভাবে বা দেরিতে তা মৃত্যুর কারণও হতে পারে। সাধারণত বিষ কোনো খাদ্যের সাথে অথবা পানীয়-এর সাথে মুখের ভিতর দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। যখন বিষ খেয়েছে বলে মনে হয়, তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

প্রাথমিক চিকিৎসা

সর্বপ্রথম কাজ হবে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ থেকে বিষ বের করে ফেলা এবং নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করা। বিষ আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিম্নের পদ্ধতি অনুসারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে—

- তাঁকে বমি করাতে হবে; ইপিকাপ সিরাপ খাইয়ে বমি করানো যেতে পারে— সিরাপের মাত্রা হবে শিশুদের জন্য এক টেবিল চামচ এবং বড়দের জন্য হবে দুই টেবিল চামচ।
- যে পাত্রের বিষ খেয়েছে তা সংরক্ষণ করতে হবে।
- বমির অংশ সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রয়োজনে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- দ্রুত চিকিৎসকের কাছে অথবা হাসপাতালে নিতে হবে।

তবে মনে রাখতে হবে, যদি বিষে আক্রান্ত ব্যক্তি অজ্ঞান থাকে তাহলে বমি করানো যাবে না।

হাড় ভাঙা প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা

পড়ে যাওয়া, সড়ক দুর্ঘটনা, সহিংসতা ইত্যাদি কারণে শরীরের হাড় ভেঙে যেতে পারে। দেহের হাড় সাধারণত দুইভাবে ভাঙতে পারে।

- হাড় ভেঙে চামড়া ভেদ করে বাইরে আসতে পারে। চামড়া ভেদ না করেও হাড় ভাঙতে পারে। হাড় ভাঙার প্রাথমিক চিকিৎসা বেশ জটিল।
- তাহলে কি হাড় ভাঙার প্রাথমিক চিকিৎসা নেই? হ্যাঁ রয়েছে, নিচে দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে—
- ক্ষতস্থান এমনভাবে পরিষ্কার করতে হবে যাতে করে ভাঙা হাড় নড়ে না যায়।
- রক্তক্ষরণ হলে তা দ্রুত বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- নরম পরিষ্কার কাপড় বা তুলা দ্বারা ক্ষতস্থান ঢেকে দিতে হবে।
- একটি পরিষ্কার বাঁশের ফালি বা মসৃণ কাঠের টুকরা দিয়ে ভাঙা হাড়ের নিচে ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে দেওয়া যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হাড়টি নাড়াচড়া না করে।
- এরপর যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিতে হবে।
- আঘাত যদি মেরুদণ্ডে হয় তাহলে পিঠের নিচে একটি আরামদায়ক কাঠের টুকরা দিয়ে কোমর ও বুক ভালো করে ব্যান্ডেজ করে কাঠের সাথে বেঁধে দিতে হবে। পরবর্তীতে হাসপাতালে নিতে হবে। হাড় ভাঙার চিকিৎসা দ্রুত করতে হবে। অন্যথায় ব্যথা সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে।
- ব্যথা কমানোর জন্য বরফ দিতে হবে। তাহলে হাড় ভাঙলে দুটি জরুরি কাজ করতে হবে। প্রথমত রক্তপাত বন্ধ করতে হবে। এবং দ্বিতীয়ত ভাঙা হাড়টি কাঠ বা বাঁশের টুকরা দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিতে হবে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

রক্তপাত বন্ধে প্রাথমিক চিকিৎসা

যে কোনো দুর্ঘটনায় রক্তপাত হলো সবথেকে ক্ষতিকারক দিক। চলুন রক্তপাত বন্ধ করার উপায় নিয়ে আলোচনা করি। রক্তপাতের দরুন শরীর দুর্বল হয়ে মানুষ মারাও যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে সরাসরি চাপ প্রয়োগে রক্তপাত বন্ধ করা যেতে পারে। পরিষ্কার কাপড়, গজ দিয়ে ব্যান্ডেজ করা যেতে পারে। এ ভাবে যদি রক্তপাত বন্ধ না হয় তাহলে

আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে পারি।

- ক্ষতস্থান কাপড়ের প্যাড দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- ব্যান্ডেজের উপর বেশ জোরে চাপ দিতে হবে।
- রক্তে ভেজা ব্যান্ডেজ তুলে ফেলা চলবে না, বরং ঐ ব্যান্ডেজের উপর আবার নতুন করে ব্যান্ডেজ ঢেকে দিতে হবে। সাথে সাথে চাপ দিয়ে রাখা যতক্ষণ না রক্তপাত বন্ধ না হয়।
- শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি যাতে নাড়াচড়া করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা।
- ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গটি উঁচুতে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের লেভেলের উপরে রাখতে হবে।

সতর্কতা

- গলায় ইনজুরি হলে মাথা নাড়ানো যাবে না।
- যদি কোনো অঙ্গ ভেঙে গেছে বলে মনে হয় তাহলে ঐ অঙ্গ উত্তোলন করে রাখা ঠিক হবে না।
- ব্যক্তি অজ্ঞান থাকলে তাকে এদিক-ওদিক করা যাবে না বা নাড়াচড়া করানো যাবে না।

স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত অনুসন্ধান

অনুসন্ধান ৩.৫: আমরা কীভাবে সুস্থ থাকতে পারি?

অনুসন্ধান আমন্ত্রণ

সুস্থ জীবন যাপন করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থ থাকতে এবং জীবনকে সুন্দর রাখতে হলে কিছু কিছু নিয়মকানুন মেনে চলা প্রয়োজন। এ নিয়মকানুনগুলো স্বাস্থ্যবিধি নামে পরিচিত। চলুন তাহলে আমরা কিছু স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: সুস্থ থাকার জন্য আমাদের করণীয়সমূহ নিয়ে আলচনা করব। এটা কীভাবে করবেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও স্বপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

কী করতে হবে:

১. নিচে প্রদত্ত ছকের ন্যায় একটি ছক তৈরি করুন।

সুস্থ থাকার জন্য আপনি যা যা করেন

২. সুস্থ থাকার জন্য আপনি যা যা করেন তার একটি তালিকা তৈরি করে উপরের ছকে লিখুন।
৩. উপরোক্ত ছক অনুযায়ী একে অপরের সাথে আলোচনা করুন।
৪. আপনার তালিকার সাথে আরও ৩টি করণীয় কাজ যোগ করুন।

ধারণা গঠন

সুস্থ থাকা কেন জরুরি বলে মনে করেন? সুস্থ থাকার জন্য আমাদের কী কী করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

ধারণা প্রয়োগ

আপনার পরিবারের সদস্যদের কাছে স্বাস্থ্যবিধিসমূহ কীভাবে তুলে ধরবেন? পরিবারের সদস্যদের সুস্থ জীবন যাপনের জন্য আপনি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন?

ধারণা পরিবর্তন

স্বাস্থ্যবিধি

সুস্থ থাকার সবচেয়ে ভালো উপায় হল স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার মাধ্যমে আমরা সুন্দর জীবনযাপনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। এর জন্য প্রতিদিন কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে করণীয় কিছু কাজ যেমন- সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত শরীরচর্চা, পর্যাপ্ত ঘুম, বিশ্রাম, শরীরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি।

রোগ

আমাদের অনেকের অনেক সময় নানা রকম রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায় । এমনকি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরেও আমরা রোগাক্রান্ত হতে পারি । আমাদের চারপাশে অদৃশ্য অসংখ্য জীবাণু ছড়িয়ে আছে । কোন কোন জীবাণু আমাদের রোগ সৃষ্টি করে । দূষিত পানি পান করলে, দূষিত খাবার খেলে, বায়ুর মাধ্যমে ইত্যাদি নানা উপায়ে বিভিন্ন জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে । এসকল জীবাণুই মূলত আমাদের রোগাক্রান্ত করে ।

সংক্রামক রোগ

বিভিন্ন জীবাণু যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ইত্যাদি প্রবেশের ফলে সৃষ্ট রোগই হল সংক্রামক রোগ । এ সকল রোগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষের দেহে ছড়াতে পারে ।

সংক্রামক রোগের বিস্তার: সংক্রামক রোগ বিভিন্নভাবে ছড়াতে পারে । কিছু কিছু রোগ হাঁচি-কাশির মাধ্যমে একজন থেকে আরেকজনে সংক্রমিত হয় । সংক্রামিত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিস যেমন- থালা, বাসন, গ্লাস, চেয়ার, জামা-কাপড়, টয়লেট ইত্যাদি ব্যবহারের কারণে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে । মশা-মাছির মত পোকামাকড় বা কুকুরের মত প্রাণীর কামড়ের মাধ্যমেও কিছু রোগ ছড়াতে পারে । আবার দূষিত খাদ্য গ্রহণ এবং দূষিত পানি পানের মাধ্যমেও সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারে ।

সংক্রামক রোগের প্রকারভেদ: সংক্রামক রোগ বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকে । যেমন-

বায়ুবাহিত রোগ: বায়ুবাহিত রোগ হল সে সকল রোগ যা হাঁচি-কাশি বা কথাবার্তা বলার সময় বায়ুতে জীবাণু ছড়ানোর মাধ্যমে হয়ে থাকে । সোয়াইন ফ্লু, হাম, গুটিবসন্ত, যক্ষ্মা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি বায়ুবাহিত রোগ ।

পানিবাহিত রোগ: দূষিত পানি বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে পারে । যেমন- ডায়েরিয়া, কলেরা, আমাশয়, জন্ডিস এবং টাইফয়েড । অধিকাংশ পানিবাহিত রোগের লক্ষণ হল বমি, পেট ব্যথা, জ্বর, পাতলা পায়খানা । ডায়েরিয়া হলে অবশ্যই খাবার স্যালাইন খেতে হবে । খাবার স্যালাইন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় । এছাড়াও আমরা ঘরে বসে খাবার স্যালাইন তৈরি করতে পারি ।

কাজ: খাবার স্যালাইন তৈরি ।

কী করতে হবে: ঘরে বসে খাবার স্যালাইন তৈরি করতে হবে ।

উপকরণ: লবণ, চিনি বা গুড়, পানি, চামচ, জগ ।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালী (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালী ভিন্নতরও হতে পারে।):

১. একটি পাত্রে আধা লিটার বিশুদ্ধ পানি নিন ।

২. এবার পাত্রটিতে এক চিমটি লবণ এবং এক মুঠো গুড় বা চিনি ঢালুন ।

এখন চামচ দিয়ে চিনি, লবণ এবং পানির মিশ্রণটিকে ভালভাবে মিশিয়ে নিন ।

পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ: পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধের ভাল একটি উপায় হল পানিতে জীবাণুর বিস্তার রোধ করা । এক্ষেত্রে আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে, যেমন- নিরাপদ পানি ব্যবহার, প্রয়োজনমত হাত

ধোঁয়া, শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, টয়লেট পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। আমাদের অনেকের অনেক সময় নানা রকম রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এমনকি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরেও আমরা রোগাক্রান্ত হতে পারি। আচ্ছা চলুন তো দেখি, আমরা কেন রোগাক্রান্ত হই তা বোঝার চেষ্টা করি।

ছোঁয়াচে রোগ: রোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে যে সকল রোগ সংক্রমণ হয় তাকে ছোঁয়াচে রোগ বলে। যেমন- ফু, ইবোলা, হাম ইত্যাদি।

প্রাণী ও পোকামাকড়বাহিত সংক্রামক রোগ: বিভিন্ন প্রাণী ও পোকামাকড়ের মাধ্যমে কিছু জীবাণুবাহিত রোগ ছড়ায়। যেমন- কুকুরের কামড়ের মাধ্যমে জলাতঙ্ক রোগ ছড়ায়, মশার কামড়ের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গু রোগ ছড়ায়।

কাজ: সংক্রামক রোগের শ্রেণিকরণ।

কী করতে হবে:

১. নিচে প্রদত্ত ছকের ন্যায় একটি ছক তৈরি করুন।

রোগের প্রকারভেদ	রোগের নাম
ছোঁয়াচে	
বায়ুবাহিত	
পানিবাহিত	
প্রাণী এবং পোকামাকড় বাহিত	

২. সংক্রামক রোগের প্রকারভেদ অনুযায়ী উপরের ছকটি পূরণ করুন।

৩. পূরণকৃত ছকটি একে অপরের সাথে মিলিয়ে দেখুন এবং আলোচনা করুন।

৪. আপনার তালিকার সাথে আরও রোগের নাম যোগ করুন।

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের উপায়:
সংক্রামক রোগ জীবাণুর মাধ্যমে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শরীরের রোগ প্রতিরোধ করা এবং রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পরা প্রতিরোধ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ করা, নিরাপদ পানি ব্যবহার করা এবং হাত জীবাণুমুক্ত রাখার মাধ্যমে আমরা সুস্থ থাকতে পারি। এছাড়াও ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকা জরুরী।



চিত্র ৩.৮: এরকম জমে থাকা পানিতে মশা বৃদ্ধি পায়

বাড়ির আশেপাশে পানি জমতে পারে এমন আবজর্জনা যেমন- কৌটা, টায়ার, ফুলের টব ইত্যাদি পরিষ্কার রাখতে হবে। কারণ এতে জমে থাকা পানিতে ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া রোগের বাহক মশা ডিম পারে। এছাড়া হাঁচি-কাশির সময় টিস্যু, রুমাল বা হাত দিয়ে মুখ ঢাকা, চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে পারি।

সংক্রামক রোগের প্রতিকার: রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে, পুষ্টির খাবার খেতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণে নিরাপদ পানি পান করতে হবে। এগুলো আমাদের সেরে উঠতে সাহায্য করে। হালকা জ্বর হলে বা সামান্য মাথাব্যথা করলে প্রাথমিকভাবে কিছু ঔষধ গ্রহণ করলে আমরা ভাল বোধ করি। কিন্তু যদি জ্বর ভাল না হয়, ক্রমাগত বমি হতে থাকে এবং মারাত্মক মাথাব্যথা হয় তাহলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে।

কাজ: সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে করণীয় কাজের তালিকা তৈরি।

কী করতে হবে:

১. নিচে প্রদত্ত ছকের ন্যায় একটি ছক তৈরি করুন।

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে আপনার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

২. সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য আপনি যা যা করেন তার একটি তালিকা তৈরি করে উপরের ছকে লিখুন।
৩. উপরোক্ত ছক অনুযায়ী একে অপরের সাথে আলোচনা করুন।
৪. আপনার তালিকার সাথে আরও ৩টি করণীয় কাজ যোগ করুন।

বয়ঃসন্ধি

বয়ঃসন্ধি হল জীবনের এমন এক পর্যায় যখন আমাদের শরীর শিশু অবস্থা থেকে কিশোর অবস্থায় পৌঁছায়। সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি ৮ থেকে ১৩ বছরে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ৯ থেকে ১৫ বছর বয়সে শুরু হয়। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শারীরিক, মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন দেখা দেয়।

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন: বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের শরীরে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন- দ্রুত লম্বা হওয়া, শারীরিক গঠন পরিবর্তিত হওয়া, ত্বক তৈলাক্ত হওয়া, একটু বেশি ঘাম হওয়া, ব্রন উঠা ইত্যাদি। এ সময় শরীরের ওজনও বৃদ্ধি পায়, মাংশপেশি সুগঠিত হয়, ছেলেদের গলার স্বরেরও পরিবর্তন হয়।



চিত্র ৩.৯: বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের যত্ন: বয়ঃসন্ধিকালে কোন কিছু নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে কিংবা আবেগের দিক থেকে বড় পরিবর্তন আসতে পারে, শারীরিক পরিবর্তন দেখেও অনেকে দুশ্চিন্তায় ভোগে। এসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা খুবই জরুরী। মনে রাখা প্রয়োজন, বয়ঃসন্ধিকাল সবার জীবনেই আসে, এ ধরনের পরিবর্তন স্বাভাবিক।

অধ্যায় ৪

পদার্থ ও শক্তি

আমরা আমাদের চারপাশে অনেক জিনিস দেখি, অনেক জিনিস দেখি না আবার কিছুর শুধু অস্তিত্ব অনুভব করি। এসবের রয়েছে নিজস্ব স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য, যার ফলে প্রকৃতিতে তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম (Properties) প্রদর্শন করে। এগুলো যেমন- কঠিন, তরল, বায়বীয় হয় তেমন শক্ত, নরম, গ্যাসীয়ও হয়। আবার কোন কোনটি একাধিক রূপেও থাকে। আদিকাল থেকে এসব জিনিসের প্রতি রয়েছে মানুষের অসীম কৌতূহল, ফলে মানুষ জানতে পেরেছে এদের অনেক ধর্ম/বৈশিষ্ট্যকে এবং এগুলোকে ব্যবহার করেছে নিজেদের কল্যাণে। এগুলোর সাধারণ নাম পদার্থ। তাই এদের ধর্ম, গঠন ও সংযুক্তি (Structure and Composition) জানা বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

পদার্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত অনুসন্ধান

অনুসন্ধান ৪.১: কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে পদার্থ বলা যায়?

অনুসন্ধানের আমন্ত্রণ

শ্রেণিকক্ষের ভেতর কী কী জিনিস দেখেন? শ্রেণিকক্ষের বাইরে কী কী জিনিস দেখেন? এগুলো কীভাবে পরস্পর থেকে ভিন্ন? আসলে এ সকল পদার্থের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। পদার্থের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী তা আমাদের জানা প্রয়োজন।

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: শ্রেণিতে একটি চার ফুট দৈর্ঘ্যের ও দুই ফুট প্রস্থের টেবিল রাখতে কতটুকু জায়গা প্রয়োজন হবে? এই টেবিলটিকে তার চেয়ে ছোট টেবিলের উপর রাখতে কী সমস্যা হবে? পদার্থের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য এরূপ হবে? আমরা পদার্থের এই বৈশিষ্ট্যটি কীভাবে পরীক্ষা করতে পারি? চিন্তা করুন, সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন। একটি পানিপূর্ণ গ্লাসে কয়েকটি ইটের টুকরো রেখে কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

উপকরণ : গ্লাস, পানি, ইটের টুকরো, খালা।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি

১. নিচের ছকটি খাতায় তুলুন।

গ্লাসে রাখা ইটের টুকরোর সংখ্যা	উপচে পড়া পানির পরিমাণ	পর্যবেক্ষণের ফলাফল

২. গ্লাসভর্তি পানিতে একটি একটি করে ইটের টুকরো রাখলে কী ঘটবে? অনুমান করুন।

৩. ধীরে ধীরে একটি ইটের টুকরো রাখুন।

৪. কী ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করুন।

৫. কী পরিমাণ পানি নিচে পড়ল তা নির্ণয় করুন। একটি ইটের টুকরো গ্লাসে রাখলে যে পরিমাণ পানি পড়ল, দুইটি ইটের টুকরো রাখলে কি একই পরিমাণ পানি পড়ল না বেশি পড়ল?

৬. কেন পানি গ্লাস থেকে উপচে পড়লো? সহপাঠীর সাথে কথা বলে সিদ্ধান্তে আসুন।

ধারণা গঠন

পরীক্ষাটিতে পর্যবেক্ষণ করে আপনারা কী পেলেন? কেন গ্লাসে ইটের টুকরো রাখলে তা গ্লাসের পানিকে সরিয়ে দিল? পানি ও ইটের টুকরো দুটোই কেন গ্লাসে একসাথে অবস্থান করেনি? তাহলে কী সিদ্ধান্তে আসতে পারেন?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম, প্রত্যেক পদার্থই স্থান দখল করে। তাহলে, চিন্তা করে উত্তর দিন, একটি স্বচ্ছ পানিপূর্ণ পাত্রের মধ্যে একটি স্বচ্ছ গ্লাসকে পানিভর্তি অবস্থায় উপুড় করে রেখে, কীভাবে গ্লাসটি থেকে পানি সরানো যায়?

অনুসন্ধান ২: পদার্থের ওজন আছে।

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ: আমরা যখন কোন দ্রব্য (Object) যেমন- বই, কলম, ইট প্রভৃতিকে হাত দিয়ে উপরে তুলি বা তোলার চেষ্টা করি তখন কেমন অনুভব করি? পদার্থের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য আমরা এমন অনুভব করি?

অনুসন্ধান সম্পাদন

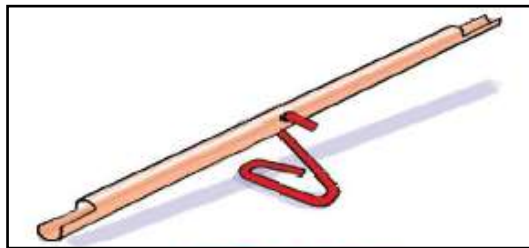
পরীক্ষণ প্রণয়ন: কোন পদার্থের এই বৈশিষ্ট্যটি কীভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে? চিন্তা করুন এবং সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন। একটি দাঁড়িপাল্লা তৈরি করে তার কোন পাল্লায় বা থ্রাস্টে কোন ক্ষুদ্র দ্রব্য/বস্তু যেমন, এক দানা চাল বা একটি স্ট্যাপলার পিন রাখলে কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

১. নিচের ছকটি খাতায় তুলুন।

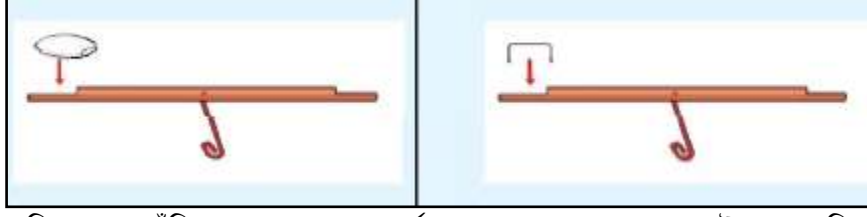
	দাঁড়িপাল্লার একপাশে একটি চালের দানা রাখলে কী ঘটে?	দাঁড়িপাল্লার একপাশে একটি স্ট্যাপলার পিন রাখলে কী ঘটে?
দাঁড়িপাল্লার অবস্থা		

২. একটি পেপার ক্লিপ ও প্লাস্টিকের ছড়ি (স্ট্র) দিয়ে নিচের চিত্রের মতো করে দাঁড়িপাল্লা তৈরি করুন।



চিত্র ৪.১: পেপার ক্লিপ ও স্ট্র দিয়ে তৈরি দাঁড়িপাল্লা

৩. দাঁড়িপাল্লার এক পাশে চালের একটি দানা রাখলে কী ঘটবে? তা অনুমান করুন।
৪. চালটি রাখলে কী ঘটে, তা পর্যবেক্ষণ করে আপনাদের উত্তর ছকে লিখুন।
৫. স্ট্যাপলারের পিন দিয়ে অনুরূপ কাজটি করুন ও পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল ছকে লিখুন।



চিত্র ৪.২: দাঁড়িপাল্লার একপাশে পর্যায়ক্রমে চালের দানা এবং স্ট্যাপলার পিন রাখা

৬. উভয়ক্ষেত্রে কেন এরূপ ঘটলো, তা নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসুন।

ধারণা গঠন

আপনারা যখন দাঁড়িপাল্লার এক প্রান্তে কোন বস্তু রাখলেন তখন সে প্রান্তে কী ঘটলো? দাঁড়িপাল্লার অপর প্রান্তে কী ঘটলো? প্রান্ত দুইটির ভারসাম্যহীনতার কারণ কী?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম, পদার্থ যত ক্ষুদ্র বা বড়ই হোক না কেন তার ওজন রয়েছে। আমরা আরও জানি, বায়ু ও একটি পদার্থ। তাহলে, বায়ুর যে ওজন আছে তা আপনি কীভাবে প্রমাণ করবেন?

অনুসন্ধান ৪.৩: পদার্থ বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে।

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ: আপনার সামনের টেবিলকে ধাক্কা দিন। কেমন অনুভব করছেন? কেন এরূপ অনুভব করেন?

পরিকল্পনা প্রণয়ন

আমরা জানি, বায়ু একটি পদার্থ। বায়ু যে বল প্রয়োগে বাধা দেয় তা আমরা কীভাবে পরীক্ষা করতে পারি? চিন্তা করুন, সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করুন। একটি পানিভর্তি বালতিতে একটি খালিগ্লাস উপুড় করে রেখে কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

উপকরণ: গ্লাস, পানি, বালতি প্রভৃতি

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

১. নিচের ছকটি খাতায় তুলুন।

বিভিন্ন পরিস্থিতি	আপনার অনুভূতি
খালি গ্লাসকে বালতির ভিতর উপুড় করে ডুবানোর সময়	
পানির ভিতর ডুবন্ত গ্লাস থেকে হাত সরিয়ে নিলে	

২. খালি গ্লাসটিকে বালতির পানিতে ডুবানোর চেষ্টা করেন, তাহলে কেমন অনুভব করবেন?
৩. পানিতে খালি গ্লাসটি ডুবানোর চেষ্টা করুন।
৪. কেমন অনুভব করছেন, কেন এরূপ অনুভব করছেন? ছকে লিখুন।

৫. ডুবানো গ্লাস হতে হাত সরিয়ে নিলে কেমন অনুভব করেন, কেন?
৬. সহপাঠীর সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করুন।

ধারণা গঠন

গ্লাসটিকে যখন ডুবানোর চেষ্টা করলেন তখন আপনার কেমন লেগেছিল? যতই ডুবানোর চেষ্টা করছেন ধাক্কা ততই বেশি অনুভব হচ্ছিল না কম অনুভব হচ্ছিল? গ্লাসের ভিতরে কেন কোন পানি প্রবেশ করেনি? এ থেকে আপনারা কী সিদ্ধান্তে আসতে পারেন?

বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্তন

এতক্ষণ আমরা দেখলাম বায়ু, পানি, ইট এগুলো কিছু জায়গা জুড়ে থাকে - সেই জায়গাটি একই সময় অন্য কিছু দখল করতে পারে না, এর ওজন আছে এবং বল প্রয়োগ করলে বাঁধা প্রদান করে। এরকম বৈশিষ্ট্য থাকলে আমরা তাদেরকে পদার্থ বলে থাকি। অন্যভাবে বলা যায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে কোন কিছু যার ভর আছে, যা কোন স্থান দখল এবং যার প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে তাকে পদার্থ (Matter) বলে (নূরুল হক, মহির উদ্দিন, উচ্চ মাধ্যমিক অজৈব রসায়ন, পৃ.০৯)। আসলে আমাদের চারপাশে আমরা নানা দ্রব্য (object/body) দেখি। যেমন- বই, খাতা, চেয়ার, টেবিল, মাটি, পানি, জামা-কাপড়, ধূলিকণা, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি। এগুলো হলো পদার্থের আকৃতি ও কাঠামোগত রূপ। আবার এই দ্রব্যগুলো যে পদার্থের তৈরি, সেই পদার্থের ধর্ম বিবেচনায় আমরা তাকে খাঁটিবস্তু বা সহজে বস্তু (Substance) বলে থাকি। তাহলে পদার্থ কী? আর বস্তুই-বা কী? বস্তু ও পদার্থের মধ্যে সম্পর্ক কী? একটি নির্দিষ্ট বস্তুতে পদার্থের সংযুক্তি ও ধর্ম নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় থাকে। যেমন- বিশুদ্ধ লোহা, বিশুদ্ধ তামা, বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন, বিশুদ্ধ পানি প্রত্যেকটি এক এক ধরনের বস্তু। বিশুদ্ধ লোহা অর্থ ঐ বস্তুতে কেবল লোহা ই রয়েছে। আবার কখনো কখনো একাধিক বস্তু একসঙ্গে থাকে, তখন আমরা তাদেরকে মিশ্রণ বলে থাকি। খাঁটি বস্তু ও মিশ্রণ দুটোই পদার্থ।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, উপাদান বা সংযুক্তি বিবেচনায় আমাদের চারপাশের পদার্থগুলোকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়।

পদার্থ (Matter)			
মিশ্রণ (Mixture)		বস্তু (Substance)	
অসমসত্ত্ব মিশ্রণ (উদাহরণ: মাটি)	সমসত্ত্ব মিশ্রণ বা দ্রবণ (শরবত, বায়ু)	মৌলিক পদার্থ (Element) (তামা, লোহা)	যৌগিক কার্যক্রম (Compound) (পানি, লবণ)

অনুসন্ধান ৪.৪: পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

প্রকৃতিতে পদার্থ নানা অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এগুলো নানা ধরনের গুণ বা বৈশিষ্ট্য দেখায়। স্বাভাবিক অবস্থায় পদার্থগুলো কী কী অবস্থায় থাকতে পারে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থায় থাকে কোন পদার্থগুলো? স্বাভাবিক অবস্থায় কঠিন পদার্থের আকৃতি ও আয়তন কেমন হয়? পদার্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ আমরা কীভাবে নির্ণয় করতে

পারি? একটি ঘনক কিংবা একটি কলমকে বিভিন্ন স্থানে রাখলে তার কীরূপ পরিবর্তন হয় ও কী পরিমাণ জায়গা দখল করে তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি

১. নিচের ছকের মতো একটি ছক আপনার খাতায় তুলুন।
২. একটি কলমকে টেবিলে এবং কোন স্বচ্ছ বাঁকা বা গোলায় খালি পাত্রে রাখলে কলমটির আকৃতির কী পরিবর্তন হবে?
৩. কলমটিকে টেবিলে ও গোলায় পাত্রে রাখুন।

নমুনা পদার্থ	বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ	পদার্থের অবস্থা	উদাহরণ
একটি কলম	১। ২। ৩।		

৪. আকৃতির কী পরিবর্তন হলো?
৫. উভয়ক্ষেত্রে কলমটি কী পরিমাণ জায়গা দখল করে তা পরিমাপ করুন? চিত্র এঁকে দেখান।

ধারণা গঠন

কলমটি বিভিন্ন স্থানে ও পাত্রে রাখলে এর আকার ও আকৃতির কী পরিবর্তন হলো? পর্যবেক্ষণ থেকে আপনারা কী পেলেন? কলমটির আয়তনের কী পরিবর্তন হলো?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম কঠিন পদার্থের আকার, আকৃতি ও আয়তন নির্দিষ্ট। তাহলে, একটি আস্ত ইটের আকৃতি কেমন তা আঁকুন।

অনুসন্ধান ৪.৫: পদার্থের তরল অবস্থার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা।

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে কোন পদার্থগুলো? তরলের আকৃতি ও আয়তন কি নির্দিষ্ট না পরিবর্তনীয়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ আমরা কীভাবে নির্ণয় করতে পারি? আকার পরিবর্তন হয় কিনা সেটি কীভাবে বোঝা যাবে?

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

১. নিচের ছকের মতো একটি ছক আপনার খাতায় তুলুন।

নমুনা পদার্থ	বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ	পদার্থের অবস্থা	উদাহরণ
এক গ্লাস পানি	১। ২। ৩।		

২. একটি স্বচ্ছ গ্লাস পানিতে পূর্ণ করে তা লক্ষ করুন।
৩. গ্লাসের ও পানির আকৃতির মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে- তা চিত্র এঁকে দেখান।
৪. এবার ঐ পানিকে একটি স্বচ্ছ বেলুনে নিন। আকারের কী পরিবর্তন হলো? চিত্র আঁকুন।

৫. কেন এরূপ হলো, সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন।
৬. উভয়ক্ষেত্রে পানির পরিমাণের কী পরিবর্তন হলো, পরিমাপ করে লিখুন।

ধারণা গঠন

পানিকে বিভিন্ন স্থানে ও পাত্রে রাখলে এদের আকৃতির কী পরিবর্তন হলো? পর্যবেক্ষণ থেকে আপনারা কী পেলেন? পানির আয়তনের কী পরিবর্তন হলো? এ থেকে কী সিদ্ধান্তে আসা যায়? তরলের আকৃতি ও আয়তন কি নির্দিষ্ট না পরিবর্তনীয়?

অনুসন্ধান ৪.৬: পদার্থের বায়বীয় অবস্থার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা।

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

কঠিন ও তরল অবস্থানের ন্যায় পদার্থ বায়বীয় অবস্থায়ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম প্রদর্শন করে। বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী হতে পারে?

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আমরা কীভাবে বায়বীয় পদার্থের ধর্মগুলো প্রমাণ (বা পরীক্ষা) করতে পারি? চিন্তা করুন, সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন। একটি বেলুনকে আংশিক ফুলিয়ে সেই ফুলানো বেলুনকে সংকুচিত ও প্রসারিত করা হলে এটির আকৃতি ও আয়তনের কী পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করার মধ্য দিয়ে কি অনুসন্ধানটি করা যেতে পারে?

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

১. নিচের ছকটি খাতায় তুলুন।

বেলুন প্রথমবার ফুলানো অবস্থার ফলাফল (১ম গিটের পর)	২য় গিটের পর ফলাফল	৩য় গিটের পর ফলাফল

২. একটি চূপসানো বেলুনকে আংশিক ফুলিয়ে সুতা দিয়ে বেলুনের এমন জায়গায় গিট দিন যাতে নির্দিষ্ট গিট থেকে ফুলানো বেলুনকে সংকুচিত ও প্রসারিত করা যায়। আরো লক্ষ রাখতে হবে, বেলুনের ভেতরের বায়ু বাইরে এবং বাইরের বায়ু বেলুনের ভেতর প্রবেশ করতে না পারে।
৩. বায়ুর আকৃতি ও আয়তন সম্পর্কে আপনাদের ধারণা ছকে লিখুন ও ছবি আঁকুন।
৪. বেলুনের প্রথম গিটটি না খুলে বেলুনের ভেতরের বায়ুসহ বেলুনকে এমনভাবে সংকুচিত করুন যাতে বেলুনটি ফেটে না যায়।
৫. কাজটি করে ফলাফল ছকে লিখুন এবং দ্বিতীয় অবস্থার ছবি আঁকুন।
৬. এবার, গিট দুইটির উপরে আরেকটি গিট দিয়ে পূর্বের গিট দুইটি খুলে দিলে কী ঘটবে?
৭. কাজটি করে ফলাফল ছকে লিখুন এবং তৃতীয় অবস্থার ছবি আঁকুন।

ধারণা গঠন

বেলুনের তিনটি অবস্থার ফলাফলের মধ্যে কী কী অমিল রয়েছে? তিনটি অবস্থায় বায়ুর আকৃতি ও আয়তন সম্পর্কে কী ধারণা করা যায়? এ থেকে বায়বীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা কী সিদ্ধান্তে আসতে পারি?

বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্তন

তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায় যে সকল পদার্থের আকৃতি ও আয়তন নির্দিষ্ট তাদেরকে কঠিন পদার্থ, যাদের আকৃতি অনির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল কিন্তু আয়তন নির্দিষ্ট তাদের তরল পদার্থ এবং যাদের আকৃতি ও আয়তন দুটোই অনির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল তাদের বায়বীয় পদার্থ বলা হয়। নিচের ছকে কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য দেওয়া হল।

সারণি ৪.১: কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	কঠিন	তরল	বায়বীয়
ভর	নির্দিষ্ট	নির্দিষ্ট	নির্দিষ্ট
আকৃতি	নির্দিষ্ট	পরিবর্তনশীল	পরিবর্তনশীল
আয়তন	নির্দিষ্ট	নির্দিষ্ট	পরিবর্তনশীল

অনুসন্ধান ৪.৭: তাপমাত্রার বৃদ্ধি বা হ্রাসে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন।

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

আমরা জানলাম, স্বাভাবিক অবস্থায় পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় থাকতে পারে। পানি অধ্যায়ে আরো জানলাম তাপ পরিবর্তনে পানি তিনটি অবস্থায় থাকতে পারে। তাহলে, প্রশ্ন হলো তাপ, চাপ ইত্যাদি পরিবর্তনে পদার্থের অবস্থার কীরূপ পরিবর্তন হয়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: তাপ প্রয়োগ করলে বা তাপ সরিয়ে নিলে পদার্থের অবস্থার কীরূপ পরিবর্তন হয় তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। এই কাজটি আমরা কীভাবে করতে পারি? চিন্তা করুন। তাপ প্রয়োগে মোমবাতি গলিয়ে (তরল করে) তা পুনরায় ঠাণ্ডা করলে আয়তনের কী পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি

১. নিচের ছকটি খাতায় তুলুন।

কাজসমূহ	পর্যবেক্ষণের ফলাফল
তাপের মোমবাতির গলিত অবস্থা	১। ২। ৩।
গলিত মোমকে ঠাণ্ডা করা অবস্থা	১। ২। ৩।

২. একটি স্বচ্ছ কাচের পাত্রে কয়েকটি মোম রেখে তাপ দিলে কী ঘটবে?

৩. কাজটি করুন।

৪. কী ঘটছে? তা সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন।

৫. গলিত মোমকে একটি টিনের কোটায় নিয়ে কিছুক্ষণ স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রেখে দিলে কী ঘটবে? কাজটি করুন এবং সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন।
৬. কী ঘটলো? কেন ঘটলো? সহপাঠীদের সাথে তা আলোচনা করুন।

ধারণা গঠন

তাপ প্রয়োগে কঠিন মোমবাতির কী পরিবর্তন হলো? আবার গলিত মোমকে যথেষ্ট ঠাণ্ডা হতে দিলে তার কী পরিবর্তন হয়?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা দেখলাম তাপ প্রয়োগে বা তাপ সরিয়ে নিলে মোমের অবস্থার পরিবর্তন হয়। তাহলে, ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার দিয়ে রোগীর দেহের তাপমাত্রা মাপার সময় পারদের উঠা-নামা কেন হয়?

বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্তন

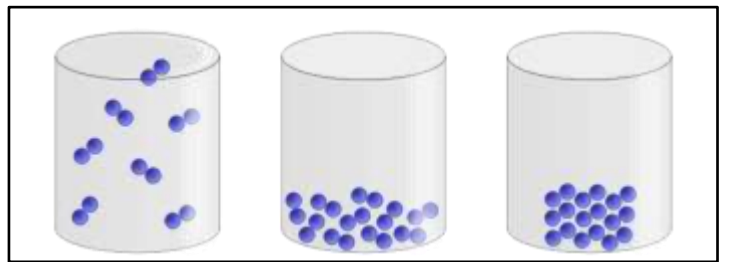
তাপের প্রভাবে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন

তাপের প্রভাবে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয়। সীসা, তামা, লোহাকে উত্তপ্ত করলে তাদেরও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কঠিন লোহাকে উত্তপ্ত করলে তরল অবস্থায় পরিণত হয় এবং আরো উত্তপ্ত করলে লোহা বাষ্পেও পরিণত হয়। তবে কিছু ব্যতিক্রমী কঠিন পদার্থ আছে, যাদেরকে স্বাভাবিক চাপে তাপ দিলে তারা তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়। এদেরকে উদ্বায়ী (Volatile) পদার্থ বলে। যেমন- ন্যাপথলিন, কর্পূর, নিশাদল ইত্যাদি। এখন, প্রশ্ন হলো, শুধু কি তাপ প্রয়োগেই পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয়? না, বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ যেমন- অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদিকে চাপ দিয়ে ঠাণ্ডা করলে সেগুলো এক সময় তরলে পরিণত হয়। আরও ঠাণ্ডা করলে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এভাবে, তাপ, চাপ, আলো, শব্দ কম্পন ইত্যাদির হ্রাস বৃদ্ধি করলে পদার্থগুলোর অবস্থার পরিবর্তন হয়।

আমরা জানলাম, প্রকৃতিতে পদার্থগুলো কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায়। আমরা আরো জানলাম তাপ, চাপ, আলো ইত্যাদি

প্রয়োগে পদার্থগুলোর অবস্থার পরিবর্তন হয়। পদার্থের এই ‘তিন অবস্থা’ এবং ‘অবস্থার পরিবর্তন’-এর কারণ কী? এর কারণ পদার্থে অণুসমূহে পারস্পরিক বন্ধন ও বিন্যাসের পরিবর্তন। দেখতে কোন পদার্থকে অবিচ্ছিন্ন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কোন পদার্থই অবিচ্ছিন্ন নয়, বরং বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে

ফাঁকা জায়গা থাকে। যেমন- কয়েকটি ছোট ছোট মার্বেলকে একত্রিত করলে এদের মাঝে ফাঁকা স্থান থাকে তেমনটি এই ফাঁকা স্থানকে আন্তরাণবিকস্থান (Intermolecular space) বলে।



বায়বীয়

তরল

কঠিন

চিত্র ৪.৩: পদার্থের বিভিন্ন অবস্থায় অণুসমূহের অবস্থান

তাছাড়া, পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে থাকে এক ধরনের আকর্ষণ শক্তি, যা আন্তরাণবিক শক্তি (Intermolecular force) বলে। এই আকর্ষণ শক্তির কারণে পদার্থে অণুগুলো একটি বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কঠিন অবস্থায় অণুসমূহের মধ্যে আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি থাকে। তখন অণুগুলো খুব কাছাকাছি থাকে তথা আন্তরাণবিক ফাঁকা স্থান কম এবং দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। তাই কঠিন পদার্থের আকৃতি ও আয়তন নির্দিষ্ট। তরল পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে আন্তরাণবিক ফাঁকা স্থান কঠিন পদার্থ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি এবং আকর্ষণ শক্তি অপেক্ষাকৃত কম থাকে। অর্থাৎ তরল পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে ফাঁকা জায়গা থাকে। যার ফলে অণুগুলো গড়াগড়ি করতে পারে। তাই পদার্থের আকৃতি নির্দিষ্ট থাকে না। যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। তবে অণুসমূহের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ আকর্ষণ থাকায় তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকে। অন্যদিকে, বায়বীয় পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে আন্তরাণবিক স্থান বেশি এবং অণুসমূহের মধ্যে আকর্ষণও তেমন থাকে না। ফলে অণুগুলো স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে। তাই বায়বীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোন আকৃতি ও আয়তন নেই।



চিত্র ৪.৪ : পানির বিভিন্ন অবস্থা

এবার চিন্তা করে উত্তর দিন-লোহা কেন

কঠিন? পানি কেন তরল? অক্সিজেন কেন

গ্যাস? এবার আলোচনায় আসা যাক, কেন

কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তরল এবং তরলে তাপ দিলে বাষ্প হয়? আমরা জানি, কোন কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ অণুগুলো গতি শক্তি লাভ করে ফলে এদের মধ্যে বন্ধন শিথিল হয়ে তরল পদার্থে পরিণত হয়। আরও তাপ প্রয়োগ করলে বন্ধনমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়। লক্ষণীয় পাত্যেক ক্ষেত্রে পদার্থের অণুসমূহের আন্তরাণবিক ফাঁকাস্থানের হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণে পদার্থের অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটেছে। এক্ষেত্রে অণুসমূহের গঠনের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আমরা নিশ্চয়ই পদার্থের তিনটি ভৌত অবস্থার কারণ এবং অণুসমূহের মধ্যকার আকর্ষণ বলের সঙ্গে এ ভৌত অবস্থাগুলোর সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পেরেছি। নিচের ছকটি পূরণ করে তা প্রমাণ করি।

সারণি ৪.২: কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থের তুলনা।

ধর্ম (Properties)	কঠিন পদার্থ	তরল পদার্থ	গ্যাসীয় পদার্থ
আকার			
আয়তন			
অণুগুলোর মধ্যকার আকর্ষণ			
অণুর বা অণুগুচ্ছের গতি			

অনুসন্ধান ৪.৮: মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ শনাক্তকরণ

অনুসন্ধান আমন্ত্রণ

আমরা সাধারণত কোনো পদার্থকে একটি কাঠামোরূপে সামগ্রিকভাবে দেখি কিংবা তার ভৌত অবস্থাকে দেখি বা তার অস্তিত্ব অনুভব করি; বলে থাকি পদার্থটি কঠিন-তরল, সাদা-কালো ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেক

পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের। ধর্মের ভিন্নতা দেখা যায় পদার্থের গঠনের ভিন্নতার কারণে। গঠনগত দিক থেকে বস্তুসমূহের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করতে পারি?

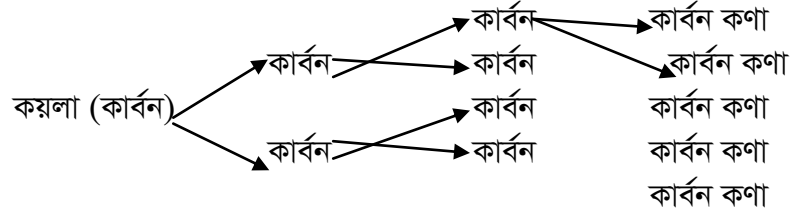
অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: বস্তু তথা পদার্থসমূহকে খুব ছোট কণায় পরিণত করলে এগুলোর স্বভাব বা ধর্মের কী ধরনের পরিবর্তন হয় তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। এই কাজটি আমরা কীভাবে করতে পারি? চিন্তা করুন? এক টুকরো কয়লা ও এক টুকরো চককে ধাপে ধাপে ছোট ও পরবর্তিতে খুব ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করলে এদের স্বভাব বা ধর্মের কীরূপ পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

অনুসন্ধান কাজ-১: কয়লাকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্তকরণ।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি :

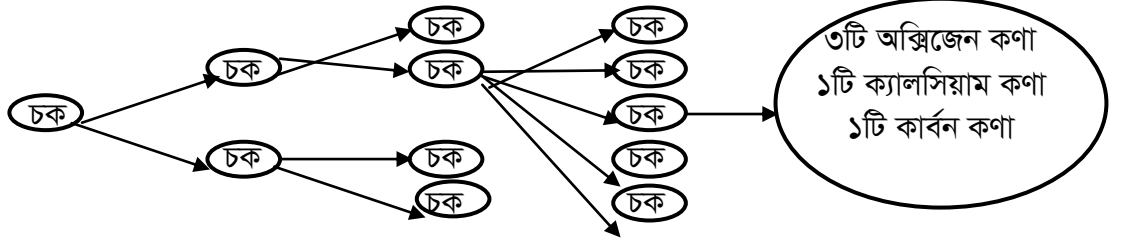
১. এক টুকরো কয়লাকে ধাপে ধাপে ছোট করতে থাকুন- যতক্ষণ খালিচোখে দেখা যায়।
২. এতে কয়লার কী পরিবর্তন হলো।
৩. টুকরোগুলো মিহি করা হলে কী পরিবর্তন হবে? সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন।
৪. পরীক্ষণের সাথে নিচের ডায়াগ্রামের সম্পর্ক বের করুন।



অনুসন্ধান কাজ-২ চককে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্তকরণ।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি :

১. অনুরূপে 'চক' দিয়ে পরীক্ষণটি সমাপ্ত করুন।
২. পরীক্ষণের সাথে নিচের ডায়াগ্রামের সম্পর্ক বের করুন।



ধারণা গঠন

কয়লার রং কী?। কয়লা তথা কার্বনকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে সবশেষে কী পাওয়া যাবে? সেক্ষেত্রে কার্বনের গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কী পরিবর্তন হয়? অপরদিকে, চককে ভাঙার ফলে একটা পর্যায় পর্যন্ত চকের গুণ বজায় ছিল। এরপর আরো ভাঙার ফলে চকের গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কী পরিবর্তন হয়?

বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্তন

আমরা কোন পদার্থকে একটি কাঠামোরূপে সামগ্রিকভাবে দেখি অথচ প্রত্যেকটি পদার্থ খালি চোখে দেখা যায় না এমন 'সূক্ষ্ম কণা' দিয়ে গঠিত। যে সকল পদার্থকে ভাঙলে ঐ একই পদার্থ ছাড়া অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না তাদেরকে মৌলিক পদার্থ বলে। যেমন- এক টুকরো বিশুদ্ধ তামাকে ভাঙতে ভাঙতে এক সময় এমন ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায় যে, এ ক্ষুদ্র অংশকে আর খালি চোখে দেখা যায় না। তখনও খন্ডিত অংশগুলো তামারই হবে। অর্থাৎ তামা একটি মৌলিক পদার্থ। অনুরূপভাবে, সোনা, রূপা,

অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নিয়ন, আর্গন ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত ১১৮টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন।

এবার আমরা চকের এক টুকরোকে ভাঙতে ভাঙতে এক সময় এমন ছোট অংশ পাওয়া যাবে যে, সেগুলোকে আর খালি চোখে দেখা যাবে না। আর ভাঙা অংশগুলোতে চকের গুণ বা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে না। চকের পরিবর্তে ভাঙা অংশগুলোতে ক্যালসিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেনের গুণ বা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ চককে ভাঙলে কয়েকটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। তাহলে বলা যায়, যে সকল পদার্থকে ভাঙলে একের অধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তাদেরকে যৌগিক পদার্থ বলে। এখানে চক একটি যৌগিক পদার্থ। অনুরূপভাবে, আপনি খাবার লবণকে ভাঙলে সোডিয়াম ও ক্লোরিন, পানিকে ভাঙলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, চিনিকে ভাঙলে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাবেন। তাই এগুলো যৌগিক পদার্থ। পৃথিবীতে যৌগিক পদার্থের সংখ্যা অসীম। এগুলো প্রকৃতিতে যেমন পাওয়া যায় তেমনি কৃত্রিমভাবেও তৈরি করা যায়।

অনুসন্ধান ৪.৯: পদার্থের গঠন- অণু ও পরমাণুর মডেল তৈরি

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য কী? কয়লা ও চককে ভেঙ্গে আপনারা কী পেয়েছিলেন? যে সকল পদার্থকে আর ভাঙা যায়না তাকে কী বলে? তাহলে আমরা দেখলাম, পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন ধরনের মৌলিক একক পাওয়া যায়। অর্থাৎ পদার্থগুলো বিভিন্ন মৌলিক এককের সমষ্টি। তাহলে প্রশ্ন হলো, পদার্থ কীভাবে গঠিত হয়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: পদার্থসমূহকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে অণু ও পরমাণু পাওয়া যায়। অণু ও পরমাণুগুলো কোন পদার্থের মৌলিক একক হয়। তাহলে, আপনারা কীভাবে বিভিন্ন পদার্থের মডেল তৈরি করতে পারেন? চিন্তা করুন, সহপাঠীদের সাথে কথা বলুন। ছোট আকৃতির বিভিন্ন রঙের প্লাস্টিকের বল ও আঠা লাগিয়ে বিভিন্ন পদার্থের মডেল তৈরি করে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

১. প্রথমে একই রঙের বেশ কয়েকটি বলকে আঠা লাগিয়ে যতটা সম্ভব আয়তাকার কাঠামো তৈরি করুন। মনে করুন, এটি একটি তামার বস্তু।
২. মডেলটির গঠন ব্যাখ্যা করুন।
৩. এরপর দুইটি একই রঙের বল পাশাপাশি লাগিয়ে একটি মডেল তৈরি করুন। মনে করুন, এটি একটি হাইড্রোজেন গ্যাসের অণুর মডেল।
৪. মডেলটির গঠন ব্যাখ্যা করুন।

ধারণা গঠন

তামার বস্তুর মডেলে মৌলিক একক কী? তামাকে বিশ্লেষণ করে ‘একক পরমাণু’ পরিণত করা যায়, যার মধ্যে তামার গুণ বা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে এবং এটি তামার বস্তুতে বিদ্যমান ক্ষুদ্রতম কণা। অপরদিকে

হাইড্রোজেন গ্যাসের মডেল মৌলিক একক কী? হাইড্রোজেন গ্যাসের অণুর মডেলকে বিশ্লেষণ করে দুইটি পরমাণু পাওয়া যায়, যার মধ্যে (অণুর মডেলে) ঐ গ্যাসের গুণ বা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে।

ধারণা প্রয়োগ

এবার, আপনারা অক্সিজেনের অণু, হাইড্রোজেনের অণু ও পানির অণুর মডেল তৈরি করুন।

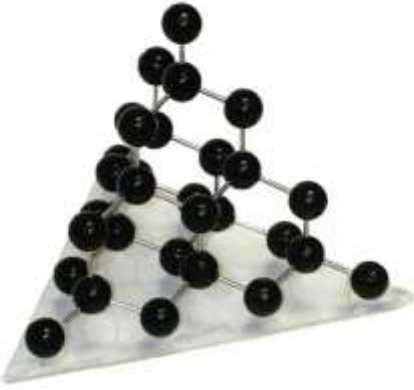
বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্তন

পদার্থের গঠন

আমরা জানলাম, মৌলিক পদার্থকে ভাঙলে এমন ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যায় যা খালি চোখে দেখা যায় না এমনকি অনেক সময় শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ও দেখা যায় না। এ ক্ষুদ্রতম কণাগুলোতে ঐ মৌলিক পদার্থের গুণ বা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। তবে ঐ কণাগুলো স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না।



চিত্র ৪.৫: ডায়মণ্ড

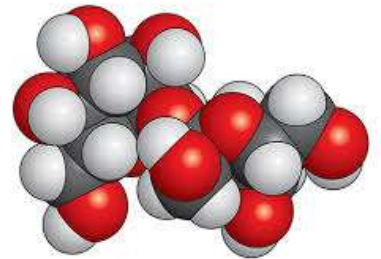


চিত্র ৪.৬: মডেলে কাঠি ও বল ব্যবহার করে ডায়মণ্ডের কার্বন পরমাণু প্রদর্শন

নিজেদের মধ্যে কিংবা অপর পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার সাথে একত্রিত হয়ে যায়। এসব ক্ষুদ্রতম কণার নামই পরমাণু। পরমাণু পদার্থের মূল গঠন উপাদান। সাধারণত, একটি মৌলিক পদার্থ একই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক পরমাণু দিয়ে গঠিত। তবে, ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু দিয়ে গঠিত। যেমন- লোহার ও তামার পরমাণু পরস্পর ভিন্ন ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য দেখায়।

প্রকৃতিতে বিছু ব্যতিক্রম ছাড়া (নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ক্ষেত্রে) কোন পরমাণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না। একই পদার্থের দুই বা ততোধিক পরমাণু কিংবা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দুই বা ততোধিক পরমাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। অণু গঠিত হয়ে গেলে পরমাণুগুলো আলাদাভাবে আর তাদের ধর্ম প্রকাশ করে না, তারা অণুর ধর্মই প্রকাশ করে। যেমন- দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি হাইড্রোজেন অণু গঠন করে। দুইটি, হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে একটি পানির অণু গঠন করে। এখানে লক্ষণীয়, দুইটি একই ধরনের পরমাণু দ্বারা গঠিত

অণুগুলো মৌলিক পদার্থের এবং ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু দ্বারা



গঠিত অণুগুলো যৌগিক পদার্থের। অর্থাৎ অণু মৌলিক ও যৌগিক উভয়েরই হয়। তাহলে বলা যায় পদার্থগুলো অসংখ্য অণুর সমষ্টি। কারণ বস্তুর অণু হলো ঐ বস্তুটির এমন প্রান্তিক

অবস্থা, যে অবস্থার ঠিক পর ঐ বস্তুটির ধর্ম আর বিরাজ করে না, তবে বস্তুটির ঐ প্রান্তিক অবস্থাকে ঐ বস্তুটির অণু বলা হয়। যেমন- চিনির একটি ‘খুব ছোট’ দানাকে আমরা চিনির অণু বলতে পারি না, বরং চিনির ঐ দানাটি মিলিয়ন মিলিয়ন অণুর সমন্বয়ে গঠিত।

অনুসন্ধান ৪.১০: ধাতু ও অধাতুর তাপ-পরিবাহিতা

অনুসন্ধানের আমন্ত্রণ

আমাদের চারদিকে আমরা নানা দ্রব্য দেখি যেগুলো ভিন্ন-ভিন্ন মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। এগুলোর কোনটি ধাতু, কোনটি অধাতু? তাহলে, ধাতু ও অধাতুর মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করতে পারি?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: তাপ কিছু পদার্থের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, আবার কিছু পদার্থের মধ্য দিয়ে আংশিক কিংবা একেবারেই প্রবাহিত হয়না। তাহলে, কোন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ প্রবাহিত হয় তা কীভাবে পরীক্ষা করা যায়? চিন্তা করুন, সহপাঠীর সাথে কথা বলুন। এক টুকরো অ্যালুমিনিয়ামের তার ও অব্যবহৃত শুষ্ক ব্যাটারির একটি কালো দণ্ড কোন গরম পারিপূর্ণ পাত্রের রাখলে কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি

১. নিচের ছকটি খাতায় তুলুন।

পদার্থসমূহ	যেমন অনুভব করেন	ধাতু/অধাতু
অ্যালুমিনিয়াম দণ্ড		
ব্যাটারির ভেতরের কালো দণ্ড		

২. গরম পানিপূর্ণ পাত্রের দণ্ডসমূহ রাখলে কোনটি কেমন অনুভব করবেন?

৩. পাত্রের ভেতর দণ্ডগুলো রাখুন।

৪. হাত দিয়ে দণ্ডগুলো অনুভব করুন।

৫. সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে দণ্ডগুলোকে ধাতু ও অধাতুতে বিভক্ত করুন।

ধারণা গঠন

দণ্ড দুইটির মধ্যে কোনটিকে অপেক্ষাকৃত বেশি গরম এবং কোনটিকে কম গরম মনে হয়েছে? এরূপ মনে হওয়ার কারণ কী?

ধারণা প্রয়োগ

রান্না করার পাত্রগুলো কিসের তৈরি হওয়া প্রয়োজন?

ধারণা পরিবর্তন

আপনারা নিশ্চয়ই স্বর্ণের তৈরি গহনা দেখেছেন। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এগুলো দেখতে কী রকম। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়তো বা উত্তর আসবে স্বর্ণের তৈরি জিনিস উজ্জ্বল। কয়লার ক্ষেত্রে এর উত্তর কী হবে? কয়লা ও সোনার মধ্যে পার্থক্য বা কোথায়? যে সকল মৌলিক পদার্থ সাধারণ অবস্থায় কঠিন, দৃঢ়, উজ্জ্বল বা চকচকে, ওজনে ভারী, আঘাত করলে ঝনঝন শব্দ করে এবং তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী, সেই মৌলিক পদার্থকে ধাতু বলে। লোহা, তামা, সোনা প্রভৃতি হলো ধাতু। অন্যদিকে যে মৌল অবস্থায় কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়, ওজনে হালকা, যা উজ্জ্বল বা চকচকে, ভঙ্গুর, আঘাত করলে ঝনঝন শব্দ উৎপন্ন

হয় না, যা তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী সেই মৌলগুলোকে বলা হয় অধাতু। যেমন-হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, পানি, হিলিয়াম, নিয়ন, আয়োডিন ইত্যাদি।

দৈনন্দিন জীবনে ধাতুর ব্যবহার

ধাতুর মধ্যে লোহা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। দা, বটি, কুড়াল, ছুরি, কাঁচি, কোদাল, লাঙল, নিড়ানিসহ বিভিন্ন কৃষিজ, গৃহ ও শিল্পসামগ্রী, যন্ত্রপাতি, যানবাহন এগুলো তৈরি হয় লোহা থেকে। বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য তামার তার ব্যবহার করা হয়। হাঁড়ি-পাতিল এবং দরজা ও জানালার ফ্রেম তৈরিতে ব্যবহৃত হয় অ্যালুমিনিয়াম। টিনকে ঘরের চাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সোনা মূল্যবান গহনা ও বিভিন্ন পদক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

উপধাতু বা অপধাতু

ধাতু এবং অধাতু ছাড়াও এমন কিছু মৌলিক পদার্থ আছে যেমন আর্সেনিক, সিলিকন ইত্যাদি যাদের কিছু ধর্ম ধাতুর মতো আবার কিছু বৈশিষ্ট্য অধাতুর মতো। এসব মৌলকে উপধাতু বা অপধাতু বলে।

প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিজ্ঞানীরা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানসমূহ তথা পদার্থকে নিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। নিত্যনতুন আবিষ্কার করছেন পদার্থের আচরণ-নীতি ও ধর্ম। আর এসব নীতি ও ধর্মকে কাজে লাগিয়ে মানুষ যেমন প্রায়ুক্তিক উৎকর্ষ অর্জন করছে, তেমনি এগুলোকে ব্যবহার করে তাদের জীবনকে করছে সুখময় ও গতিময়। বালির ধর্মকে ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আই.সি, সম্প্রতি গ্রাফাইট থেকে বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন কার্বনের আরেকটি রূপ গ্রাফিন। হীরাকে সরিয়ে এটিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কঠিন পদার্থ। শুধু তাই নয়, গ্রাফিন এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো বিদ্যুৎ পরিবাহী। গ্রাফিনের ধর্মকে কাজে লাগাতে বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে অনেক পরিকল্পনা করছেন। তাই, ভৌতবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পদার্থ সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

শক্তি সম্পর্কিত অনুসন্ধান

অনুসন্ধান ৪.১১: শক্তির উৎস

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ: আমরা কাজ করার শক্তি কোথা থেকে পাই? লাইট বা টিভি চলে কীভাবে? গাড়ি চলে কীভাবে? কখনো কি তা ভেবে দেখেছেন?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: দৈনন্দিন জীবনে সকল কাজে শক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই শক্তি আমরা কোথা থেকে পাই? শক্তির এই উৎসগুলো কীভাবে চিহ্নিত করা যায় তা একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

- ১। ব্যাটারিযুক্ত একটি এবং ব্যাটারি ছাড়া একটি খেলনা গাড়ি শিক্ষার্থীদের সামনে রাখুন। কোন গাড়িটি চলবে তা শিক্ষার্থীদের অনুমান করতে বলুন।
- ২। গাড়ি দুইটির সুইচ অন করে শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন
- ৩। গাড়ি চলার কারণ খাতায় লিখতে বলুন।

ধারণা গঠন: দুটি গাড়ির মধ্যে কোন গাড়িটি চলছে? গাড়ি চলার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এলো কোথা থেকে?

ধারণা প্রয়োগ: শক্তি কখনো আসে কয়লা, তেল বা খাবার থেকে। কখনো আসে বাতাস বা পানির প্রবাহ থেকে। কখনো বৈদ্যুতিক ব্যাটারি বা জেনারেটর থেকে। সাধারণ অর্থে শক্তির উৎস হলো কয়লা, তেল, গ্যাস, খাদ্য, জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ, বৈদ্যুতিক ব্যাটারি, জেনারেটর ইত্যাদি। এসব উৎস থেকেই আমরা তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, শব্দ ইত্যাদি পাই। কিন্তু মূলত সমস্ত শক্তির উৎস হলো সূর্য। সূর্যের আলো পেয়েই উদ্ভিদ বা গাছপালা বৃদ্ধি পায়।

অনুসন্ধান ৪.১২: শক্তির বিভিন্ন রূপ

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ: আমাদের কাজ করার সামর্থ্যের জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তা আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে পাই। ব্যাটারি দিয়ে গাড়ি, টর্চ বাতি অথবা রেডিও চালানো যায়। আবার তেলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তেলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে শক্তির জোগান দিয়েছি। আমাদের চারপাশে শক্তি কী কী রূপে থাকতে পারে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আমাদের চারপাশে শক্তি বিভিন্ন রূপে বিরাজ করছে। শক্তির বিভিন্ন রূপ কীভাবে চিহ্নিত করা যায় তা একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। আলোচনার মাধ্যমে কীভাবে কাজটি করা যায় তার একটি পরিকল্পনা করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

১. শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন চোখ বন্ধ করলে কিছু দেখতে পায় কি না। কেন?
২. আমরা কথা বললে শুনতে পাই কেন?
৩. রান্না করার সময় আগুন জ্বালাই। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন এক্ষেত্রে কোন শক্তি কাজ করে কিনা।

ধারণা গঠন: চোখ বন্ধ থাকলে দেখতে পাই না কিন্তু চোখ খোলা থাকলে দেখি, কেন? কথা বললে শোনা যায় কেন? অন্ধকারে আগুন জ্বালালে দেখা যায়, আবার রান্নার সময় আগুন জ্বালানো হয়, কেন?

ধারণা প্রয়োগ: আলোক শক্তির সাহায্যে আমরা দেখতে পাই। আবার কথা শুনতে পাই শব্দ শক্তির সাহায্যে। শব্দ শক্তি শক্তির একটি রূপ। আমাদের চারপাশে শক্তি আর কোন কোন রূপে বিদ্যমান?

অনুসন্ধান ৪.১৩: শক্তির এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর।

অনুসন্ধান আমন্ত্রণ

শক্তির বিভিন্ন রূপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যে কোন এক ধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। আমাদের চারপাশে কী কী ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: শক্তির রূপান্তর পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এটা আপনারা কীভাবে করতে পারেন তা অন্যদের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

- ১। একজন শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষের বৈদ্যুতিক পাখা ও লাইটের সুইচ অন করতে বলুন। তারপর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন কোন ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটছে কি না। ঘটলে কী ধরনের রূপান্তর হচ্ছে?
- ২। একটি মোমবাতি জ্বালান এবং শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করতে বলুন কী ঘটছে?
- ৩। একজন শিক্ষার্থীকে ডেকে মোমবাতির কাছে হাত রাখতে বলুন। সে হাতে কী অনুভব করছে তা সবাইকে বলুন। একইভাবে একটি টর্চ লাইট জ্বালিয়ে জিজ্ঞেস করুন এক্ষেত্রে কী ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটছে।

ধারণা গঠন: বৈদ্যুতিক পাখা চলা, লাইট জ্বালা, মোমবাতির আলো ও তাপ চর্চ লাইটের আলো ইত্যাদি ঘটনা থেকে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন এসব ক্ষেত্রে শক্তির রূপান্তর কীভাবে হচ্ছে? কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে?

ধারণা প্রয়োগ: আমরা দেখলাম, বৈদ্যুতিক পাখা ও লাইটের সুইচ অন করলে যথাক্রমে বাতাস ও আলো পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি রূপান্তরিত হয় যথাক্রমে যান্ত্রিক শক্তি এবং তাপ ও আলোক শক্তিতে। একইভাবে বৈদ্যুতিক ইম্প্রি, হিটার, আলট্রাসোনিক শব্দ তরঙ্গ ইত্যাদির ক্ষেত্রে শক্তির কী ধরনের রূপান্তর ঘটে?

অনুসন্ধান ৪.১৪: চৌম্বক শক্তি ও এর ব্যবহার

অনুসন্ধানের আমন্ত্রণ

আমাদের অনেকের বাসায় কলিংবেল আছে। কলিংবেল চাপলে শব্দ উৎপন্ন হয়। কলিংবেল চাপার সময় এক ধরনের শক্তি কাজ করে। এখানে কোন ধরনের শক্তি কাজ করে বলে মনে হয়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: বিভিন্ন ক্ষেত্রে চৌম্বক শক্তি কীভাবে কাজ করে তা চিহ্নিত করা দরকার। এটা আপনারা কীভাবে করতে পারেন? এটা কীভাবে করা যেতে পারে তা একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

১. টেবিলের উপর একটি কাগজের চারপাশে কিছু আলপিন ছড়িয়ে দিন।
২. এরপর কাগজের মাঝখানে চুম্বকটি স্থাপন করুন।
৩. স্থাপনের পর কি ঘটতে যাচ্ছে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন।



৪. শিক্ষার্থীদের ঘটনাটি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।

ধারণা গঠন

ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল আলপিনগুলোর মধ্যে চুম্বক স্থাপনের ফলে আলপিনগুলো চুম্বকের দিকে সরে আসে। এক পর্যায়ে আলপিনগুলো চুম্বকের গায়ে লেগে থাকে। এখন শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন কেন আলপিনগুলো চুম্বকের দিকে সরে আসল? কোন আকর্ষণ বলে এগুলো চুম্বকের গায়ে লেগে থাকে?

ধারণা প্রয়োগ

চুম্বকের আকর্ষণ বলের কারণে আলপিন চুম্বকের গায়ে লেগে থাকে। এই আকর্ষণ হল চৌম্বক শক্তি। এই চৌম্বক শক্তি ব্যবহার করে কলিংবেল, রেফ্রিজারেটরের দরজা শক্তভাবে আটকিয়ে রাখা যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আর কোন কোন ক্ষেত্রে চৌম্বক শক্তির ব্যবহার রয়েছে?

অনুসন্ধান ৪.১৫: বিদ্যুৎ শক্তি ও এর ব্যবহার

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ: গরমকালে ঠাণ্ডা বাতাস পাওয়ার জন্য আমরা বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করে থাকি। আবার রাতে আলো পাওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করে থাকি। বৈদ্যুতিক পাখা বা লাইট চলে কীভাবে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার চিহ্নিত করা দরকার। এটা আপনারা কীভাবে করতে পারেন? এটা কীভাবে করা যেতে পারে তা একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যেতে পারে তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

১. একজন শিক্ষার্থীকে ডেকে এসে শ্রেণিকক্ষের বৈদ্যুতিক বাতির সুইচ অন করতে বলুন।
২. আবার আরেকজন শিক্ষার্থীকে ডেকে এসে বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ অন করতে বলুন।
৩. এরপর শিক্ষার্থীদের ঘটনা দুটি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।
৪. আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে এই ঘটনা দুটির সম্পর্ক খাতায় লিখতে বলুন।

ধারণা গঠন: ঘটনা দুইটি পর্যবেক্ষণ করে কী পেলেন? বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠার কারণ কী? বৈদ্যুতিক পাখা ঘোরার কারণ কী?

ধারণা প্রয়োগ: বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে আমরা বৈদ্যুতিক পাখা থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ও বৈদ্যুতিক বাতি থেকে আলো পাই। তাহলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আর কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার রয়েছে?

অনুসন্ধান ৪.১৬: শক্তির সংরক্ষণ

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

সংরক্ষণ হল কোন বস্তু বা পদার্থ যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থা বজায় রাখা। অর্থাৎ ঐ বস্তু বা পদার্থের অপচয় রোধ করা। তাহলে আমরা কীভাবে শক্তি সংরক্ষণ করতে পারি?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: শক্তির অপচয় রোধ করে কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় তা একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যেতে পারে তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

উপকরণ: টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক বাতি, বৈদ্যুতিক পাখা।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

১. আমাদের শ্রেণিকক্ষে বৈদ্যুতিক বাতি ও বৈদ্যুতিক পাখা আছে। ফাঁকা শ্রেণিকক্ষে আমি যদি বৈদ্যুতিক বাতি ও পাখা চালিয়ে রাখি তাহলে কি হবে?
২. শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলুন।
৩. তারপর তাদের মতামত উপস্থাপন করতে বলুন।

ধারণা গঠন: ফাঁকা শ্রেণিকক্ষে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে রাখতে বিদ্যুতের অপচয় হয়। বিদ্যুতের অপচয় রোধে আমরা কী করতে পারি?

ধারণা প্রয়োগ: অপ্রয়োজনে বৈদ্যুতিক বাতি ও পাখা না চালিয়ে আমরা শক্তির সংরক্ষণ করতে পারি। আর কীভাবে আমরা শক্তির সংরক্ষণ করতে পারি?

শক্তি সংক্রান্ত ধারণা পরিবর্ধন

দৈনন্দিন জীবনে শক্তি

শক্তি শব্দটিকে আমরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকি। কখনো বুঝে আবার কখনো না বুঝেই আমরা শক্তির বিভিন্ন রূপের সাথে পরিচিত। শক্তির ব্যবহারে অসংখ্য উদাহরণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায়। এমনকি আমাদের স্কুলে এবং এর আশেপাশে শক্তির নানা রকম ব্যবহার দেখা যায়। আপনি হেঁটে বাসা থেকে স্কুলে আসেন, তখন আপনার শক্তি প্রয়োগ করতে হয় কি? একজন রিকশাচালককে তার প্যাডেল চাপতে কি তার শক্তির ব্যয় করতে হয়? বিদ্যালয়ে যে নলকূপ থাকে তার থেকে পানি ওঠাতে কি শক্তি দরকার হয়? গাড়ির ইঞ্জিন চালাতে কি শক্তির দরকার হয়? উপরের উদাহরণ থেকে বোঝার চেষ্টা করুন, শক্তি কী? কোন কাজ করতে আমাদের শক্তি দরকার হয়। পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায়, কাজ করার সামর্থ্য হলো শক্তি।

আবার কোনো অবস্থা পরিবর্তনের জন্য শক্তি দরকার। শীতকালে আপনার ঘর বেশ ঠাণ্ডা থাকে কি? ঘর গরম করতে হবে, এজন্য কী দরকার? দরকার তাপশক্তি। এ বিবেচনায় বলা যায়, শক্তি হলো পরিবর্তনের নিয়ামক বা উৎস।

কাজ ও শক্তি

মনে করুন দুজন শিক্ষার্থী সিদ্ধান্ত নিলো যে তারা স্কুলের খেলার মাঠটিকে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করবে। শুরু করার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল একজন দুইবার প্রদক্ষিণ করার পর বসে পড়লো, আরেকজন পাঁচবারই প্রদক্ষিণ করলো। এখানে আমরা কাজ করার সামর্থ্যকে বিবেচনা করবো। এদের মধ্যে যে দুইবার প্রদক্ষিণ করে বসে পড়লো, সে কাজ করার সামর্থ্য ফুরিয়ে ফেললো। আর যে পাঁচবারই প্রদক্ষিণ করলো, তার কাজ করার সামর্থ্য বেশি। বিজ্ঞানের ভাষায় এই কাজ করার সামর্থ্যই হলো শক্তি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে কাজের সাথে শক্তি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। কাজ ও শক্তি মূলত ভিন্ন কিছু নয়। কাজ করার জন্য প্রয়োজন

হয় শক্তির। যার যত বেশি শক্তি সে তত বেশি কাজ করতে পারে। শক্তি প্রধানত চারটি কাজ করতে পারে; কোন জিনিসের স্থান পরিবর্তন করা, শব্দ সৃষ্টি করা; আলো ও তাপ সৃষ্টি করা।

কোন কিছুর স্থান পরিবর্তন করা: শক্তি কোন কিছু নাড়াতে পারে। বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ফ্যান ঘোরানো হয়। ব্যাটারির বিদ্যুৎ ব্যবহার করে খেলনা গাড়ি চলে। তাপ শক্তিও কোন জিনিস নাড়াতে পারে। পানিতে উত্তাপ দিলে বাষ্প তৈরি হয়। বাষ্পের শক্তি ব্যবহার করে ট্রেন ও জাহাজ চলে।

শব্দ সৃষ্টি করা: শক্তি শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। রেডিও, টেলিভিশন, মাইক, কলিং বেল, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ইত্যাদিতে যে শব্দ শোনা যায় তা সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে।

আলো সৃষ্টি করা: শক্তি আলো সৃষ্টি করতে পারে। বৈদ্যুতিক বাতি ও টর্চ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আলো ছড়ায়। টেলিভিশনের পর্দায় আমরা ছবি দেখি, কারণ টেলিভিশন আলো ছড়ায়। তাপশক্তিও আলো সৃষ্টি করতে পারে। দিয়াশলাই কাঠি জ্বালালে আমরা আলো ও তাপ দুটোই পাই।

তাপ উৎপাদন: শক্তি তাপ সৃষ্টি করতে পারে। বৈদ্যুতিক বাতি আলো ছড়ানোর সাথে সাথে তাপও সৃষ্টি করে। মোমবাতি জ্বালালে আলো ও তাপ সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ শক্তিও তাপ উৎপাদন করতে পারে। আমরা যখন কাপড় ইস্ত্রি করি তখন বিদ্যুৎ শক্তি তাপ সৃষ্টি করে।

শক্তির উৎস

আমাদের কাজ করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা আমরা কোথা থেকে পাই? আমাদের চারপাশে রয়েছে শক্তির বিভিন্ন উৎস। যেমন-আপনারা নিশ্চয় কয়লা বা লাকড়ি দিয়ে রান্না করতে দেখেছেন। আবার দেখেছেন গাড়ি চালাতে যে শক্তি দরকার তা পেট্রোলিয়াম থেকে আসে। আমাদের শরীরে খাদ্য থেকে আমরা শক্তি পাই। এভাবে আমরা দেখি বিভিন্ন উৎস থেকে শক্তি পাই। তবে সকল ধরনের শক্তির আসল উৎস সূর্য। একটি উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে।

বলা হয়েছে, গাড়ির ইঞ্জিনের শক্তি আসে পেট্রোলিয়াম পুড়িয়ে। পেট্রোলিয়ামে শক্তি এলো কোথা থেকে। পেট্রোলিয়াম আসলে উদ্ভিদ থেকে এসেছে। উদ্ভিদে শক্তি এসেছে কোথা থেকে? এসেছে সূর্য থেকে। সূর্যের আলোর শক্তি কার্বন-ডাই অক্সাইড ও পানির সাহায্যে উদ্ভিদের পাতায় গ্লুকোজ তৈরি করেছে। সেই গ্লুকোজ উদ্ভিদের দেহ, মূল, ফল তৈরি করেছে। সেই উদ্ভিদ মাটির নিচে চাপা পড়ে পেট্রোলিয়ামে পরিণত হয়েছে। নিচের প্রবাহ চিত্র থেকে ভালোভাবে বুঝতে পারা যায় কীভাবে সূর্যের শক্তি পেট্রোলিয়ামে সঞ্চিত হয়েছে।

সূর্যের শক্তি → উদ্ভিদের পাতায় গ্লুকোজ → উদ্ভিদ দেহ, মূল, পাতা, ফল → পেট্রোলিয়াম
→ তাপশক্তি

একইভাবে সূর্যের শক্তি আমরা খাদ্যের মাধ্যমে পাই।

সূর্যের শক্তি → উদ্ভিদের পাতায় গ্লুকোজ → উদ্ভিদ দেহ, মূল, পাতা, ফল, শস্য → শরীর
জাতীয় খাদ্য → দেহের শক্তি

শক্তির বিভিন্ন রূপ

আমাদের চারপাশে শক্তি বিভিন্ন রূপে বিরাজমান। যেমন- পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে এবং সাইকেল চালাতে আমরা শক্তি ব্যবহার করি। খাবার রান্না করতে কিংবা কম্পিউটার চালাতে শক্তির প্রয়োজন হয়। এখন আমরা শক্তির বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে জানবো।

যান্ত্রিক শক্তি: একটি ইট নিচ থেকে উপরে উঠিয়ে ছেড়ে দিলে বা গুলতি দিয়ে আম পাড়তে এক ধরনের শক্তি কাজ করে। আবার কেউ দৌড়াচ্ছে কিংবা একটি গাড়ি চলছে। এক্ষেত্রেও একটি শক্তি কাজ করছে। এই বিশেষ ধরনের শক্তিই হল যান্ত্রিক শক্তি। যান্ত্রিক শক্তি দুই প্রকার। যথা- গতি শক্তি ও স্থিতি শক্তি। গতির জন্য কাজ করার সামর্থ্য হল গতি শক্তি। যেমন- দৌড়ানো বা গাড়ি চলা। আবার কোন বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের জন্য সঞ্চিত শক্তি হল স্থিতি শক্তি। যেমন- ইট উপরে উঠানো বা গুলতি দিয়ে আম পাড়া।

রাসায়নিক শক্তি: খাদ্য বা জ্বালানিতে যে শক্তি জমা থাকে তাকে রাসায়নিক শক্তি বলে। খাদ্য থেকেই আমরা কাজ করার শক্তি পাই। পেট্রোল, গ্যাস, কাঠ, কয়লা সবকিছুতেই রয়েছে রাসায়নিক শক্তি। আমরা যে টর্চ বাতি বা রেডিওতে ব্যাটারি ব্যবহার করি তার মধ্যেও রয়েছে রাসায়নিক শক্তি।

তাপশক্তি: রান্না করতে, মোটর গাড়ি বা রেলগাড়ির ইঞ্জিন চালাতে যে শক্তি ব্যবহার করা হয় তাকে বলে তাপশক্তি। কয়লা, গ্যাস, কাঠ, পেট্রোল বা ডিজেল পুড়িয়ে এ শক্তি পাওয়া যায়। আবার সূর্য থেকেও সরাসরি তাপ আসে। এ তাপশক্তি পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে। তাপশক্তি ছাড়া কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ বেঁচে থাকে পারত না। সূর্য থেকে আসা তাপশক্তির কারণে বায়ুপ্রবাহ হয়। সূর্যের তাপশক্তি পানিকে বাষ্প হতে সাহায্য করে। ফলে মেঘ ও বৃষ্টি হয়।

আলোকশক্তি: তাপশক্তির সাথে সূর্য থেকে সরাসরি আর যে শক্তিটি আসে তা হচ্ছে আলোকশক্তি। আলোকশক্তি ছাড়া আমরা কিছুই দেখতে পারতাম না। সাধারণত কোনো উত্তপ্ত বস্তু আলো দেয়। আমরা জেনেছি যে, সূর্য একটি উত্তপ্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। তাই সূর্য থেকে আলো পাই। আমরা আগুন জ্বেলে আলো পাই। বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে বাস্তবের ভেতরে সরু তার উত্তপ্ত করে বৈদ্যুতিক আলো পাই।

শব্দশক্তি: আপনি কি জানেন যে, যখন কথা বলেন, গান গান বা বাঁশি বাজান তখন আপনি একধরনের শক্তি উৎপন্ন করছেন। যার নাম শব্দশক্তি। শব্দশক্তির সাহায্যেই আমরা একে অপরের কথা শুনতে পাই। টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশনে শব্দ শক্তি উৎপন্ন করে। পদার্থের কম্পন থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়।

বিদ্যুৎশক্তি: শক্তির কয়েকটি অতি পরিচিত এবং প্রয়োজনীয় রূপ হচ্ছে বিদ্যুৎশক্তি। বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে আমরা বাতি জ্বালাই, পাখা চালাই, কল-কারখানা চালাই। চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, সেচের জন্য মোটর, শহরে সরবরাহের পানি তোলার জন্য মোটর এসবকিছুই চলে বিদ্যুতের সাহায্যে। অনেক দেশে রেলগাড়িও বিদ্যুৎ দিয়ে চালানো হয়। আমাদের দেশে অটো ব্যাটারির রিকশা বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হয়। যে কোনো দেশে বিদ্যুৎ অত্যাবশ্যক। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় মূলত বিদেশ থেকে কেনা পেট্রোলিয়াম পুড়িয়ে। কিছু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে। আর সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় কাপ্তাইয়ের পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। বিদ্যুৎশক্তি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তারের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া যায়। আমাদের দেশে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে না। তাই সবসময় কোনো না কোনো স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে হয়। একে লোডশেডিং বলে। লোডশেডিংয়ের কারণে আমাদের অনেক ভোগান্তি হয়। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। সেচ কাজে বিভ্রাট ঘটে। কলকারখানার উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত বিদ্যুতের অপচয় রোধ করার।

চৌম্বক শক্তি: শক্তির আরেক রূপ হচ্ছে চৌম্বক শক্তি। এই শক্তি দিয়েই কোন চৌম্বক একটি লোহার বস্তুকে আকর্ষণ করে। চৌম্বক শক্তি ব্যবহার করে ভারী মালামাল তোলা হয়, রেফ্রিজারেটরের দরজা শক্তভাবে আটকিয়ে থাকে।

সৌরশক্তি: সূর্য থেকে তাপ বা আলোকরূপে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকেই সৌরশক্তি বলে। প্রকৃতপক্ষে, সূর্য আমাদের শক্তির একটি প্রধান উৎস। কাপড় শুকানো, ধানপাট শুকানোর কাজে আমরা প্রতিদিনই সৌরশক্তি ব্যবহার করছি। তাছাড়া জেনেছেন যে, অন্য সকল শক্তি প্রকৃতপক্ষে সৌরশক্তি থেকে এসেছে।

বায়ুশক্তি: বায়ুপ্রবাহের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে বায়ুশক্তি বলে। পালতোলা নৌকা বায়ুশক্তি দিয়ে চলে। বায়ুশক্তির ব্যবহার করে বায়ুকল বানানো যায়, যা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ফসল থেকে ময়লা দূর করা হয়।

পারমাণবিক শক্তি: আপনি জানেন যে, পদার্থ পরমাণু দিয়ে গঠিত। এ পরমাণুর অভ্যন্তর অত্যন্ত শক্তিশালী বল দিয়ে একত্রে বাঁধা রয়েছে। এ বাঁধন যদি কোনোভাবে ভাঙা যায় তবে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে শক্তি, যার নাম পারমাণবিক শক্তি। এ শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে আমাদের কাজে লাগানো যায়। আবার পারমাণবিক বোমা তৈরি করে ধ্বংসের কাজেও এ শক্তি ব্যবহার করা যায়।

শক্তির রূপান্তর

উপরে বিভিন্ন প্রকার শক্তির কথা বলা হয়েছে। এ সকল শক্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ যে কোনো একধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে পরিবর্তন সম্ভব। একে শক্তির রূপান্তর বলে। নিচে শক্তির রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো—

- ১। তাপ থেকে যান্ত্রিকশক্তি: তাপের সাহায্যে জলীয়বাষ্প উৎপন্ন করে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালনা করা হয়। এতে তাপশক্তি যান্ত্রিকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- ২। যান্ত্রিক শক্তি থেকে তাপশক্তি: হাত দিয়ে শরীরের অন্য কোন অংশ ঘষলে গরম অনুভূত হয়। এতে যান্ত্রিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- ৩। যান্ত্রিক শক্তি থেকে শব্দ শক্তি: বাঁশি বাজালে যান্ত্রিক শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- ৪। যান্ত্রিক শক্তি থেকে তাপ, শব্দ ও আলোক শক্তি: এক খন্ড পাথরের উপর একটি ধাতব দণ্ড দ্বারা জোরে আঘাত করলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হতে দেখা যায় এবং এক ধরনের শব্দের সৃষ্টি হয়। ধাতব দণ্ড ও পাথর খন্ডটি খানিকটা উত্তপ্ত হয়। এক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি তাপ, আলোক ও শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- ৫। বিদ্যুৎশক্তি থেকে তাপ ও আলোকশক্তি: বৈদ্যুতিক বালবের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহকালে ফিলামেন্ট উত্তপ্ত হয়। একসময় আলো দেখা যায়। এভাবে বিদ্যুৎশক্তি তাপে এবং তাপশক্তি আলোকশক্তিতে পরিণত হয়।
- ৬। আলো থেকে বিদ্যুৎশক্তি: ফটো ইলেকট্রিক কোষের ওপর আলো পড়লে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এখানে আলোকশক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- ৭। শব্দ থেকে যান্ত্রিক শক্তি: আলট্রাসোনিক শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা হয়। এটি শব্দ শক্তির যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের একটি ঘটনা।
- ৮। বিদ্যুৎ থেকে তাপ ও রাসায়নিক শক্তি: বৈদ্যুতিক ইন্সট্রি, হিটার ইত্যাদিতে বিদ্যুৎশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সম্বন্ধক বিদ্যুৎ কোষে বিদ্যুৎশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিরূপে মজুদ রাখা হয়।

- ৯। রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপ শক্তি: কয়লা পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এটা ঘটে। এক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- ১০। পারমাণবিক শক্তি থেকে যান্ত্রিকশক্তি: পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে ডুবোজাহাজ চালানো হয়। এটি পারমাণবিক শক্তির যান্ত্রিকশক্তিতে রূপান্তরের একটি ঘটনা।
- ১১। চৌম্বকশক্তি থেকে যান্ত্রিকশক্তি : বড় বড় বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে মালপত্র ওঠানো-নামানোর কাজ করা হয়। এক্ষেত্রে চৌম্বকশক্তি যান্ত্রিকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

শক্তির সংরক্ষণ

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা কাজে শক্তি ব্যবহার করি। তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের উপরই আমরা বেশি নির্ভরশীল। এসকল শক্তির উৎস ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হলে তা আর সহজে তৈরি হয় না। তাই আমাদের শক্তির যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। শক্তির অপচয় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। শক্তির যথাযথ ব্যবহার করে আমরা শক্তির অপচয় রোধ করতে পারি এবং পরিবেশ দূষণ কমাতে পারি। শক্তি সংরক্ষণের কিছু উপায় নিচে দেওয়া হল-

- ব্যবহারের পর বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি বন্ধ করে রাখা।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ধরে ফ্রিজের দরজা খোলা না রাখা।
- বাড়িতে ছায়ার ব্যবস্থা করার জন্য গাছ লাগান।
- বাতি না জ্বালিয়ে পর্দা সরিয়ে দিনের আলো ব্যবহার করা।
- গাড়ির বদলে যথাসম্ভব পায়ে হাঁটা বা সাইকেল ব্যবহার করা।

শক্তির নিত্যতা

এতক্ষণ আমরা জেনেছি যে শক্তি কীভাবে এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়। আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে যে, শক্তির এ রূপান্তরের সময় কি কোনো শক্তির অপচয় হয় না? বিস্ময়কর হলেও এটা সত্য যে শক্তির রূপান্তরের পূর্বে বা পরে মোট শক্তির পরিমাণ সমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমরা কোনো নতুন শক্তি সৃষ্টি করতে পারি না, এমনকি শক্তি ধ্বংস করতেও পারি না। অর্থাৎ বিশ্বের সামগ্রিক শক্তি ভাঙারের কোনো তারতম্য ঘটে না। এ বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে যে পরিমাণ শক্তি ছিল আজও সেই পরিমাণ শক্তি বর্তমান। এটাই হলো শক্তির নিত্যতা বা সংরক্ষণশীলতা।

শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শক্তি কেবল একরূপ থেকে অপর এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।

অধ্যায় ৫

প্রাকৃতিক সম্পদ

অনুসন্ধান ৫.১: আমাদের কী কী ধরনের সম্পদ রয়েছে?

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

চারপাশে তাকালে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই। এগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। মানবসৃষ্ট সকল বস্তুই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে করা হয়। আচ্ছা চলুন তো এবার আমরা আমাদের কিছু সম্পদ তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করি।

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আপনারা কীভাবে আপনার চারপাশের সম্পদগুলোকে চিহ্নিত করবেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

কী করতে হবে :

- ১। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দলে ভাগ হয়ে নিচে প্রদত্ত ছকের ন্যায় একটি ছক তৈরি করুন।

প্রাকৃতিক সম্পদ	মানবসৃষ্ট সম্পদ

- ২। চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে আপনি কী কী সম্পদ দেখতে পান তা আলোচনাপূর্বক উপরের ছকে লিপিবদ্ধ করুন।

- ৩। এবার অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।

ধারণা গঠন

সম্পদকে আপনি কীভাবে চিহ্নিত করতে পারেন? মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে আপনি কীভাবে আলাদা করতে পারেন তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করুন।

ধারণা প্রয়োগ

আপনার দলের তৈরিকৃত ছকের সাথে ৩টি করে নতুন মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক সম্পদের নাম যোগ করুন।

বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্তন

আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার অপরিহার্য। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে পানিসম্পদ, ভূমিসম্পদ, বনজসম্পদ, খনিজসম্পদ, বায়ুশক্তি ও সৌরশক্তি। এগুলোর মধ্যে খনিজসম্পদ নবায়নযোগ্য নয়, বাকিগুলো নবায়নযোগ্য।

প্রাকৃতিক সম্পদ কী কী?

আচ্ছা একটু চিন্তা করুন তো, লেখাপড়া করার জন্য বই দরকার। বইয়ের জন্য কাগজ দরকার। কাগজ তৈরি হয় কী থেকে? গাছ থেকে। গাছ কোথায় পাওয়া যায়? বনে, তাই না? আমরা কিছু গাছ লাগাই। তবে বেশিরভাগ গাছ বনে আপনা আপনি জন্মায়। এভাবে দেখা যাবে আমরা উদ্ভিদ থেকে যে খাদ্য পাই তার উৎস ক্ষেতের মাটি বা ভূমি। মাটিও প্রকৃতির তৈরি। জ্বালানির উৎসও প্রকৃতি। গাছ, মাটি, পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস এ সবই প্রকৃতিতে পাই। এভাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যা কিছু আমরা কাজে লাগাই তাদের আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ বলি।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কী কী?

প্রকৃতি থেকে আমরা নানা ধরনের জিনিস ব্যবহার করি। তাই প্রাকৃতিক সম্পদও বিভিন্ন ধরনের। বাংলাদেশে প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদগুলো হলো পানিসম্পদ, ভূমিসম্পদ, বনজসম্পদ, সৌরশক্তি, বায়ুসম্পদ ও খনিজসম্পদ।

পানিসম্পদ

পানি আমরা নানাভাবে ব্যবহার করি। এ পানি কি আমরা তৈরি করি? পানি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। তাই পানি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। আপনারা পানি অধ্যায়ে বাংলাদেশে পানির বিভিন্ন উৎস ও ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছেন। আমরা পানি পান করি। গোসল করতে ও বিভিন্ন গৃহস্থালী কাজে আমরা পানি ব্যবহার করি। কৃষিকাজেও পানি অপরিহার্য; বৃষ্টি না হলে ফসল ভালো হয় না। তখন সেচের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে পানি সরবরাহ করতে হয়। ছোট-বড় সব ধরনের শিল্প কারখানার প্রচুর পানি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৫.১: পানিসম্পদ

পানিতে মাছসহ বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ বেঁচে থাকে, যাদের উপর মানুষ বেশ নির্ভরশীল। এ ছাড়া পানিপ্রবাহ ব্যবহার করে জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। আমাদের দেশে কাগজ তৈরিতে এ ধরনের একটি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। একইভাবে নদী ও সমুদ্রের পানির উপর নির্ভর করে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করা হয়ে থাকে। ব্যাপক ব্যবহারের জন্য পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ।

ভূমিসম্পদ

মাটিতে আমরা ফসল ফলাই, গাছ লাগাই। ধান, গম, সবজি এ জাতীয় ফসল থেকে আমরা খাদ্য পাই। পাট, তুলা এ ধরনের ফসল থেকে আমরা সুতা, দড়ি, চট এসব তৈরি করি। মাটির তৈরি ঘর দেখেছেন নিশ্চয়ই? এঁটেল মাটি থেকে মাটির দেয়াল তৈরি করা যায়। বাংলাদেশে অনেক ঘরের মেঝেই মাটির তৈরি। মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরি করা হয়। তারপর ইট দিয়ে দালান, রাস্তা, দেয়াল এগুলো তৈরি হয়। আপনারা জানেন কী কী লাগে দালান তৈরি করতে? ইটের সাথে দরকার হয় বালি, সিমেন্ট এগুলো। বালি আসে মাটি বা ভূমি থেকে। তাই ভূমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ।



চিত্র ৫.২: ভূমিসম্পদ - জমিতে ফসলের চাষ হচ্ছে

খনিজসম্পদ

আরেক ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ হলো খনিজসম্পদ। সাধারণত মাটির নিচে এগুলো বেশি পাওয়া যায়। কখনো কখনো ভূ-পৃষ্ঠের ওপরের মাটির সাথেও মিশে থাকে। আমাদের দেশে মাটির নিচে বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানী হিসেবে বেশ ভালো। এগুলো পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় তাতে কলকারখানা চলে, যানবাহন চলে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং রান্না করা হয়। এগুলো থেকে বিভিন্ন প্রকার দরকারি দ্রব্যও তৈরি করা হয়। যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইউরিয়া সার তৈরি করা হয়। পেট্রোলিয়াম থেকে পলিথিন তৈরি করা হয়। প্রকৃতিতে দরকারি আরো খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। দালান তৈরিতে ব্যবহৃত রড, গাড়ি, বাস, লঞ্চ এগুলো তৈরি হয় লোহা থেকে।



চিত্র ৫.৩: খনিজসম্পদ - খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের পর সরানো হচ্ছে

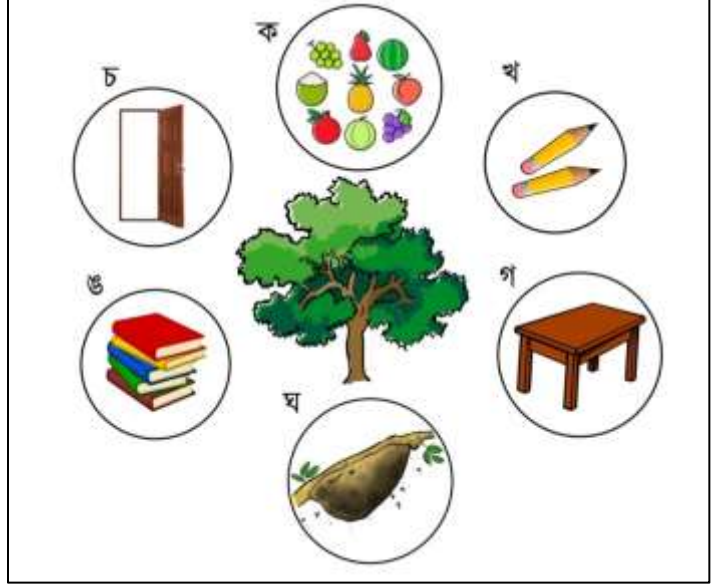
টিউবওয়েল, লাঙলের ফলা, পেরেক/তারকাটা, যন্ত্রপাতি এগুলোও তৈরি হয় লোহা থেকে। লোহা মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। হাঁড়ি-পাতিল, চামচ এগুলো তৈরি হয় লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম থেকে। লোহার মতো অ্যালুমিনিয়াম, কাঁসা, পিতল, তামা, রূপা, সোনা এসব দরকারি পদার্থও মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। এ সবকিছুই খনিজসম্পদ। বাংলাদেশের মাটিতে অবশ্য এসব খনিজসম্পদ ভালো পরিমাণে নেই। তবে বাংলাদেশে চূনাপাথর মোটামুটি পরিমাণে পাওয়া যায়। চূনাপাথর সিমেন্ট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

বনজসম্পদ

কাজ: বনজ সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা।

কী করতে হবে:

১. শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দলে ভাগ হয়ে পাশের চিত্রটি দেখুন।
২. দলে আলোচনাপূর্বক চিত্রটি থেকে বনজসম্পদের ব্যবহারগুলো বোঝার চেষ্টা করুন।
৩. এবারে দলগতভাবে বনজ সম্পদের গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করুন।
৪. অন্য দলগুলোর সাথে পর্যালোচনা করে বনজ সম্পদের গুরুত্ব শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করুন।



চিত্র ৫.৪: বনজ সম্পদ বৃক্ষ থেকে প্রাপ্ত ক) ফল, খ) পেন্সিল, গ) আসবাবপত্র, ঘ) মৌচাক, ঙ) কাগজের তৈরি বই, চ) কাঠের দরজা

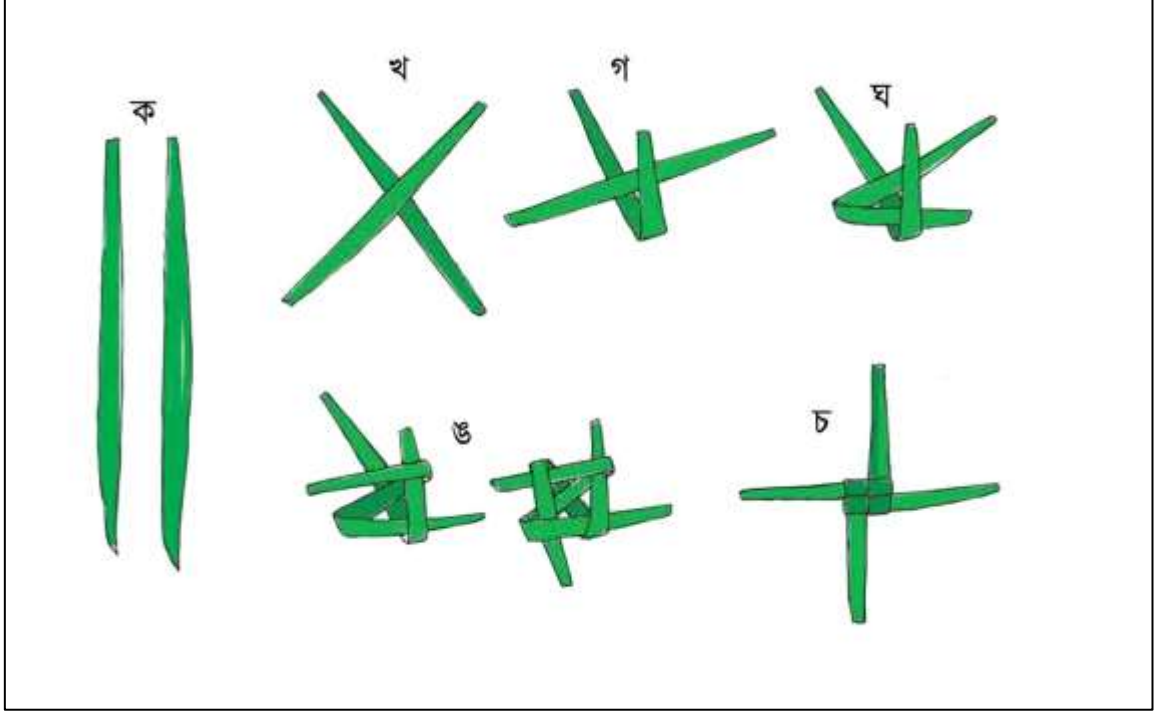
বনে গাছপালা আপনাআপনি জন্মায়।

বনের গাছ থেকে আমরা কী পাই? দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কাঠের প্রধান উৎস বনের গাছপালা। ফলমূল, বিভিন্ন খাদ্যবস্তু, নির্মাণ সামগ্রী, আসবাবপত্র এবং কাগজ তৈরিতে কাঠ বা গাছের ব্যবহার হয়। আমরা তাপ পেতে জ্বালানি হিসেবে গাছপালা ব্যবহার করি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনজ সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম।

বায়ুসম্পদ

কাজ

চিত্র অনুযায়ী একটি চরকা তৈরি করুন। বায়ুর শক্তি ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের খেলনারও বহুল প্রচলন রয়েছে। সেটি খুব সাধারণ উপকরণে তৈরি করা সম্ভব। এটি তৈরির পদ্ধতিটি নিম্নরূপ—



চিত্র ৫.৫: খেজুর পাতার সাহায্যে চরকা তৈরি- (ক) একটি খেজুর পাতা/নারকেল পাতা লম্বালম্বি দু'ভাগ করা। (খ) দুই ভাঁজ করা (গ) একটি ভাঁজ করা পাতার মধ্যে আরেকটি ভাঁজ করা পাতা ঢোকানো। (ঘ) বড় অংশটি ঘুরিয়ে এনে লুপে ঢোকানো। (ঙ) বাকি পাতাটির বড় অংশটি ঘুরিয়ে এনে লুপে ঢোকানো। (চ) খেজুর কাঁটা বা পিনের আগায় চরকাটি স্থাপন।

চরকাটি এবার যেদিক থেকে বাতাস আসছে তার দিকে ধরুন। বায়ু প্রবাহিত না হলে এটিকে সামনে ধরে দৌড় দিন। দেখবেন চরকাটি ঘুরছে। ছোটবেলায় নিশ্চয়ই এভাবে চরকা ঘুরিয়েছেন। এভাবে বায়ুপ্রবাহকে ব্যবহার করে বড় চরকা বা টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। বায়ুপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে গ্রামে ফসল ঝেড়ে ময়লা দূর করা হয়। এভাবে প্রকৃতির বায়ুপ্রবাহকে আমরা কাজে লাগাই। তাই বায়ুপ্রবাহ প্রাকৃতিক সম্পদ।



চিত্র ৫.৬: বায়ুচালিত টারবাইন

সৌর শক্তি

সৌরশক্তি আরেকটি প্রাকৃতিক সম্পদ। সূর্য থেকে পাওয়া রোদকে ব্যবহার করে আমরা ভেজা কাপড় শুকাই। রোদে আমরা ধানসহ অন্যান্য ফসল শুকিয়ে সংরক্ষণ করি। সূর্যের আলোকে সৌর প্যানেলের সাহায্যে সংগ্রহ করে আমরা তাপ পেতে পারি। সূর্যের আলো সংগ্রহ/আহরণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। আমাদের দেশে এখন এ পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং অনেক গৃহে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করা



চিত্র ৫.৭: সৌর প্যানেল

হচ্ছে। আপনারা দেখেছেন ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করা যায়। কিছু ক্যালকুলেটর সূর্যের আলোর সাহায্যে চলে। এটি কীভাবে চলে? সূর্যের আলো থেকে এটি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। সেই বিদ্যুৎ দিয়ে ক্যালকুলেটর চলে। সৌরশক্তি নবায়নযোগ্য বা এর সরবরাহ অসীম, কখনো ফুরাবে না।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

এতক্ষণ আপনারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে জানলেন। প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মধ্যে সবগুলোর সরবরাহ কি অসীম? এগুলো কি নবায়নযোগ্য বা কখনো ফুরাবে না? না এদের সরবরাহ সীমিত, একসময়ে ফুরিয়ে যাবে কি?

কাজ: বনজ সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা।

কী করতে হবে :

১. শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দল গঠন করে প্রত্যেক দলে নিচের ছকের ন্যায় একটি করে ছক তৈরি করুন।

নবায়নযোগ্য বা সরবরাহ অসীম, কখনো ফুরাবে না	অনবায়নযোগ্য বা সরবরাহ সীমিত, যা একসময়ে ফুরিয়ে যাবে

২. উপরে আলোচিত প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে আলোচনাপূর্বক ছকের ন্যায় দুটি ভাগে ভাগ করুন।
৩. এবার অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।

উপরের ছকটি পূরণ হলে আমরা দেখব যে, খনিজ সম্পদ নবায়নযোগ্য নয়। এগুলোর পরিমাণ সীমিত। এগুলো ব্যবহার করতে থাকলে একসময় ফুরিয়ে যাবে। যেমন, আমাদের দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। কিন্তু এ গ্যাস যদি বেহিসেবী পুড়িয়ে ফেলি তাহলে বিশ বা ত্রিশ বছর পরে এ গ্যাস শেষ হয়ে যাবে। তখন এ গ্যাস থেকে ইউরিয়া সার তৈরি করতে পারব না। এ গ্যাস থেকে দরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবো না। তাই বিনা কারণে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখা উচিত নয়।

পানি ও মাটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। তবে ব্যবহার উপযোগী পানি ও চাষযোগ্য ভূমি সীমিত। তাই পানিও বেহিসেবী খরচ করা ঠিক নয়। আবার পানিকে দূষিত করা ঠিক নয়। পানি দূষিত হয়ে গেলেও তা আমরা কাজে লাগাতে পারব না। আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন যে, মাটিকেও ঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। মাটিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফসল বুনলে মাটিতে উর্বরতা ফিরে আসে। বনজসম্পদও নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। তবে বাংলাদেশে মানুষ বেড়ে যাওয়ায় আমরা বন উজাড় করে ফেলছি। বেশি মানুষের জন্য বেশি ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরিতে বেশি গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে কিন্তু নতুন করে গাছ লাগানো হচ্ছে না। আবার বেশি মানুষের জন্য বেশি খাদ্য উৎপাদনের জন্য বন কেটে ফসল বোনা হচ্ছে। তাই এখন আমাদের বিদেশ থেকে কাঠ কিনতে হয়। আপনারা আরো জানেন যে, বন কমে গেলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাস্তার পাশে এবং পতিত জমিতে গাছ লাগানো হচ্ছে। পতিত জমিতে গাছ লাগালে একদিকে যেমন পরিবেশ ভালো থাকে, অন্যদিকে গাছ বড় হলে তা বিক্রি করে অনেক অর্থ উপার্জন করা যায়।

বায়ুসম্পদ ও সৌরশক্তি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এ দু'টি সম্পদ যত ইচ্ছা তত ব্যবহার করতে পারি। এ দু'টি সম্পদ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। তাহলে অনবায়নযোগ্য জ্বালানির কম ব্যবহার করা হবে। এতে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম সংরক্ষণ হবে।

অনুসন্ধান ৫.২: প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে গৃহীতব্য পদক্ষেপ।

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সচেতন হওয়া জরুরী। আচ্ছা চলুন তো এবার আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের কিছু উপায় তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করি।

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আপনারা কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করার উপায়সমূহের একটি তালিকা তৈরি করতে পারেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

কী করতে হবে:

১. শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দলে ভাগ হয়ে প্রতিটি দলে নিচে প্রদত্ত ছকের ন্যায় একটি করে ছক তৈরি করুন।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপায়

২. দলের সদস্যদের সাথে আলোচনাপূর্বক উপরের ছকে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপায়সমূহ লিপিবদ্ধ করুন।
৩. এবার অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।

ধারণা গঠন

প্রাকৃতিক সম্পদ কেন সংরক্ষণ করা দরকার বলে আপনি মনে করেন? আপনি কীভাবে তা করতে পারেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

ধারণা প্রয়োগ

আপনার দলের তৈরিকৃত ছকের সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ৩টি নতুন উপায় যোগ করুন। এক্ষেত্রে আপনার পরিবারের সদস্যদের আপনি কীভাবে সচেতন করতে পারেন?

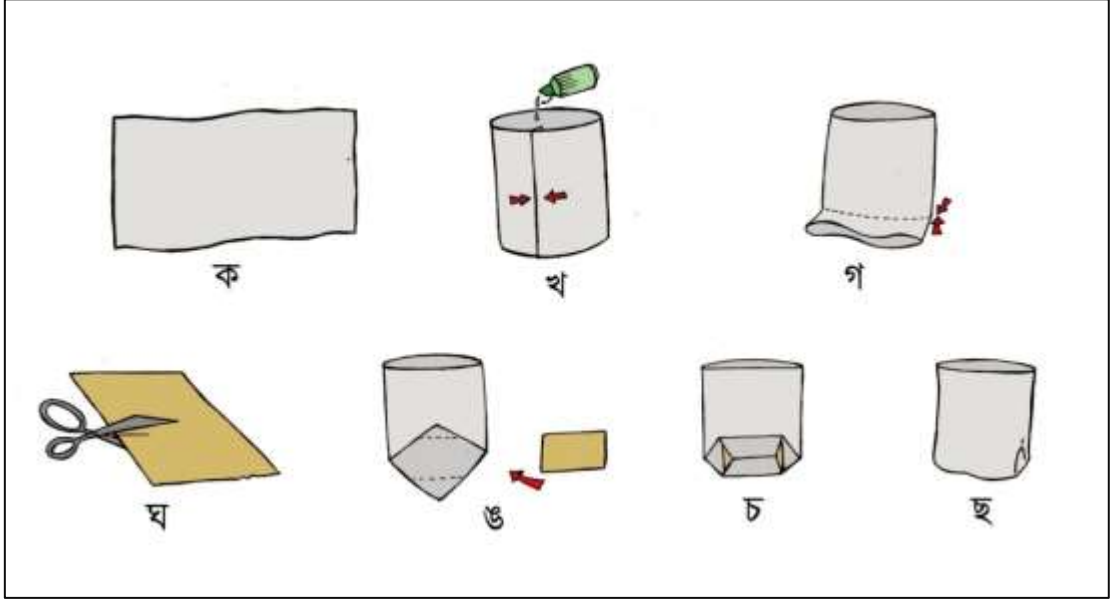
বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্ধন

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সাধারণ কিছু কৌশল আছে। তিনটি কৌশলের কথা বলা যায়, তা হলো ব্যবহার কমানো (Reduce) বা মিতব্যয়ী ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার (Reuse) এবং পুনরুৎপাদন (Recycle)। এগুলোর আদ্যক্ষর নিয়ে ইংরেজিতে একসাথে বলা হয় ৩R। নিচে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

কম ব্যবহার: প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রথম উপায় হচ্ছে তা কম ব্যবহার করা। যেমন, জ্বালানি কম ব্যবহার করা। এসি ব্যবহার না করে, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক বাত্ব ব্যবহার করে ও প্রয়োজন শেষে সাথে সাথে বৈদ্যুতিক পাখা, বাত্ব এগুলো বন্ধ করে বিদ্যুতের ব্যবহার কমাতে পারি। বিদ্যুতের ব্যবহার কমলে কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কমবে। কেবল রান্নার প্রয়োজনেই গ্যাসের চুলা ব্যবহার করা উচিত। ব্যবহারের সাথে সাথে চুলাটি বন্ধ করা উচিত। কোনোভাবেই জামা-কাপড় শুকানোর কাজে গ্যাসের চুলা ব্যবহার করা ঠিক নয়। বেশি বেশি গ্যাস ব্যবহার করে ফেললে একসময় আমরা গুরুত্বপূর্ণ কাজে গ্যাস পাব না।

সম্পদের পুনর্ব্যবহার: নিচের বর্ণনামতো কাজটি করুন। যা যা লাগবে: দুই টুকরা কাগজ, আঠা।

পদ্ধতি: পুরনো খাতার একটি পাতা নিন। পুরনো খাতার শক্ত মলাট চিত্রের মতো করে কাটুন। এবার নিচের চিত্র মতো কাজটি করুন।



চিত্র ৫.৮: পুরনো বা ব্যবহৃত কাগজের সাহায্যে ঠোঙা তৈরির পদ্ধতি

তৈরি হলো কাগজের ঠোঙা। এরকম কাগজের ঠোঙায় দোকানিরা লবণ, চিনি, চাল, ডাল বিক্রি করে। এভাবে পুরনো কাগজ নতুন কাজে ব্যবহার করা হয়। আমরা অনেক সময় জিনিস পুরনো হলে ফেলে দিই। পুরনো জিনিস ফেলে না দিয়ে অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া ভালো। আবার পুরনো জিনিস অন্য কাজেও ব্যবহার করা যায়। যেমন টিনের কৌটায় বাজার থেকে গুঁড়ো দুধ কিনে আনা হয়। দুধ খাওয়া শেষ হলে কৌটাটিকে ফেলে না দিয়ে চাল, ডাল, মুড়ি বা মসলা রাখা যায়। কাঠের তৈরি কোনো চেয়ার পুরনো হয়ে গেলে ফেলে না দিয়ে অন্য কাউকে দেয়া ভালো। এতে গাছ কাটা কমে।

পুনরুৎপাদন: ফেরিওয়ালারা টিনের কৌটা, অ্যালুমিনিয়ামের ভাঙা হাঁড়ি-পাতিল, পুরনো লোহা ও কাচের জিনিস কিনে নেয়। এগুলো দিয়ে কী করা হয় বলতে পারেন? পুরনো কাচ গলিয়ে নতুন কাঁচের সাথে মিশিয়ে কাঁচের জিনিস তৈরি করা হয়। একইভাবে পুরনো লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, টিন এগুলো গলিয়ে নতুন জিনিস তৈরি করা যায়। এতে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম বা টিনের আকরিক খনি থেকে কম তোলা হবে। খনিজ সম্পদ সংরক্ষিত থাকবে ভবিষ্যতের জন্য।

অনুসন্ধান ৫.৩: প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব।

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

মানুষের সাথে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজন। পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু পৃথিবীর সম্পদ সীমিত। এই অবস্থা চলতে থাকলে প্রাকৃতিক সম্পদের কি হবে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আপনারা কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের সম্পর্ক তালিকাভুক্ত করতে পারেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও স্বপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে।)

কী করতে হবে:

১. শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দলে ভাগ হয়ে প্রতিটি দলে নিচে প্রদত্ত ছকের ন্যায় একটি করে ছক তৈরি করুন।

বাড়তি জনসংখ্যার জন্য কী কী প্রয়োজন হবে?	এজন্য কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ লাগবে?
বাড়ি তৈরি	মাটি, কাঠ, পাথর

২. প্রদত্ত উদাহরণকে ভিত্তি করে দলগতভাবে আলোচনাপূর্বক উপরের ছকটি পূরণ করুন।
৩. এবার অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।
৪. এবারে নিচে প্রদত্ত ছকের ন্যায় আরেকটি ছক তৈরি করুন।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের উপর জনসংখ্যার প্রভাব	
প্রভাব	কারণ

৫. দলগতভাবে আলোচনাপূর্বক উপরের ছকটি পূরণ করুন।
৬. এবার অন্য দলগুলোর সাথে মিলিয়ে আপনার দলের পূরণ করা ছকটি পর্যালোচনা করুন।

ধারণা গঠন

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমাদের বাড়তি কী কী সম্পদ প্রয়োজন হতে পারে? এক্ষেত্রে বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে প্রাকৃতিক সম্পদেও উপর কেমন প্রভাব পরতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ধারণা প্রয়োগ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ক্ষতিকর প্রভাবগুলো যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।

ধারণা পরিবর্তন

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের উপর জনসংখ্যার প্রভাব

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বাড়তি শস্য উৎপাদন এবং পশুপালনের জন্য মানুষ বন উজাড় করেছে। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট এবং কলকারখানা তৈরিতেও জমি ব্যবহার করেছে। বনভূমি ধ্বংসের ফলে বাস্তুসংস্থান পরিবর্তন হচ্ছে। জীবের আবাসস্থল ধ্বংস হয় এমনকি জীব ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। এছাড়া বনভূমি ধ্বংসের ফলে ভূমিক্ষয় এবং ভূমিধ্বস হয়।



চিত্র ৫.৯: অধিক জনসংখ্যার জন্য তৈরিকৃত দালানকোঠা

কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভিদের ভাল বৃদ্ধি এবং অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে মাটি ও পানি উভয়ই দূষণের শিকার হচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কলকারখানায় পন্য তৈরি হয়। মানুষ যাতায়াতের জন্য যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে। কলকারখানা এবং যানবাহন থেকে নির্গত ক্ষতিকর গ্যাস বায়ু দূষিত করেছে। এর ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এসিড বৃষ্টি হচ্ছে।



চিত্র ৫.১০: অধিক জনসংখ্যার জন্য অধিকসংখ্যক যানবাহন

জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করতে বিজ্ঞান শিক্ষার ভূমিকা

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিজ্ঞান শিক্ষা আমাদের আচরণ পরিবর্তনে এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ের শিক্ষা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

অধ্যায় ৬

আমাদের মহাবিশ্ব, আবহাওয়া এবং জলবায়ু

চাঁদ কোথায় দেখা যায় ? চাঁদের আলো থেকে তাপ পাইনা কেন? ‘আকাশ’ (sky) কী? দিন ও রাত কীভাবে হয়? আমরা কোথায় বাস করি? দিনের বেলায় আকাশের দিকে তাকালে কী দেখতে পাই? রাতের বেলায় কী দেখি? চাঁদ, সূর্য এগুলো আমাদের থেকে কতদূরে? যুগ-যুগ ধরে এরূপ বহু প্রশ্ন মানুষের মনে উদ্ভূত হয়েছে এবং হচ্ছে। ‘মহাবিশ্ব’ ও তার গঠন-বৈশিষ্ট্য জানলেই আমরা এরূপ অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারি।

অনুসন্ধান ৬.১: মহাবিশ্বের বিস্তৃতি

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

আমরা কোন্ নক্ষত্র থেকে আলো ও তাপ পাই ? কেন অন্যান্য নক্ষত্র থেকে আলো ও তাপ পাই না? পৃথিবী থেকে সূর্য ও চাঁদের দূরত্ব কত? মিল্কিওয়ে নামক গ্যালাক্সির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দূরত্ব কত? মহাবিশ্ব আসলে কত বড়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আমরা জানি, আলো সেকেন্ডে কয়েক লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। আবার, সূর্য, চাঁদ দুটোই পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরে। চাঁদ ও সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে, তা কীভাবে বের করতে পারি ? চিন্তা করুন, সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন। পৃথিবী থেকে চাঁদ ও সূর্যের দূরত্ব জেনে আলোর বেগের সাহায্যে সময় বের করতে পারি।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

১. নিচের ছকটি খাতায় তুলুন।

জ্যোতিষ্কের নাম	পৃথিবী থেকে দূরত্ব	আলো পৌঁছাতে যত সময় লাগে
চাঁদ	৩,৮৪,৪০০ কি.মি	
সূর্য	১৫,০০,০০,০০০ কি.মি	

২. আলো শূন্য মাধ্যমে ১ সেকেন্ডে ৩০০০০০ কিলোমিটার বেগে চলে। তাহলে, চাঁদ ও সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগবে?
৩. হিসাবটি সম্পূর্ণ করুন। উত্তরগুলো ছকে লিখুন।
৪. নির্ণীত সময়ের সাথে পৃথিবী থেকে চাঁদ ও সূর্যের দূরত্বের সম্পর্ক অনুধাবনের চেষ্টা করুন, সহপাঠীর সাথে ধারণা বিনিময় করুন।

ধারণা গঠন

পৃথিবী থেকে ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরের সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে কত সময় লাগে? মিল্কিওয়ে নামক গ্যালাক্সির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো পৌঁছাতে যদি ১,৩০,০০০ বছর সময়

লাগে; তাহলে, ঐ গ্যালাক্সিটির আকৃতি কত বড়? কয়েকশ বিলিয়নের বেশি গ্যালাক্সির নিয়ে গঠিত মহাকাশই বা কত বড়?

ধারণা প্রয়োগ

আমরা জানলাম, মহাবিশ্বের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের মধ্যে আলো পৌঁছতে কয়েক মিনিট বা সেকেন্ড থেকে কয়েক লক্ষ বছরও লেগে যেতে পারে। তাহলে, মহাবিশ্বের বিন্যাসের একটি ধারাক্রম, ‘মহাবিশ্ব-মিঙ্কিওয়ে-সৌরজগৎ-পৃথিবী’ ব্যাখ্যা করুন।

ধারণা পরিবর্তন

আমাদের এ পৃথিবী এবং এর বাইরে সকল পদার্থ, শক্তি, মহাশূন্য, সকল গ্রহ, নক্ষত্র-সব কিছু নিয়ে মহাবিশ্ব গঠিত।। আমাদের পৃথিবী অসীম মহাবিশ্বের অতিক্ষুদ্র একটি অংশ। আমরা খালি চোখে দিনের বেলায় দেখি সূর্য জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। মেঘ না থাকলে বিশাল নীল আকাশ দেখতে পাই। মূলত: এই আকাশ হলো আমাদের বাসগ্রহ-পৃথিবীকে চারদিক থেকে ঢেকে রাখা বায়ুর আবরণ। দিনের বেলায় সূর্যের আলো এই বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করার সময় বায়ুর আবরণটি নীল রঙ ধারণ করে, যাকে আমরা পৃথিবী নামক গ্রহের ‘আকাশ’ (sky) বলি। আর রাতে নীলাকাশকে না দেখে স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে অসীম মহাশূন্যের নিকষ অন্ধকার অংশ বিশেষকে দেখি, তার সাথে দেখতে পাই অসংখ্য আলোকবিন্দু মিটমিট করে জ্বলছে। মিটমিট জ্বলা আলোকবিন্দুগুলোর সাধারণ নাম জ্যোতিষ্ক। সূর্য এবং চাঁদ দুটোই জ্যোতিষ্ক। খালিচোখে এ রকম প্রায় ৬০০০ জ্যোতিষ্ক দেখা যায় (Callister, ২০০৬)। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আরো হাজার হাজার এরকম জ্যোতিষ্ক দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের পৃথিবীটি মহাকাশে এমনই একটি জ্যোতিষ্ক। সাম্প্রতিক সময়ে হাবল টেলিস্কোপের মতো শক্তিশালী যন্ত্র তৈরি হওয়ার ফলে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের মৌলিক গঠন জানতে পেরেছেন। মহাবিশ্বের মৌলিক গাঠনিক ইউনিটকে চিহ্নিত করা হয় গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ হিসেবে।

ছায়াপথসমূহ

বিশাল মহাবিশ্ব কয়েকশ বিলিয়নের বেশি গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত। অন্য কথায় বলা যায় যে, মহাবিশ্বকে অসংখ্য অংশে ভাগ করলে এক একটি ভাগকে গ্যালাক্সি বলা যায়। একটি গ্যালাক্সিতে কোটি কোটি নক্ষত্র, গ্রহ, গ্যাস, ধূলিকণা ইত্যাদি মহাকর্ষ বলের সাহায্যে একে অন্যের কাছাকাছি থাকে। ছায়াপথগুলো বিভিন্ন আকার ও আকৃতির হয়ে থাকে। সূর্য ও পৃথিবী মিঙ্কিওয়ে (Milkyway) নামক স্পাইরাল (কুণ্ডলাকৃতির) আকৃতির একটি ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত।

নক্ষত্র (Star)

মহাবিশ্বে একেকটি ছায়াপথের মধ্যে কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে। আমাদের মিঙ্কিওয়ে ছায়াপথে ২০০ বিলিয়নের বেশি নক্ষত্র রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সূর্য। সূর্যের মতো সকল নক্ষত্রেরই নিজস্ব আলো আছে। নক্ষত্রগুলো আসলে গ্যাসের পিণ্ড। একটি নক্ষত্রে হাইড্রোজেনসহ অন্যান্য গ্যাস মহাকর্ষ বলের প্রভাবে একত্র হয়ে একটি পিণ্ডের মতো আকার ধারণ করে। এ গ্যাসসমূহ নিউক্লিয়ার ফিউশন বা সংশ্লেষ বিক্রিয়ার (nuclear fusion reaction) মাধ্যমে প্রচুর তাপ ও আলোকশক্তি উৎপন্ন করে। উৎপন্ন তাপ ও আলোকশক্তি মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা নিকটবর্তী গ্রহ বা উপগ্রহে গিয়ে পৌঁছায়। যেমন, সূর্যে দুইটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংযুক্ত হয়ে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠিত হয় এবং প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়।

সূর্য পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র বলে আমরা সূর্যের তাপ ও আলো পাই। অন্যান্য নক্ষত্র অনেক দূরে বলে তাদেরকে মিটমিট করে জ্বলতে দেখা যায়, তবে তাদের উৎপন্ন তাপ আমরা অনুভব করতে পারি না। সূর্য একটি মাঝারি আকারের নক্ষত্র। পৃথিবীর থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার। সূর্য পরিমাণে এত তাপ ও আলো করে যে, এত দূর থেকেও কিছু পরিমাণে তাপ ও আলো আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। পৃথিবী থেকে আরেকটি নক্ষত্র আমরা খালিচোখে ভালোভাবে দেখতে পাই। সন্ধ্যায় উত্তর আকাশে একটি তারা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে দেখা যায়, যাকে আমরা ধ্রুবতারা বলি। এটি পৃথিবী থেকে ৮২ কোটি কিলোমিটারের বেশি দূরে অবস্থিত বলে এর তাপ আমরা অনুভব করতে পারি না।



চিত্র ৬.১: আমাদের ছায়াপথ মিল্কওয়ে

সূর্য ও সৌরজগত

অনেক নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে গ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে। সূর্য একটি নক্ষত্র এবং একে কেন্দ্র করে পৃথিবীসহ আটটি গ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক ঘুরছে। সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান সকল জ্যোতিষ্ক (গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদি) ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগৎ গঠিত। সৌরজগতের বেশিরভাগ জায়গাই ফাঁকা বা শূন্য।

সূর্য : আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১০০ গুণ অর্থাৎ আয়তন হিসেবে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে ১০০০০০০ গুণ বড়। তাই মহাকর্ষবলের প্রভাবে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে। সৌরজগতের সব গ্রহই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। সার্কাসে একটা খেলা অনেকেই দেখেছেন। সেটা হলো, একটা গোলপাতের মধ্যে চালক মোটরসাইকেল নিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, কিন্তু চালক বা সাইকেল পড়ে যায় না। তবে ঘুরতে থাকা

অবস্থায় যদি চালক গতি কমিয়ে দেয় বা ব্রেক কষে, তাহলে সাইকেলটি নিচে পড়ে যাবে। এভাবে গ্রহসমূহ ঘুরতে থাকার ফলে তাদের মধ্যে কেন্দ্রবিমুখী বল তৈরি হয়, যা কোন গ্রহের প্রতি সূর্যের/নক্ষত্রের আকর্ষণের বিপরীতে কাজ করে। ফলে ঘুরতে থাকা গ্রহটি তার আপন কক্ষপথে নিজ গতিতে ঘুরতে থাকে। একই কারণে অন্যান্য গ্রহ ও জ্যোতিষ্ক সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সূর্য একটি মাঝারি আকারের নক্ষত্র এবং এটি অন্যান্য নক্ষত্রের মতো জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড। এ জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডে রয়েছে মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস (যেগুলো মূলত: নিউক্লিয়াস হিসেবে থাকে)। হাইড্রোজেন গ্যাস পরমাণু পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়। এ শক্তি তাপ ও আলোকশক্তি হিসেবে সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই সূর্যের কাছ থেকে আমরা তাপ ও আলো পেয়ে থাকি।

গ্রহ: সূর্যকে কেন্দ্র করে স্বাধীনভাবে ঘুরছে আটটি গ্রহ, পৃথিবী এমন একটি গ্রহ। গ্রহসমূহ সাধারণত গোলকাকৃতির। কারণ কোন নির্দিষ্ট গ্রহ বা নক্ষত্রের কেন্দ্র তার নিজের উপাদানগুলোকে যতটা সম্ভব কাজে রাখতে চায়। এর ফলে উপাদানগুলোর উপর কেন্দ্রের আকর্ষণ বেশি হয় এবং ঘুরতে থাকার ফলে উপাদানগুলো মূলবিন্দু থেকে ছিটকে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমে যায়। বিভিন্ন আকৃতির মধ্যে গোলাকার বস্তুর ক্ষেত্রেই বস্তুর উপাদানগুলো বস্তুর কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে থাকতে পারে। এই কারণেই মহাবিশ্বে ঘুরতে থাকা সব গ্রহ-নক্ষত্রের আকার গোল। যদিও গ্রহগুলোতে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে, তবুও এরা শক্তি উৎপাদন করে না। তাই কোনো গ্রহ নিজে আলো বা তাপ নির্গত করে না। পৃথিবী থেকে সূর্যের অন্যান্য গ্রহকে উজ্জ্বল দেখালেও এগুলো মূলত সূর্যেও আলোতে আলোকিত। পৃথিবী থেকে সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যাতারা রূপে এবং ভোরবেলায় শুকতারা রূপে যে তারাটি দেখা যায় সেটি কোনো নক্ষত্র নয়, এটি আসলে সূর্যের একটি গ্রহ যার নাম শুক্র। গ্রহগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যের গ্রহগুলো হলো বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। আগে প্লুটো নামক একটি জ্যোতিষ্ককে গ্রহ বলা হলেও ২০০৯ সালে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নেন যে, এটি একটি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক; এটি আসলে গ্রহ নয়। নিচে সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান গ্রহগুলোর কক্ষপথ দেখানো হলো।



চিত্র ৬.২: সৌরজগতের গঠন

উপগ্রহ: সৌরজগতের গ্রহগুলো যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে তেমনি গ্রহগুলোকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ছোট ছোট উপগ্রহ। কোনো গ্রহের তুলনায় তার উপগ্রহ আকারে ও ভরে বেশ ছোট, তাই উপগ্রহ গ্রহের টানে তাকে কেন্দ্র করে ঘোরে। পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ। এটি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। উপগ্রহগুলো নিজেরা তাপ বা আলো উৎপন্ন করতে পারে না; এরাও সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত হয়। সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পড়ে প্রতিফলিত হয় বলে আমরা চাঁদকে আলোকিত দেখি। চাঁদ ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ হলেও পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে ২৫০০-এর বেশি মানুষ-প্রেরিত উপগ্রহ। এদেরকে কৃত্রিম উপগ্রহ বলা হয়। এ কৃত্রিম উপগ্রহগুলো, বেতার ও টেলিযোগাযোগ, আবহাওয়া এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীর মতো অন্যান্য গ্রহেরও প্রাকৃতিক উপগ্রহ রয়েছে। মঙ্গলের ২টি, বৃহস্পতির ১৬টি, শনির ১৭টি, ইউরেনাসের ৪টি এবং নেপচুনের ১টি উপগ্রহ রয়েছে।

সৌরজগতে অন্যান্য জ্যোতিষ্ক: আমাদের সৌরজগতে সূর্য, গ্রহ ও উপগ্রহ ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য জ্যোতিষ্ক। এরা হলো ধূমকেতু, উল্কা ও গ্রহাণু। সূর্যকে কেন্দ্র করে এরা স্বাধীনভাবে ঘুরছে। গ্রহের চেয়ে আকারে বেশ ছোট কঠিন শিলাময় বা ধাতব বস্তু-যাদের নাম গ্রহাণু। এদেরকে কখনো কখনো ক্ষুদ্র গ্রহও বলা হয়। ধূমকেতুসমূহও আমাদেরও সৌরজগতের অংশ। এরা এমন ধরনের কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরি যারা তাপ পেলে সহজেই গ্যাসে পরিণত হতে পারে। যখন ধূমকেতুসমূহ সূর্যের কাছাকাছি যায় তখন সূর্যের তাপে গ্যাসীয় ও কঠিন পদার্থ নির্গত হয়ে আকাশে ছড়িয়ে যায়, যেটি ঝাঁটার মতো দর্শনীয় লেজে পরিণত হয়। পৃথিবী থেকে এদেরকে কখনো কখনো দেখা যায়। কোনো কোনো ধূমকেতু অনেক বছর পর পর পৃথিবীর আকাশে দৃশ্যমান হয়। যেমন, হ্যালির ধূমকেতু গড়ে ৭৬ বছর পরপর পৃথিবী থেকে দেখা যায়। এটি ১৯১১ সালে এবং ১৯৮৬ সালে দেখা গেছে। এটি আবার ২০৬২ সালে দেখা যাওয়ার কথা। সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলো উল্কাপিণ্ড, এ ক্ষুদ্র কঠিন পিণ্ড যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌঁছায় তখন বায়ুর সংস্পর্শে এসে পুড়ে যায়। এ জন্য রাতের বেলায় কখনো কখনো আকাশে অগিড়বগোলক ছুটে যেতে বা পড়ে যেতে দেখা যায়। কখনো কখনো বড় উল্কাপিণ্ড আধপোড়া অবস্থায় পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে বড় গর্তের সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় ১২৬৫ মিটার ব্যাসের এবং ১৭৫ মিটার গভীরতার একটি গর্ত দেখা যায়; ধারণা করা হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০০ সালে একটি উল্কাপিণ্ড পড়ে এ গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর উৎপত্তি

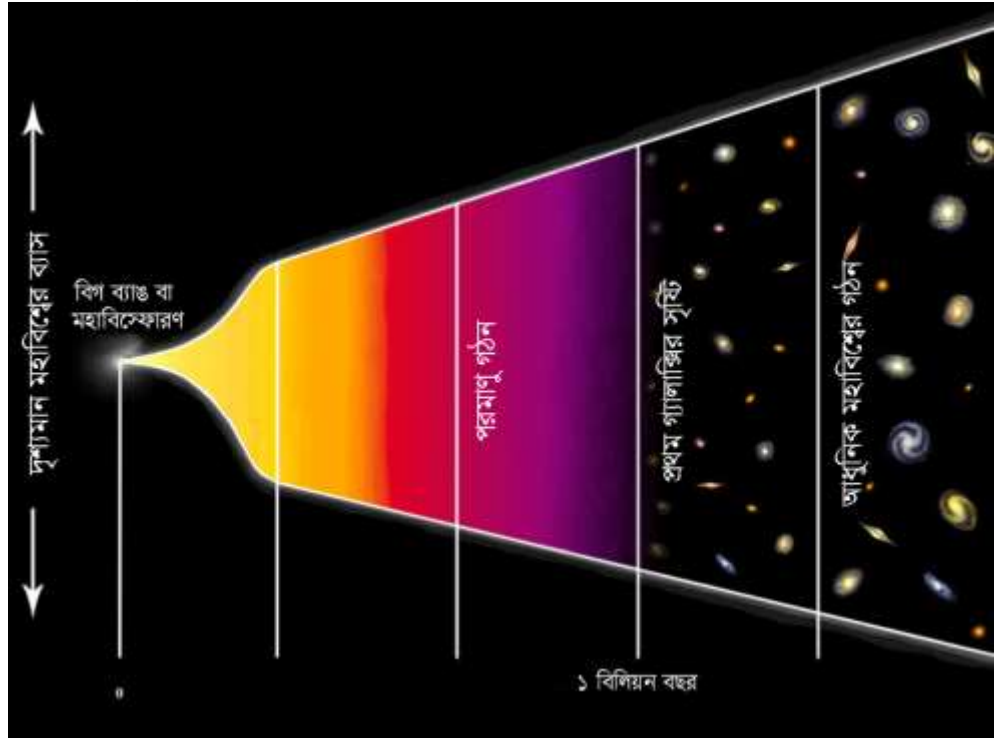
আপনাদের মনে কখনো প্রশ্ন জেগেছে. এ পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হলো? সূর্য, তারা, চাঁদ এরাই বা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে? পৃথিবীতে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। যেমন প্রাচীন চীনের রূপকথায় বলা হয় যে, একটি কসমিক ডিম থেকে প্রথমে একটি দৈত্য জন্ম নেয়। সেই দৈত্যেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে আমরা এ মহাবিশ্বে যা দেখি



চিত্র ৬.৩: মহাবিশ্বোৎসর্গ ও মহাবিশ্বের বিস্তৃতি

তার জন্ম। আবার কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তা ছয় দিনে এ মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। তবে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যপ্রমাণ ব্যবহার করে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন।

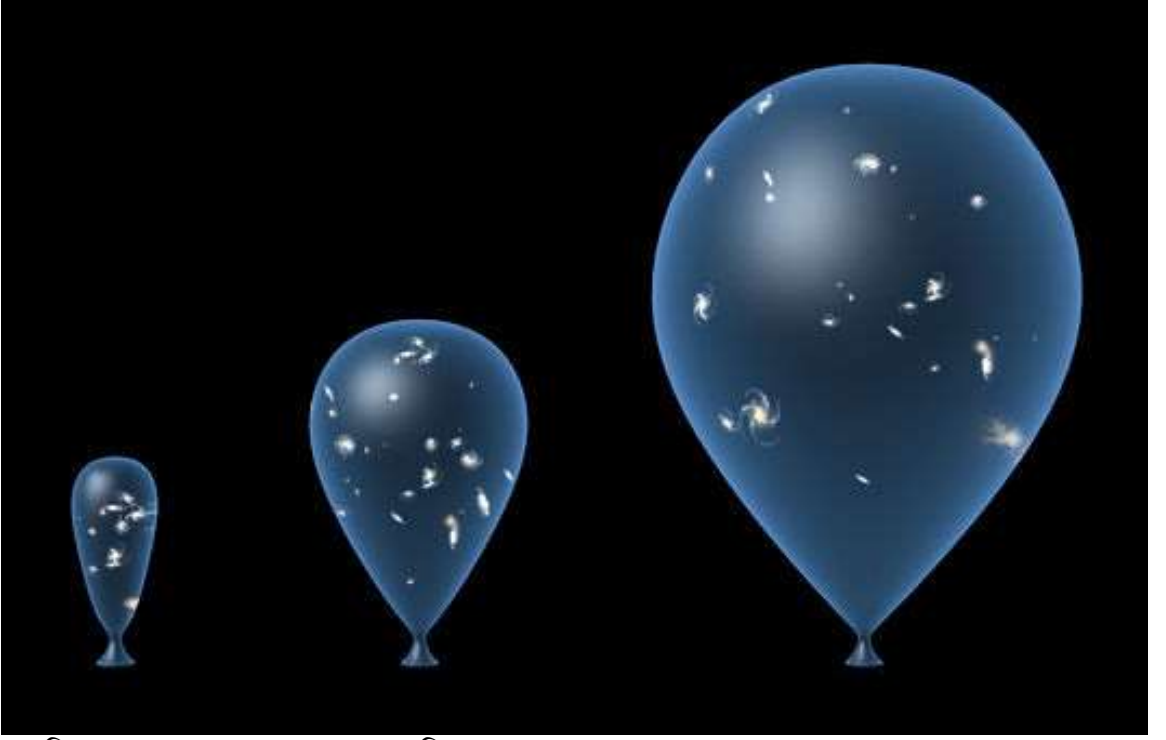
বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, প্রায় ১০ থেকে ১৭ বিলিয়ন বছর পূর্বে ছোট অথচ ভীষণ ভারী ও গরম একটা বস্তুপিণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে সকল দিকে বিস্তৃত হতে শুরু করে (শক্তি হিসেবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে)। এ বিস্ফোরণকে মহাবিস্ফোরণ বলা হয়। মহাবিস্ফোরণের পর অতি ক্ষুদ্র পদার্থকণা প্রথমে ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। তারপর ছোট ছোট কণাগুলো কিছুটা ঠাণ্ডা ও একত্রিত হয়ে জ্যোতিষ্কে পরিণত হয়। এভাবে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র সৃষ্টি হয়। এভাবে যখন ছোট কণা মিলে জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি হচ্ছিল তখন আবার মহাশূন্য আরো বিস্তৃত হচ্ছিল।



চিত্র ৬.৪: মহাবিশ্বের সৃষ্টি

মহাবিশ্বের সকল শক্তি, পদার্থ, মহাকাশ সব কিছু এ বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ধারণা করা হয় সূর্য যখন সৃষ্টি হয় তখন তার কিছু থেকে যাওয়া অংশ মহাকাশে ধূলিকণার মতো ভেসে বেড়িয়েছে। তারপর প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন বছর পূর্বে এ ধূলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে।

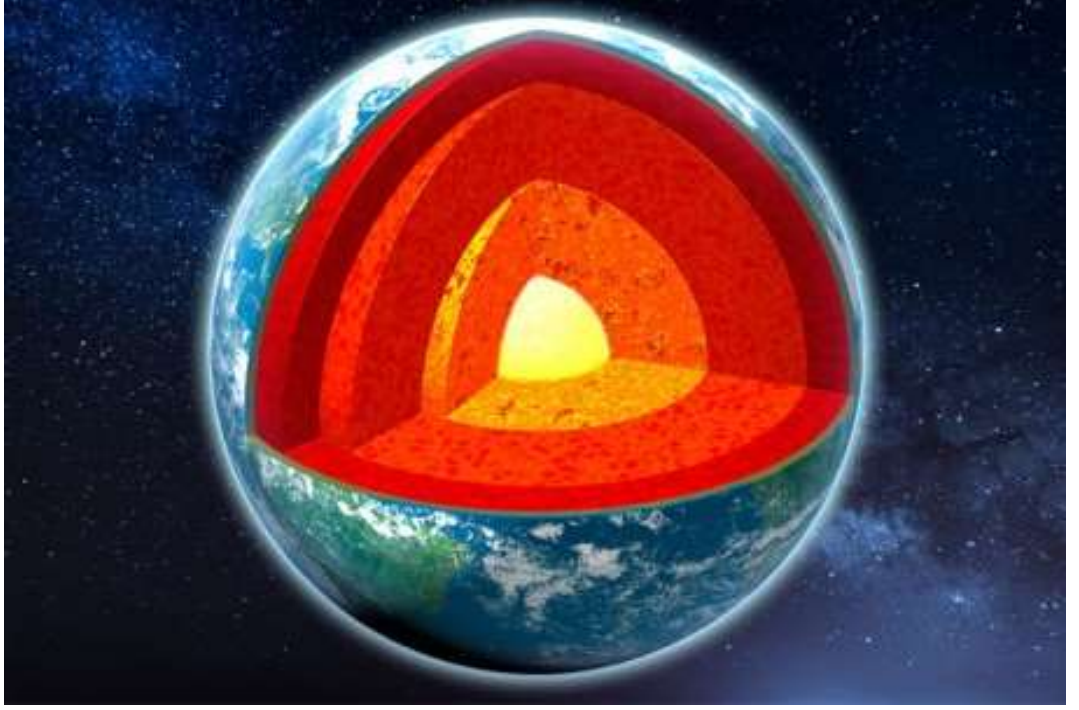
মহাবিস্ফোরণের সমর্থনে প্রমাণ: মহাবিশ্ব একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে তার পক্ষে অনেক তথ্য প্রমাণ রয়েছে। এর একটি প্রমাণ হলো, মহাশূন্য এখনো বিস্তৃত হচ্ছে। মহাকাশের গ্যালাক্সি/ছায়াপথ ও তারাসমূহ একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাজেই তারা হয়তো একসময় একসাথে ক্ষুদ্র একটি জায়গায় ছিল; বিস্ফোরণের মাধ্যমে তারা আলাদা হয়েছে।



চিত্র ৬.৫: ক্রমসম্প্রসারণমান মহাবিশ্বে বস্তুসমূহের পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবার বেলুন মডেল

আমাদের বাসভূমি পৃথিবী

আগেই বলা হয়েছে যে, পৃথিবী সৌরজগতের আটটি গ্রহের মধ্যে একটি। পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। প্রাণের জন্য দরকারি সব উপাদান পৃথিবীতে রয়েছে। এটি গোলাকার এবং আমরা ঐ গোলকের পৃষ্ঠে অবস্থান করছি। তবে পৃথিবী পুরোপুরি গোলাকার নয়, কমলালেবুর মতো উত্তর-দক্ষিণ দিকে কিছুটা চাপা। আপনারা নিশ্চয়ই ভূ-গোলক বা গ্লোব দেখেছেন। এটি দেখলে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যায়। গোলাকার পৃথিবীপৃষ্ঠের চারভাগের তিনভাগ তরল পানি দিয়ে আবৃত। পানি দ্বারা আবৃত জলভাগকে বলা হয় বারিমণ্ডল। আর এ গোলাকার পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে গ্যাসীয় বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)। এ ছাড়াও রয়েছে আরো তিনটি গোলায়ভাগ বা মণ্ডল। পৃথিবীর উপরের কঠিন আবরণকে ভূ-ত্বক (Crust) বলে। ভূ-ত্বক মূলতঃ অশ্মামণ্ডলের উপরিভাগ যার গড় গভীরতা প্রায় ১৭ থেকে ৪৮ কিলোমিটার এবং প্রধান উপাদান অক্সিজেন, সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম। ভূ-ত্বকের পানি ভিন্ন যে অংশটি জৈব পদার্থ দ্বারা গঠিত ও নরম হয় তাকে মাটি বলা হয়। উল্লেখ্য, অশ্মামণ্ডল (আরেক নাম শিলামণ্ডল) পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে একশত কিলোমিটার নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে পারে। আবার, শিলামণ্ডলের নিচে রয়েছে গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল। ভূ-পৃষ্ঠ তথা অশ্মামণ্ডল ঠাণ্ডা হলেও কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল বেশ উত্তপ্ত। অশ্মামণ্ডলের নিচে প্রায় ৩০৫৮ কি.মি পর্যন্ত বিস্তৃত গোলাকার ভাগকে গুরুমণ্ডল বলা হয়। এই অংশে সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়ামের প্রাধান্য থাকে। গুরুমণ্ডলের ঠিক নিচে কেন্দ্রমণ্ডল। কেন্দ্রমণ্ডলে অতি উত্তাপে এর উপাদান গলিত হলেও ওপরের চাপে শক্ত অবস্থায় আছে। কেন্দ্রমণ্ডলে লোহা ও নিকেলই প্রধান, যার জন্য পৃথিবী চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে।



চিত্র ৬.৬: পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন

আচ্ছা একটু আগে বলা হয়েছে যে, আমরা গোলাকার পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থান করছি। প্রশ্ন হলো, আমরা তাহলে পৃথিবী থেকে দূরে ছিটকে বা পড়ে যাই না কেন? এর কারণ মাধ্যাকর্ষণ বল। পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ বলের মাধ্যমে তার পৃষ্ঠের সব কিছুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরে-এর ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থানকারী কোনো কিছুই পৃষ্ঠ থেকে ছিটকে পড়ে না।

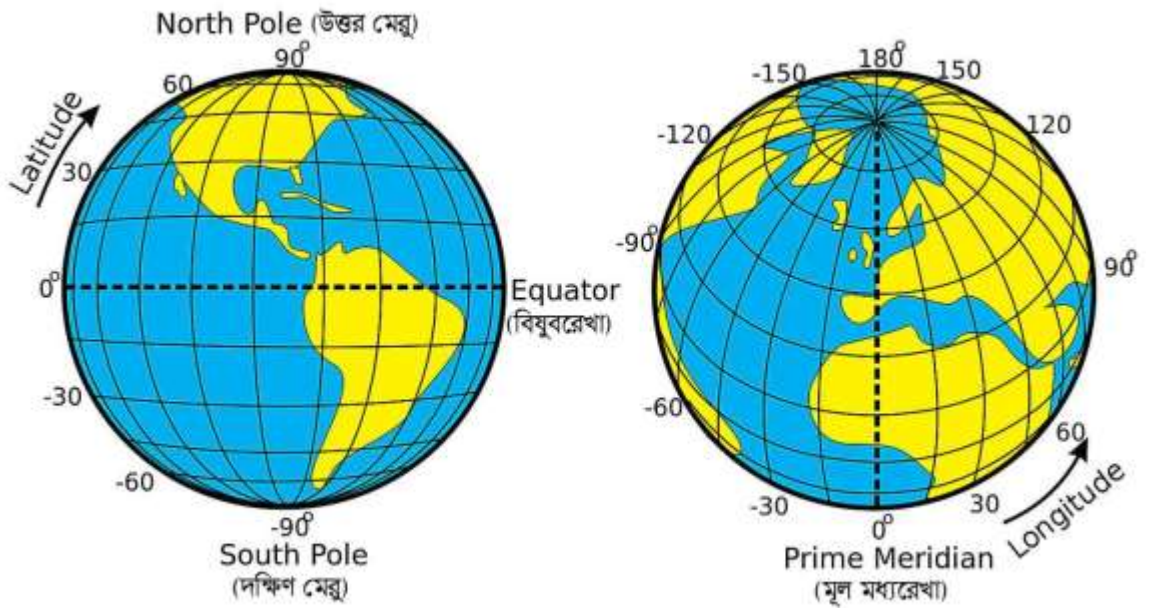


চিত্র ৬.৭: গোলাকার পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে মানুষের অবস্থান

কাজ: শ্রেণির অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একজন শিক্ষার্থীর হাতে একটুকরো শক্ত দড়ির এক প্রান্ত শক্ত করে ধরতে দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী অপর একজন শিক্ষার্থীকে দড়িটির অপরপ্রান্ত ধরে টান-টান হয়ে কেন্দ্রথাকা তার শক্তিশালী বন্ধুর চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরতে বলুন। কাজটি থেকে যা ধারণা লাভ করলো, তা শ্রেণিতে আলোচনা করুন।

এবার আমাদের জানা প্রয়োজন কীভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠের কোন স্থানের অবস্থান ও সময় নির্ণয় করা হয়। একটি গ্লোব নিয়ে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। লক্ষ করুন, পৃথিবীর উপর অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়েছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভূকেন্দ্রকে ছেদ করে সরাসরি উত্তর দক্ষিণে যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে অক্ষ (Axis) বা মেরুরেখা বলে। অক্ষের উত্তর প্রান্তবিন্দুকে উত্তরমেরু (North Pole) বা সুমেরু ও দক্ষিণ প্রান্তবিন্দুকে দক্ষিণমেরু (South Pole) বা কুমেরু বলে।

দুই মেরু থেকে সমান দূরে পৃথিবীর উপর পূর্ব পশ্চিমে যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা (Equator) বলে। এই রেখা পৃথিবীকে পূর্ব -পশ্চিমে পূর্ণবৃত্তরূপে বেষ্টিত করে আছে। নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে উত্তর-দক্ষিণে দুইটি সমানভাগে ভাগ করেছে। উত্তরভাগের নাম উত্তরগোলার্ধ এবং দক্ষিণভাগের নাম দক্ষিণ গোলার্ধ। নিরক্ষরেখার সমান্তরালে নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়েছে এগুলোকে সমাক্ষরেখা বা অক্ষরেখা (Parallels of Latitude) বলে। নিরক্ষরেখা হতে উত্তরে বা দক্ষিণে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) বলে। নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ 0° । গড়ে এক ডিগ্রী অক্ষাংশের রৈখিক ব্যবধান ১১১ কিলোমিটার। বিষুবরেখা থেকে 23.5° উত্তর অক্ষাংশকে কর্কটক্রান্তিরেখা ও 23.5° দক্ষিণ অক্ষাংশকে মকরক্রান্তিরেখা বলে। আবার বিষুবরেখা থেকে 66.5° উত্তর এবং 66.5° দক্ষিণ সমাক্ষরেখাদ্বয়কে যথাক্রমে সুমেরুবৃত্ত (Arctic Circle) এবং কুমেরুবৃত্ত (Antarctic Circle) বলা হয়।



চিত্র ৬.৮: পৃথিবীর উপর অঙ্কিত রেখাসমূহ(অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ)

সমাক্ষরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে কোন স্থানের অবস্থান জানার জন্য পৃথিবীর দুই মেরুকে সংযুক্ত করে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়েছে এগুলোকে দ্রাঘিমা রেখা (Lines of Longitude) বা মধ্যরেখা (Meridians) বলে। মধ্যরেখাগুলো একে অন্যের সমান কিন্তু সমান্তরাল নয়। লন্ডনের উপকণ্ঠে গ্রীনিচ শহরে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত মানমন্দিরের উপর দিয়ে যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে তাকে মূলমধ্যরেখা (Prime Meridian) বলা হয়। মূলমধ্যরেখার মান 0° । এই মূলমধ্যরেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সে স্থানের দ্রাঘিমা (Longitude) বলা হয়। আমরা জানি, পৃথিবী 360° ঘোরে ২৪ ঘন্টায়। সুতরাং পৃথিবী প্রতি ঘন্টায় 15° ও প্রতি ৪ মিনিট 1° পথ অতিক্রম করে। এভাবে, পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থান ও সময় নির্ণয়।

অনুসন্ধান ৬.২: পৃথিবীর আঙ্গিক গতি (দিন ও রাত সংঘটনের কারণ)

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ: পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপর কত ঘন্টায় একবার ঘুরে আসে? পৃথিবীতে একই সময়ে সর্বত্র কেন দিন বা রাত হয়না? তাহলে, পৃথিবীতে কীভাবে দিন ও রাত সংঘটিত হয়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন

আমরা জানি, পৃথিবীর আকৃতি গোল এবং পৃথিবীর সর্বত্র একসাথে দিন-রাত্রি হয় না। তাহলে, পৃথিবীতে দিন ও রাত কীভাবে সংঘটিত হয়, তা আমরা কীভাবে পরীক্ষা করতে পারি? চিন্তা করুন, সহপাঠীর সাথে কথা বলুন। কোন স্থির আলোক উৎসের (মোমবাতি, টর্চ, কুপিবাতি) নিকট একটি গ্লোবকে ঘোরালে কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

১. নিচের ছকটি খাতায় তুলুন।

জ্বলন্ত টর্চের সাপেক্ষে স্টিকারের অবস্থান	পর্যবেক্ষণের ফলাফল
স্টিকার যখন আলোর দিকে থাকে	১। ২।
স্টিকার যখন আলোর বিপরীতে থাকে	১। ২।

২. ভূগোলকে বাংলাদেশের উপর একটি স্টিকার লাগান।

৩. শ্রেণিকক্ষটি অন্ধকার করে ভূগোলকের উপর টর্চ এর আলো নিষ্ক্ষেপ করলে কী ঘটবে?

৪. ভূগোলকের উপর টর্চ এর আলো নিষ্ক্ষেপ করুন। পর্যবেক্ষণের ফলাফলসমূহ সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ছকে লিখুন।

৫. ভূগোলকটি ধীরে ধীরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরালে স্টিকার ও আলোর অবস্থানগত কী পরিবর্তন হবে?

৬. আপনাদের ধারণাটি ছকে লিখুন।

ধারণা গঠন: বাংলাদেশের উপর যখন টর্চের আলো নিষ্ক্ষেপিত থাকে তখন তার বিপরীতে কোন দেশগুলো থাকে? এক্ষেত্রে, কোথায় দিন আর কোথায় রাত হয়? আবার ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে যখন ভূগোলককে ধীরে ধীরে ঘোরানো হলো তখন বাংলাদেশ অংশও তার বিপরীত অংশের মধ্যে কী পরিবর্তন হলো? এভাবে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর নিজ অক্ষে ঘূর্ণনের ফলাফল কী?

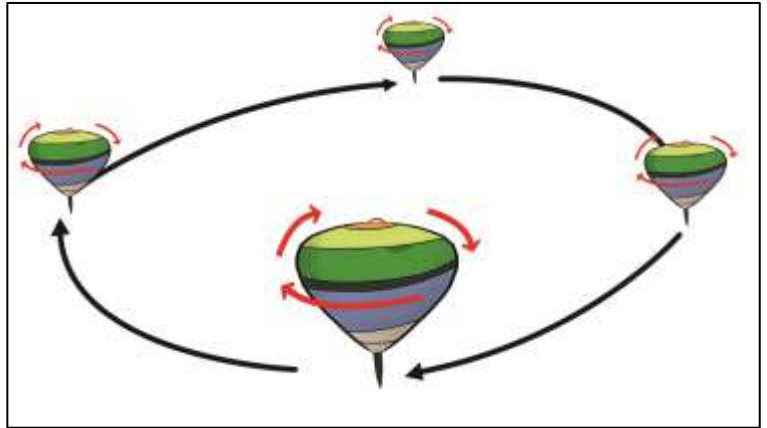
ধারণা প্রয়োগ: আমরা জানলাম, সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর নিজ অক্ষে ঘূর্ণনের ফলে দিন-রাত সংঘটিত হয়। আমরা আরো জানি, পৃথিবী নিজ অক্ষে ২৪ ঘন্টায় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একবার ঘোরে। এখন, বাংলাদেশ থেকে একটি দেশ পশ্চিমে অপর একটি দেশ পূর্বে অবস্থিত হলে কোথায় সূর্যোদয় আগে হবে এবং কোথায় পরে হবে?

বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্তন

পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তন এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণন

আমরা দেখলাম, কীভাবে পৃথিবীতে দিন ও রাত হয়। এর আগে আমাদের জানা প্রয়োজন সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণন বা আবর্তনের ধরন। আমরা পৃথিবী থেকে দেখি সকালে সূর্য পূর্ব দিকে উঠে ক্রমে ক্রমে আমাদের মাথার উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ডুবে যায়। পরদিন সকালে আবার আমরা দেখতে পাই যে সূর্য আবার পূর্ব দিক থেকে উঠছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরছে। আগের দিনে মানুষরা তাই ধারণা করত যে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং পৃথিবী নিজ অক্ষের উপরও আবর্তিত হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এ বিষয়টি এখন প্রমাণিত। কিন্তু কারো মনে বিশেষ করে অল্পবয়সী শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমরা তো পৃথিবীকে চলতে দেখি না, সূর্যকেই বরং দেখি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুও আসতে! এর জবাব আমাদের জীবনের একটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেয়া যায়। আপনার নিশ্চয়ই লঞ্চ, ট্রেন বা বাসে ভ্রমণ করেছেন। এসব যানবাহন যখন দ্রুত চলতে থাকে তখন লক্ষ করেছেন কি, কাছের গাছপালা কী করে? মনে হয়, কাছের গাছপালা পেছনের দিকে ছুটে যাচ্ছে আর আপনাদের লঞ্চ বা ট্রেন স্থির রয়েছে। একইভাবে আমাদের মনে হয় পৃথিবী স্থির রয়েছে কিন্তু সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে, যদিও প্রকৃত বিষয়টি একেবারে উল্টো।

আপনারা নিশ্চয়ই লাটিম নিয়ে খেলেছেন, লাটিম কীভাবে ঘোরে। লাটিমের সরু আলের উপর দাঁড়িয়ে নিজে নিজে ঘোরে (আবর্তন করে)। একই সাথে মাটির উপর বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে এক স্থান থেকে অন্য স্থান হয়ে ঘুরে আসে।



চিত্র ৬.৯: লাটিমের দুই ধরনের ঘূর্ণন/গতি

আরো একটি উদাহরণ দেয়া যাক। আপনারা ক্রিকেট খেলার সময়

টিভিতে স্পিন বোলিং দেখেছেন নিশ্চয়ই? স্পিন বোলিংয়ে বলটি কীভাবে অবস্থান পরিবর্তন করে? বোলার বলটি ছোড়ার পর ক্রিকেট বলটি নিজ অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে। বলটি পিচ বা মাটিতে পড়ার পর লেগস্টাম্প বা অফস্টাম্পের দিকে বেঁকে উইকেটকিপারের দিকে যায়। এভাবে ক্রিকেট বলটির দু'ধরনের গতি রয়েছে— একটি নিজ অক্ষের উপর আবর্তন, আরেকটি মাটি বা পিচের উপর ঘুরে আসা।

উপরের দু'টি উদাহরণের লাটিম বা ক্রিকেট বলের মতো পৃথিবীরও দু'ধরনের ঘূর্ণন রয়েছে। একটি হলো পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর কেন্দ্র করে ২৪ ঘণ্টায় একবার পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে। এটিকে বলা হয় পৃথিবীর আক্ষিক গতি। এ পরীক্ষাটিতে যেভাবে দেখা গেল সেভাবে পৃথিবী তার নিজ অক্ষে আবর্তন করে, ফলে আমরা দিন, তারপর রাত; আবার দিন, আবার রাত; আবার দিন এ রকম পরিবর্তন হতে দেখি। অন্যকথায়, দিন-রাত-দিন-রাত-দিন এরকম পরিবর্তন আমরা দেখি পৃথিবী তার নিজ অক্ষে আবর্তন করে বলেই। দ্বিতীয়টি হলো পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা (প্রকৃতপক্ষে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড) সময়ে একবার সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসে। একে বলা হয় পৃথিবীর বার্ষিক গতি।

অনুসন্ধান ৬.৩: দিন ও রাতের পরিসর।

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

বাংলাদেশে ডিসেম্বর মাসে বিকাল ৫:০০ টার দিকে সন্ধ্যা হয় অথচ জুন মাসে প্রায় ৭:০০ টায় সন্ধ্যা হয় কেন? কেন দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হয়? আবার, পৃথিবীর এক দেশে যখন শীতকাল আরেক দেশে তখন গ্রীষ্মকাল কেন? তাহলে, কীভাবে পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তন হয়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: পৃথিবী তার অক্ষের সাথে ও কক্ষতলের সাথে কীভাবে অবস্থান কওে? পৃথিবী ১ বছরে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনের সময় কয়টি অবস্থান গ্রহণ কওে? তাহলে, দিন ও রাতের পরিসরের পার্থক্য কীভাবে নির্ণয় করা যাবে? চিন্তা করুন, সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন। একটি স্থির আলোক উৎসের (টর্চ, মোমবাতি ইত্যাদি) সম্মুখে ভূগোলকের বিভিন্ন অবস্থানগত পরিবর্তন করলে কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি :

১. নিচের ছকটি খাতায় তুলুন।

	কর্কটক্রান্তি রেখার উপর আলো নিষ্ক্ষেপ		মকরক্রান্তি রেখার উপর আলো নিষ্ক্ষেপ	
	উত্তর গোলার্ধ	দক্ষিণ গোলার্ধ	উত্তর গোলার্ধ	দক্ষিণ গোলার্ধ
আলোকিত অংশ (দিন) বেশি/কম বা (বড়)/(ছোট)				
অন্ধকার অংশ (রাত) বেশি/কম বা (বড়)/(ছোট)				

২. শ্রেণিকক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন করুন।

৩. টেবিলের উপর একটি টর্চকে (স্থির আলোক উৎস হিসেবে) এমন উচ্চতায় স্থাপন করুন যেন টেবিলে থাকা ভূগোলকের বাংলাদেশ তথা কর্কটক্রান্তি রেখার (২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশে) উপর

টর্চের আলো পড়ে। খেয়াল রাখুন, ভূগোলকটি স্থির আলোক উৎস থেকে এমন দূরত্বে স্থাপন করতে হবে যেন টর্চের আলো ভূগোলকের উপর গোলাীয়ভাবে পড়ে এবং গোলাীয় অংশ যেন বেশী বড় বা ছোট না হয়।

৪. অতঃপর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের উপর আলোকিত ও অন্ধকার অংশ পর্যবেক্ষণ করে ছকে লিখুন।
৫. পুনরায় স্থির আলোক উৎসের অভিমুখে ভূগোলকটি একই দূরত্বে এমনভাবে স্থাপন করুন যেন আলো মকরক্রান্তি রেখার (23.5° দক্ষিণ অক্ষাংশে) উপর পড়ে।
৬. এবার উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের উপর আলোকিত ও অন্ধকার অংশ পর্যবেক্ষণ করে ছকে লিখুন।

ধারণা গঠন: টর্চের আলো যখন কর্কটক্রান্তি রেখার উপর পড়লো হয় তখন কোন গোলার্ধে আলোকিত অংশ বেশী, অন্ধকার অংশ কম হয়? তখন উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে দিন ও রাতের পরিসর কেমন হয়? অন্যদিকে, টর্চের আলো যখন মকরক্রান্তি রেখার উপর নিষ্ক্ষেপিত হয় তখন উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে দিন ও রাতের পরিসর কেমন হয়?

ধারণা প্রয়োগ: সূর্য যখন কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার দিন ও রাতের পরিসর কেমন হবে?

ধারণা পরিবর্তন

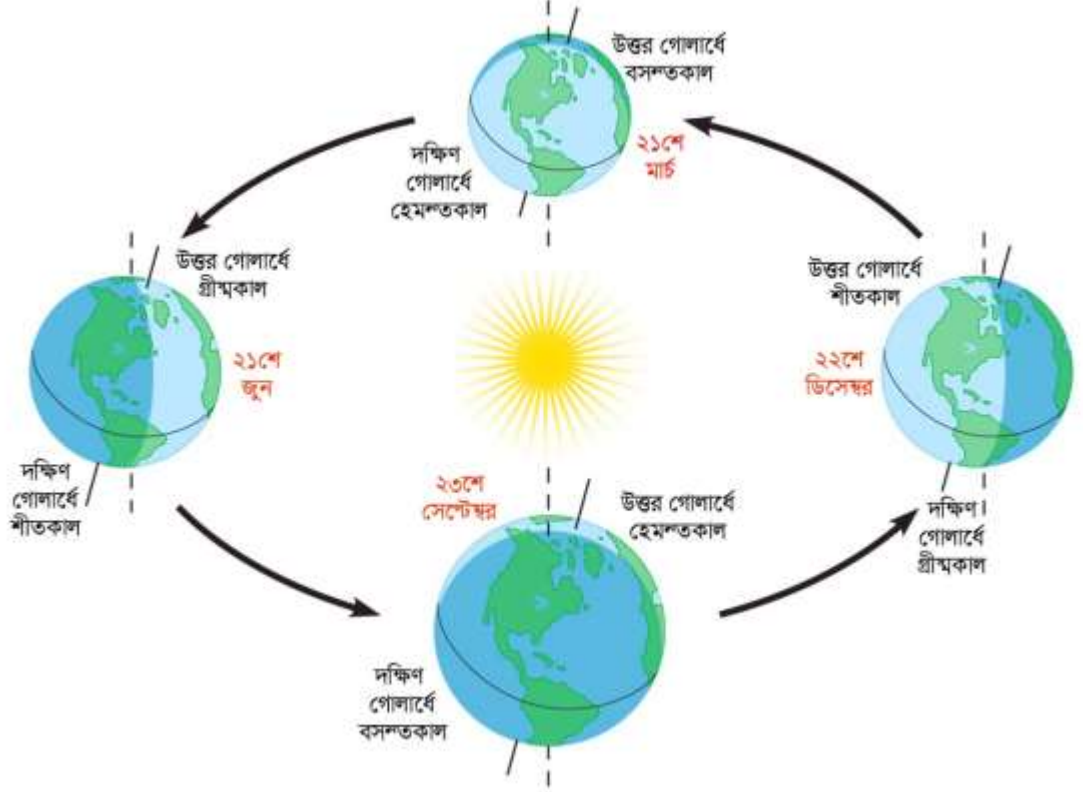
সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণন: পৃথিবীর বার্ষিক গতি

আমরা কি বছরের সবসময় একই রকমের আবহাওয়া দেখতে পাই? জানুয়ারি বা পৌষ-মাঘ মাসে শীত না গরম থাকে? আষাঢ় বা ভাদ্র মাসে কেমন থাকে আবহাওয়া? জ্যৈষ্ঠ মাসের আবহাওয়া কি পৌষ মাসের মতোই, না ভিন্ন? আমরা দেখি বাংলাদেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম আবহাওয়া থাকে। পৌষ বা মাঘ মাসে বেশ শীত পড়ে আবার বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বেশ গরম পড়ে। কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে কীভাবে ঘোরে তার উপর। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে কিছুটা হেলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। অর্থাৎ পৃথিবীর একটা অংশ একটি নির্দিষ্ট সময় সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। তবে পৃথিবী বছরের বিভিন্ন সময়ে তার হেলানো অবস্থান পরিবর্তন করে। পৃথিবীর একটি অংশ যখন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে তখন সেই অংশটি বেশিক্ষণ ধরে এবং খাড়াভাবে সূর্যের তাপ পায়। পৃথিবীর সেই অংশে তখন গ্রীষ্মকাল। আপনারা জানেন যে, পৃথিবীর বিষুবরেখার দুই পার্শ্বকে দুটি গোলার্ধে ভাগ করা হয়, উত্তর অংশকে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ অংশকে/পার্শ্বকে দক্ষিণ গোলার্ধ ধরা হয়। আমরা উত্তর গোলার্ধে পড়েছি। ২১ জুন তারিখে বাংলাদেশ সূর্যেও দিকে মুখ করে থাকে, তাই এ সময়ে আমরা সূর্যকে আমাদের মাথার উপর দেখতে পাই। এ সময়ে আমরা সবচেয়ে লম্বা দিন ও ছোট রাত দেখতে পাই। এ সময়টিকে তাই বাংলাদেশে গরমের সময় বলে। তবে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এ সময়ে বাংলাদেশে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে আমরা এ সময়টিকে বর্ষাকাল বলে থাকি।

পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ ২১ জুন তারিখে সূর্য থেকে দূরে অবস্থান করে বলে দক্ষিণ গোলার্ধে তখন রাত বড় হয় এবং দিন ছোট হয় এবং ওখানে তখন শীতকাল। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় জুন, জুলাই ও আগস্ট-এ তিন মাস শীতকাল। পৃথিবী ২১ জুনের পরে তার হেলানো অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকে।

বাংলাদেশসহ উত্তর গোলার্ধ কিছুটা দূরে সরে যেতে থাকে, একই সাথে দক্ষিণ গোলার্ধ কিছুটা সূর্যের দিকে এগোতে থাকে। এভাবে সেপ্টেম্বরের ২৩ তারিখে পৃথিবীর বিষুব অঞ্চল সূর্যেও দিকে মুখ করে থাকে এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেঝু ঐ সময়ে সূর্য থেকে সমান দূরত্বে থাকে। সেপ্টেম্বর ২৩ তারিখে তাই পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে দিন-রাত সমান হয়। বিষুবীয় অঞ্চলে তখন সূর্য মাথার উপরে অবস্থান করে খাড়াভাবে কিরণ দেয়, তখন বিষুবীয় অঞ্চলে বেশ গরম পড়ে (যেমন ইন্দোনেশিয়া)। বাংলাদেশে তখন দিন-রাত সমান বলে তখন শীতও নয় আবার খুব গরমও নয়। দক্ষিণ গোলার্ধেও তখন খুব শীত চলে গিয়ে গ্রীষ্মকাল আসতে থাকে; অর্থাৎ তখন বসন্তকাল।



চিত্র ৬.১০: পৃথিবীর বার্ষিক গতি ও ঋতু পরিবর্তন

চিত্র অনুযায়ী ২১ ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধের একটি অংশ তখন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে আর বাংলাদেশ সূর্যের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করে। তাই তখন বাংলাদেশে দিন ছোট হয় এবং রাত বড় হয়। পক্ষান্তরে দক্ষিণ গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়ায় তখন দিন বড় এবং রাত ছোট হয়। আমরা দেখি সূর্য তখন দক্ষিণ দিকে সরে গিয়েছে। সূর্য যখন দক্ষিণ গোলার্ধে খাড়াভাবে কিরণ দেয়। তাই দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল এবং আমাদের দেশসহ উত্তর গোলার্ধে তখন শীতকাল।

আবার পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে ২১ মার্চ এমন একটি অবস্থানে আসে যখন পৃথিবীর বিষুবরেখা সূর্যের দিকে মুখ করে হলে থাকে। তখন আবার পৃথিবীর সকল স্থানে দিন-রাত সমান হয়। এজন্য এ সময়ে আমাদের দেশেও দিন-রাত সমান হয় এবং এ সময়ে শীতও বেশি থাকে না আবার গরমও বেশি পড়ে না। ২১ মার্চের পরে পৃথিবী আবার ঘুরতে ঘুরতে ২১ জুন তারিখে আগের বছরের অবস্থানে ফিরে আসে। এভাবে সূর্যের দিকে পৃথিবীর অবস্থানের তারতম্যের কারণে দিন-রাত ছোট বা বড় এবং তার ফলস্বরূপ ঋতু পরিবর্তিত হয়

অনুসন্ধান ৬.৪: চাঁদের বিভিন্ন দশা পরিবর্তন ।

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

চাঁদ কোথা হতে আলো পায়? কেনই বা চাঁদকে কোন একরাতে পূর্ণখালার মতো দেখায় আবার কখনও সরু ফালির মতো দেখায়? পৃথিবীতে কেন একই সময়ে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা হয় না ? তাহলে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা কীভাবে সংঘটিত হয়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আমরা জানি চাঁদের আকৃতি গোল এবং চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে। তাছাড়া চাঁদের অর্ধাংশ সূর্যের আলোতে আলোকিত। তাহলে, চাঁদের দশা কীভাবে পরিবর্তিত হয়? চিন্তা করুন, সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন।

একটি স্থির আলোক উৎসের (সূর্য হিসেবে) সম্মুখে বিভিন্ন অবস্থানে কয়েকটি ছোট সাদা রংয়ের (টেনিস বল, ক্রিকেট বল) স্থাপন করে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে কী ঘটে ?

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

১. নিচের ছকটি খাতায় তুলুন।

বলের বিভিন্ন অবস্থা	বলের উপর আরোপিত আলোর আকৃতি	বলের উপর আরোপিত আলোর ছবি অংকন
ক. অবস্থান		
খ. অবস্থান		
গ. অবস্থান		
ঘ. অবস্থান		

- একটি অঙ্ককার কক্ষে আপনাদের যে- কোন একজন একটি টর্চ/মোমবাতি হাতে নিয়ে আপনার মুখমণ্ডলের সমান্তরাল করে দাঁড়ান।
- এবার প্রায় সমান উচ্চতার আপনার অপর চারজন সহপাঠীকে চারটি সাদা রংয়ের টেনিস/ক্রিকেট বল নিয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়াতে বলুন এবং বলগুলোকে প্রত্যেকের মুখমণ্ডলের সম্মুখে ধরতে বলুন।
- অতঃপর অপর একজন সহপাঠীকে বৃত্তের মাঝখানে (চিত্রের অবস্থান অনুযায়ী) দাঁড়িয়ে বলগুলোর উপর আপতিত আলো পর্যবেক্ষণ করুন এবং ছবি আঁকুন। খেয়াল রাখতে হবে, ‘গ’ অবস্থানের বলের উপর আপতিত আলো পর্যবেক্ষণের সময় আপনার সহপাঠীকে একটু সরে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে আপনার সহপাঠীর ছায়া বলে উপর না পড়ে।
- কাজটি নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন।



চিত্র ৬.১১: চাঁদের বিভিন্ন দশা পরিবর্তন

ধারণা গঠন

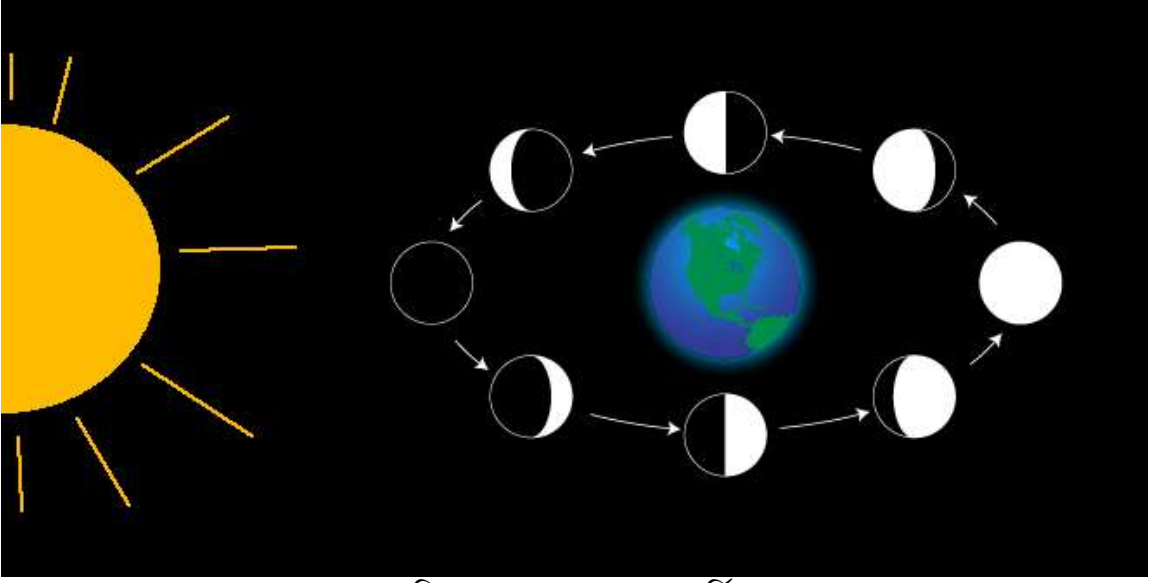
কোন অবস্থানের বলের পুরো অর্ধাংশের উপর আলো আপতিত হয়েছে? কোন অবস্থানে আলো একেবারেই আপতিত হয় না? কোন অবস্থাকে চাঁদের কোন দশা বলা যায়? তাহলে, চাঁদের দশাগুলো কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

ধারণা পরিবর্ধন

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা

চাঁদ প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের আগ্রহের বস্তু। আমরা লক্ষ করি যে, চাঁদ এক রাতে হয়তো একেবারেই দেখা যায় না। যাকে আমরা অমাবস্যার চাঁদ বলি। তার পরের রাতে সবু এক ফালি চাঁদ পশ্চিমা আকাশে অল্প সময়ের জন্য দেখা যায়। এ সবু এক ফালি চাঁদ প্রতি রাতে বড় হতে থাকে। দুই সপ্তাহ পর চাঁদকে একটি থালার মতো দেখা যায়। একে আমরা পূর্ণিমা বলি। পূর্ণিমার পরের রাত থেকে চাঁদটি আবার ক্ষয় (বা ছোট) হতে থাকে। এভাবে ক্ষয় হতে হতে আবার দুই সপ্তাহ পর চাঁদকে কে নো এক রাতে একবারের জন্যও দেখা যায় না। এভাবে ২৯ বা ৩০ দিন পর পর আমরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা হতে দেখি। কেন এরকম হয়? কেনই বা চাঁদকে এক রাতে পূর্ণ থালার মতো দেখা যায় আবার কেনইবা কোনো এক রাতে একটুও দেখা যায় না? উপরের প্রশ্নেড়বর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের জানতে হবে চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থান। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ অর্থাৎ চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করে এবং চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে বলে আমরা চাঁদকে আলোকিত দেখতে পাই। তবে চাঁদের অবস্থানের কারণে চাঁদকে আমরা সবসময় সমান আলোকিত দেখতে পাই না।

নিচের চিত্রটি থেকে ধারণা পাওয়া যাবে কেন আমরা চাঁদকে কখনো সরু দেখি কখনো পূর্ণ দেখি; আবার কখনো একেবারেই দেখতে পাই না।



চিত্র ৬.১২: অমাবস্যা ও পূর্ণিমা

চিত্রে চাঁদের ‘ক’ অবস্থানের কথা বিবেচনা করি। সূর্যের আলো চাঁদের যে অংশে পড়ে আমরা তার উল্টোদিকে পৃথিবীতে অবস্থান করি। তাই চাঁদের আলোকিত অংশ আমরা দেখতে পাই না। অর্থাৎ আমরা চাঁদকে একেবারেই দেখতে পাই না। এটিই অমাবস্যা। চাঁদটি যখন ঘুরতে ঘুরতে ‘খ’ অবস্থানের দিকে এগোয় তখন ধীরে ধীরে আমরা আলোকিত অংশ দেখতে অর্থাৎ চাঁদকে ছোট থেকে বড় হতে দেখতে শুরু করি। এভাবে এক সপ্তাহ পর চাঁদ যখন ‘খ’ অবস্থানে যায় তখন চাঁদের অর্ধেক অংশ আলোকিত দেখা যায় এবং একই সাথে বাকি অর্ধেক অংশে সূর্যের আলো পড়ে না বলে আমরা দেখতে পাই না। চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে দুই সপ্তাহ পর যখন ‘গ’ অবস্থানে আসে তখন আমরা চাঁদের আলোকিত অর্ধেক পুরোপুরি দেখতে পাই। এ সময় চাঁদকে আমরা পূর্ণ থালার মতো দেখতে পাই। এটিকে আমরা পূর্ণিমা বলে থাকি। পূর্ণিমার পর চাঁদ ‘ঘ’ অবস্থানের দিকে অগ্রসর হলে চাঁদের আলোকিত অংশ আমাদের চোখের আড়ালে চলে যেতে থাকে। অর্থাৎ চাঁদ আমাদের চোখে ক্ষয় হতে থাকে। এভাবে চাঁদ ‘ঘ’ অবস্থানে এলে অর্ধেক চাঁদ এবং চার সপ্তাহ পর ‘ক’ অবস্থানে ফিরে এলে অমাবস্যা ফিরে আসে।

আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও ধারণা

অনুসন্ধান ৬.৫: আবহাওয়া বলতে আমরা কি বুঝি এবং এর উপাদান কী কী?

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

আমরা কোন দিন কোন কাপড় পরব বা কি করব তা ঐ দিনের আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। এমনটা হবার কারণ কি বলে মনে হয় আপনার কাছে? আচ্ছা চলুন তো আমরা জানার চেষ্টা করি এই আবহাওয়া কী কী উপাদান দ্বারা গঠিত?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আবহাওয়ার উপাদানসমূহ কী কী তা জানা দরকার। এটা আপনারা কীভাবে করবেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে)

১। নিচের দেখানো ছকের ন্যায় একটি ছক তৈরি করুন।

আবহাওয়ার উপাদান

২। চিত্রগুলি দেখুন। জোড়ায় আলোচনা করে ছকে আবহাওয়ার উপাদানের একটি তালিকা তৈরি করুন।

৩। কাজটি নিয়ে সবার সাথে আলোচনা করুন।

ধারণা গঠন

আবহাওয়া বলতে আপনি কি বুঝতে পারেন? আবহাওয়ার উপাদান সমূহ দ্বারা আবহাওয়ার ধরণ নির্ধারণ কীভাবে করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ধারণা প্রয়োগ

বায়ুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি আবহাওয়ার উপাদান। এ উপাদান গুলির পরিমাণের ভিন্নতার কারণে আবহাওয়াও ভিন্ন হয়। এবারে শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের কথা চিন্তা করুন। উভয় ক্ষেত্রেই কি আবহাওয়া একই রকম? আবহাওয়ার এই ভিন্নতার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

ধারণা পরিবর্তন

আবহাওয়া

আবহাওয়া বলতে স্বল্প সময়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা বা বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ, মেঘ ও বৃষ্টিপাতের অবস্থাকে বোঝায়। যেমন আজকের দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এ থেকে বোঝা যায় আজকের আবহাওয়া বেশ গরম। আবার আজ বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫ শতাংশ-এ থেকে বোঝা যাবে আজ বা কাল বৃষ্টি হতে পারে। বায়ুমণ্ডলের এরকম অবস্থা-ই আবহাওয়া।

জলবায়ু

আমরা দেখেছি আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্প সময়ের অবস্থা, আমরা বলে থাকি আজ সকালে আবহাওয়া ঠাণ্ডা ছিল কিন্তু দুপুরে আবহাওয়া বেশ গরম হবার সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে, জলবায়ু হলো কোনো স্থানের অনেক বছরের আবহাওয়ার একটি সামগ্রিক গড় অবস্থা। যেমন আমরা বলে থাকি বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ, এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে আবার রাশিয়ার জলবায়ু শীতপ্রধান - এ কথা বলতে আমরা বুঝি যে রাশিয়ায় সাধারণত খুব শীত পড়ে।

অনুসন্ধান ৬.৬: আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান মূলত একই। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা (জলীয়বাষ্পের পরিমাণ), বৃষ্টিপাত এগুলো আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, উপাদানসমূহ একই হলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী? চলুন দেখি আমরা জানার চেষ্টা করি আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য কোথায়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কীভাবে নিরূপণ করবেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দলগঠন করে প্রত্যেক দলে নিচের দেখানো ছকের ন্যায় একটি করে ছক তৈরি করুন।

আবহাওয়া	জলবায়ু

২. দলগতভাবে আলোচনা করে উপরের ছকটি পূরণ করুন।
৩. আপনার দলের প্রস্তুতকৃত ছকটি অন্যান্য দলের ছকের সাথে পর্যালোচনা করুন।
৪. ছকটি চূড়ান্ত করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করুন।

ধারণা গঠন

জলবায়ু বলতে আপনি কি বুঝতে পারেন? জলবায়ুকে কীভাবে আবহাওয়া থেকে নির্ধারণ করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ধারণা প্রয়োগ

আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্যের আলোচনা থেকে আপনি আজকের আবহাওয়া সম্পর্কে কি মন্তব্য করতে পারেন? বাংলাদেশের জলবায়ু সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

ধারণা পরিবর্তন

আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য: আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহ একই হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নিচের ছকে এ পার্থক্য দেওয়া হল।

আবহাওয়া	জলবায়ু
১। কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্পকালীন অবস্থাই আবহাওয়া।	১। কোনো স্থানের অনেক বছরের আবহাওয়ার/বায়ুমণ্ডলের গড় অবস্থাই জলবায়ু।
২। কোনো স্থানের আবহাওয়া অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে।	২। কোনো স্থানের জলবায়ু পরিবর্তন হতে পারে তবে সেটা হতে অনেক বছর লেগে যায়।
৩। কাছাকাছি অঞ্চলের আবহাওয়া একই সময়ে ভিন্ন হতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট দিনে ফরিদপুরে বৃষ্টি হতে পারে কিন্তু বরিশালে বৃষ্টি নাও হতে পারে।	৩। কাছাকাছি অঞ্চলের জলবায়ু সাধারণত একই রকম। যেমন বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু একই রকম।

আবহাওয়ার পরিবর্তন

কোনো একদিন সকালে হয়তো ঘুম থেকে উঠে দেখলেন যে বাইরে উজ্জ্বল রোদ, তবে ততটা গরম লাগছে না। বেলা বাড়ার সাথে সাথে গরম বাড়তে লাগল, ঘাম হতে শুরু করল। আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ জমতে শুরু করলো এবং একসময় কালো মেঘে সূর্যটি ঢেকে গেল। একটু পরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি শেষে আকাশ আবার পরিষ্কার হলো এবং গরমটা কমে এলো। একটু চিন্তা করুন তো আবহাওয়া কতটা পরিবর্তন হলো এক দিনেই। আবহাওয়া পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কেন এভাবে আবহাওয়া পরিবর্তন হয়? আপনারা ইতোমধ্যেই জেনেছেন যে, বায়ুমণ্ডলে বায়ুর তাপমাত্রা, বায়ুচাপ ও বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিবর্তন বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি আবহাওয়ার নিয়ামক। এ নিয়ামকগুলো যখন পরিবর্তন হয় তখন আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। আর এসব নিয়ামকের পরিবর্তনে মূল ভূমিকা রাখে সূর্যতাপ। অর্থাৎ আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল ভূমিকা আসলে সূর্য তাপের। আমরা এখন দেখব সূর্যতাপ আবহাওয়ার উপাদানসমূহ পরিবর্তনে কীভাবে ভূমিকা রাখে।

সূর্যতাপের উপর তাপমাত্রার নির্ভরতা: সূর্য থেকে আগত আলোকরশ্মির সাথে তাপও পৃথিবীতে এসে পৌঁছে। সূর্যতাপ যখন পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে তখন পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠের সাথে মিশে থাকা বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরও (ট্রোপোস্ফিয়ার) এতে উত্তপ্ত হয়। ফলে দিনের বেলায় সাধারণত আমরা বেশি গরম অনুভব করি। রাতে যখন সূর্য অস্ত যায় তখনো পৃথিবী পৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তর গরম থাকে। কারণ দিনের বেলায় পৃথিবীপৃষ্ঠ যে তাপ পায় তা রাতের বেলায় সবটুকু চলে যেতে পারে না। পৃথিবীপৃষ্ঠ যে তাপ বিকিরণ করে বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প, কার্বন-ডাই অক্সাইড ইত্যাদি সেই তাপ শোষণ করে ধরে রাখে। তাই রাতের বেলাও আমরা গরম অনুভব করি। গ্রীষ্মকালে সূর্য আমাদের মাথার উপর থেকে লম্বভাবে (খাড়াভাবে) বেশি সময় ধরে কিরণ দেয় তাই আমরা বেশি গরম অনুভব করি। পক্ষান্তরে, শীতকালে সূর্য অনেকটা দূর থেকে তির্যকভাবে বা বাঁকাভাবে এবং কম সময় ধরে কিরণ দেয় তাই আমরা শীতকালে কম গরম অনুভব করি।

অনুসন্ধান ৬.৭: বায়ুর উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ সৃষ্টির কারণ কী?

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

বায়ু তার ওজনের কারণে ভূ-পৃষ্ঠের উপর যে চাপ প্রয়োগ করে তাই বায়ুচাপ। বায়ু উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। চিন্তা করুন তো কেন কীভাবে উচ্চচাপ আর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

কার্যপ্রণালি:

- ১। একটি ট্রে ১ সে. মি. পুরু বালি ও অন্য একটি ট্রে ১ সে. মি. গভীর পানি দ্বারা পূর্ণ করুন।
- ২। বালি ও পানি পূর্ণ ট্রে দুইটিতে থার্মোমিটার রাখুন।
- ৩। এবার বালি ও পানির তাপমাত্রা হাত দিয়ে যাচাই করুন।
- ৪। ট্রে দুইটিকে রৌদ্রোজ্জ্বল স্থানে রাখুন।
- ৫। বালি না পানি কোনটি দ্রুত গরম হবে অনুমান করুন।
- ৬। ২০-৩০ মিনিট পর পুনরায় হাত দিয়ে পানি ও বালির তাপমাত্রা অনুভব করে পূর্বের অনুমান সঠিক কিনা যাচাই করুন।
- ৭। ট্রে দুইটিকে ঠাণ্ডা ছায়াযুক্ত স্থানে ১ ঘণ্টার মত রেখে দিন।

[দ্রষ্টব্যঃ একই তাপমাত্রার জন্য পরিক্ষাটি শুরুর পূর্বে বালি ও পানি শ্রেণিকক্ষে ১ দিন আগে রেখে দিন। বালি যাতে শুকনা হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।]

- ৮। এক ঘণ্টা পর আবার বালি ও পানির তাপমাত্রা মাপুন।

ধারণা গঠন

সূর্যের আলোতে রাখার পর ট্রে-র বালি অন্য ট্রে-র পানির চেয়ে দ্রুত গরম হয়েছে। আবার ছায়ায় বালির ট্রে-টি পানির ট্রে অপেক্ষা দ্রুত ঠাণ্ডা হয়েছে। এই পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে বালি বা মাটি পানি অপেক্ষা দ্রুত গরম বা ঠাণ্ডা হয়। তাহলে কী বলা যায় যে, স্থলভাগ সমুদ্র কিংবা জলভাগ থেকে দ্রুত গরম ও ঠাণ্ডা হয়?

ধারণা পরিবর্তন

উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ: দিনে স্থলভাগ জলভাগ থেকে উষ্ণ থাকে। উষ্ণ স্থলভাগ তার উপরে থাকা বাতাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। বায়ু উষ্ণ হলে তা হালকা হয়ে উপরে ওঠে। ফলে ঐ স্থানে ফাঁকা হয়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে সমুদ্রের উপরের বায়ু স্থলভাগ থেকে ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে তা ভারি হয়ে নিচে নেমে আসে। এর ফলে সমুদ্রের উপর বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। নিম্নচাপ অঞ্চলের গরম বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। এর ফলে সৃষ্টি ফাঁকা স্থান পূরণের জন্য উচ্চচাপ অঞ্চলের শীতল বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। রাতে স্থলভাগ সমুদ্রের তুলনায় ঠাণ্ডা থাকে। তাই তখন স্থলভাগে বায়ুর উচ্চচাপ ও সমুদ্রে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

তাপমাত্রার উপর বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহের নির্ভরতা : তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে বায়ুচাপের পরিবর্তন হয়। বায়ুর তাপমাত্রা বাড়লে বায়ু প্রসারিত হয় এবং এর ঘনত্ব ও চাপ কমে যায়। আবার বায়ুর তাপমাত্রা কমে গেলে বায়ুর ঘনত্ব ও বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। বায়ুচাপ অবশ্য বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণের (বায়ুর আর্দ্রতার) উপরও নির্ভর করে। বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে বায়ুচাপ কমে যায়।

বায়ুচাপের পার্থক্যের কারণে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। আমরা যেমন দেখি পানি উচ্চতা যেখানে বেশি সেখান থেকে পানি কম উচ্চতার দিকে অর্থাৎ নিচের দিকে যায় তেমনি বায়ু উচ্চচাপের এলাকা থেকে নিম্নচাপের এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। আমরা শীতকালে উত্তর দিক থেকে শীতল বায়ু আমাদের দেশে প্রবাহিত হতে দেখি কারণ আমাদের বাংলাদেশ ও এর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপরের বায়ুমণ্ডল উষ্ণ থাকায় এখানে বায়ুচাপ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় অঞ্চলে তাপমাত্রা কম থাকায় বায়ুচাপ অপেক্ষাকৃত বেশি। তাই উচ্চচাপের হিমালয় এলাকা থেকে শীতল বায়ু বাংলাদেশের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। বর্ষাকালে আমরা কোন দিক থেকে কোন দিকে বায়ু প্রবাহিত হতে দেখি? শীতকালের ঠিক উল্টো, তাই না? কেন? আমরা দেখি বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে মৌসুমি বায়ু আমাদের দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালে, বর্ষাকালে সূর্য আমাদের দেশের উপর খাড়াভাবে কিরণ দেয়। ফলে আমাদের দেশের তাপমাত্রা তখন অনেক বেশি থাকে এবং বায়ুচাপ কম থাকে তুলনামূলকভাবে তখন বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের বায়ুমণ্ডলের বায়ুচাপ বেশি থাকে। ফলে বায়ু উচ্চচাপের এলাকা ভারত মহাসাগর থেকে নিম্নচাপের এলাকা বাংলাদেশ ও ভারতের দিকে প্রবাহিত হয়।

জলীয়বাষ্প, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘ, শিশির ও বৃষ্টিপাত

আপনারা পানি অধ্যায়ে জেনেছেন যে, পানি বায়বীয় অবস্থায়ও থাকতে পারে। সমুদ্র, নদী ও অন্যান্য জলাশয় থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়বীয় অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। বায়বীয় এ পানিকে জলীয়বাষ্প বলা হয়। বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণকে বলা হয় আর্দ্রতা। তবে আবহাওয়াবিদগণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে ও প্রকাশ করতে ‘আপেক্ষিক আর্দ্রতা’ ব্যবহার করেন। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হলো কোনো তাপমাত্রায় বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে তার তুলনায় বায়ুতে ঐ মুহূর্তে কত শতাংশ জলীয়বাষ্প রয়েছে সেটি। একে শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন ধরি ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বায়ু সর্বোচ্চ প্রতি ঘনমিটারে ৪০ গ্রাম জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে। কোনো

একদিন বায়ুতে ঐ তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্প ছিল প্রতি ঘনমিটারে ২০ গ্রাম। তাহলে ঐ সময়ে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৫০ শতাংশ। বায়ুর আর্দ্রতা ছিল ৬০ শতাংশ- এরকম তথ্যের অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে ঐ দিনে যে তাপমাত্রা ছিল সেই তাপমাত্রায় বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতার শতকরা ৬০ ভাগ জলীয়বাষ্প বায়ুতে ছিল।

আচ্ছা, আপনাদের মনে আছে কি, কীভাবে মেঘ ও বৃষ্টি হয়? আমরা আবাহার বিষয়টি আলোচনা করছি। সমুদ্র, নদী ও অন্যান্য জলাশয় থেকে পানি জলীয়বাষ্পের আকারে বায়ুমণ্ডলের উপরে উঠে যায়। জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে উঠলে তাপমাত্রা কমতে থাকে। ফলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র পানিকণায় পরিণত হয়। এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য পানিকণা মেঘ আকারে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। মেঘের ক্ষুদ্র পানি কণাগুলো একত্র হয়ে বড় কণায় পরিণত হয়। বড় পানিকণাগুলো আকাশে ভেসে থাকতে পারে না বলে বৃষ্টি আকারে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে।

উপরের প্রক্রিয়া যদি হয় মেঘ ও বৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়া তাহলে কি আর্দ্রতার সাথে এ প্রক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক আছে? আমরা দেখি বর্ষাকালে বা ভাদ্র মাসের গরমে আমাদের বেশ ঘাম হয় কিন্তু চৈত্র মাসে তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকলেও ঘাম খুব হয় না। এর কারণ আর্দ্রতা। আর্দ্রতা বেশি থাকলে আমাদের ঘাম হয় এবং সেই সময়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। আসলে ব্যাপারটি সহজেই বোঝা যায়। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি মানে বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি। জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি হলে তা থেকে মেঘ এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনাও বেশি। আমাদের দেশে আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে মৌসুমীবায়ু ভারত মহাসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প নিয়ে আসে। এ জন্য এ সময়ে বাতাসে আর্দ্রতাও বেশি, বৃষ্টিও হয় বেশি।

অনুসন্ধান ৬.৮: আবহাওয়ার প্রভাব নিরূপণ

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

আমরা কোন দিন কোন কাপড় পরবো বা কি করব তা ঐ দিনের আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। এমনটা হবার কারণ কি বলে মনে হয় আপনার কাছে? আচ্ছা চলুন তো আমরা জানার চেষ্টা করি এই আবহাওয়া আমাদের জীবনে কী কী প্রভাব ফেলে তা জানার চেষ্টা করি।

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: আমাদের জীবনধারায় আবহাওয়ার প্রভাব আপনারা কীভাবে নির্ণয় করতে পারেন? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি (শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যপ্রণালি ভিন্নতরও হতে পারে)

১. শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী দলগঠন করে প্রত্যেক দলে নিচের দেখানো ছকের ন্যায় একটি করে ছক তৈরি করুন।

ভালো আবহাওয়ার প্রভাব	বিরূপ আবহাওয়ার প্রভাব

২. দলগতভাবে আলোচনা করে উপরের ছকটি পূরণ করুন।
৩. আপনার দলের প্রস্তুতকৃত ছকটি অন্যান্য দলের ছকের সাথে পর্যালোচনা করুন।
৪. ছকটি চূড়ান্ত করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করুন।

ধারণা গঠন

বিরূপ আবহাওয়া বলতে আপনি কি বোঝেন? আবহাওয়া বিরূপ হলে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে আপনি কী ধরনের পরিবর্তন দেখতে পান?

ধারণা প্রয়োগ

কোন আবহাওয়া বিরূপ হবার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন? এ ধরনের ক্ষেত্রে আপনি কী পদক্ষেপ নিবেন?

ধারণা পরিবর্তন

বিরূপ আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

আমরা আবহাওয়ার খবরে মাঝেমাঝেই নিম্নচাপের কথা শুনে থাকি। আসলে নিম্নচাপ ও উচ্চচাপ বায়ুমণ্ডলের একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। ট্রপোস্ফিয়ারে সবসময়ই কোনো একটি এলাকাতে বায়ুচাপ কমে যায় এবং পাশের এলাকায় বায়ুচাপ বেশি থাকে। তবে কখনো কখনো কোনো এলাকায় বায়ুর চাপ ভীষণভাবে কমে যেতে পারে। তখন উচ্চচাপের বাইরের দিক থেকে (অর্থাৎ যেখানে বায়ুচাপ বেশি) বায়ু নিম্নচাপের এলাকার দিকে ধাবিত হয়। নিম্নচাপ এলাকায় চাপ অস্বাভাবিক কমে গেলে আমরা অস্বাভাবিক আবহাওয়া দেখি। অস্বাভাবিক বা বিরূপ আবহাওয়া মারাত্মক আকার ধারণ করলে তা প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিণত হয়। আমাদের দেশে বিরূপ আবহাওয়া বা আবহাওয়াজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বেশি দেখা যায় বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ও বজ্রবৃষ্টি, টর্নেডো ইত্যাদি। নিচে এর কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

কালবৈশাখী ও বজ্রবৃষ্টি: আমাদের দেশে আমরা কোন সময়ে কালবৈশাখী দেখতে পাই? সাধারণত বৈশাখ মাসে বিকেলের দিকে, তাই না? কখনো কখনো অবশ্য বৈশাখ গুরুুর আগে কিংবা বৈশাখ মাসের সকাল বা দুপুরেও আমরা কালবৈশাখী দেখি। কালবৈশাখী কোন দিক থেকে ধেয়ে আসে? আমরা দেখি উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে কালবৈশাখী ঝড় এগিয়ে আসে। বৈশাখ মাসে সাধারণত সূর্য আমাদের দেশ ও তার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপর খাড়াভাবে কিরণ দেয়, ফলে এ অঞ্চলের বায়ু রোদের তাপে হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। ফলে বিকেলের দিকে এ অঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ সময় দেশের উত্তরাঞ্চলে ও হিমালয়ের দিকে বায়ুর চাপ থাকে বেশি। তাই উচ্চচাপের উত্তরাঞ্চল থেকে বায়ু প্রবল বেগে দক্ষিণ দিকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। এটিই কালবৈশাখী। আবহাওয়াজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে কালবৈশাখী, টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড় একই ধরনের; এদেরকে সাধারণভাবে ঝড় বলা হয়। এরা একই ধরনের কারণে সৃষ্টি হয়।

টর্নেডো : কোনো স্থানের বায়ুচাপ হঠাৎ ভীষণ কমে গেলে টর্নেডো সৃষ্টি হয়। ঐ অতিরিক্ত নিম্নচাপ এলাকার দিকে চারদিকে থেকে বাতাস এসে শূন্যস্থান পূরণ করতে চাইলে ঐ স্থানের বাতাস প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে কোনো একদিকে ছুটতে থাকে। এ ধরনের টর্নেডো অল্প জায়গাজুড়ে অতি অল্প সময়ের জন্য দেখা যায়। টর্নেডোর বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৪৫০-৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এটি অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক, বাড়িঘর, গাছপালা নিমেষে ভেঙে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল এলাকায় টর্নেডো হতে দেখা যায়।

ঘূর্ণিঝড় (সাইক্লোন/হারিকেন/টাইফুন) : ঘূর্ণিঝড়কে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে উৎপন্ন ঘূর্ণিঝড়কে সাইক্লোন, জাপান ও পূর্ব এশিয়ায় একে হারিকেন বলা হয়। ঘূর্ণিঝড় টর্নেডোর মতোই অতিরিক্ত নিম্নচাপের কারণে সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড়সমূহের উৎপত্তি সাধারণত মহাসাগরগুলোতে। বাংলাদেশে যেসব ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে সেসব ঘূর্ণিঝড় (যেমন, আইলা) ভারত মহাসাগর বা বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ থেকে তৈরি হয়। সাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলের শূন্যস্থান পূরণের জন্য চারদিকের উচ্চচাপ এলাকা থেকে বাতাস একসাথে ছুটে আসে। ফলে নিম্নচাপ এলাকায় বাতাসের ঘূর্ণন শুরু হয়। এ রকম ঘূর্ণায়মান বাতাস প্রচুর জলীয়বাষ্পসহ স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হয়। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়সমূহ বাংলাদেশের উপকূল অথবা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা উপকূলে আঘাত হানে। স্থলভাগে প্রবেশ করার পর ঘূর্ণিঝড় বাড়িঘর, গাছপালা ইত্যাদিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দুর্বল হয়ে যেতে থাকে। তবে দুর্বল হবার আগে পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে বাড়িঘর, ক্ষেতের ফসল ও গাছপালা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষ ও গবাদিপশু মারা পড়ে। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের সাথে আসা জলীয়বাষ্পের কারণে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সমুদ্র থেকে ঢেউ আকারে লবণাক্ত পানি উপকূলীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে। একে জলোচ্ছ্বাস বলে। অনেক সময় জলোচ্ছ্বাস উপকূলীয় অঞ্চলের সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়।



চিত্র ৬.১৩: বাংলাদেশের মানচিত্র (দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরসহ)

বন্যা: বন্যা বাংলাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতি বছরই কোনো না কোনো অঞ্চলে বন্যা দেখা যায়। বাংলাদেশসহ হিমালয়ের দক্ষিণ অংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ বৃষ্টির পানি গড়িয়ে নিচের দিকে সমুদ্রের দিকে যায়। এভাবে নদীর সৃষ্টি হয়। হিমালয় অঞ্চলে শুরু হওয়া এরকম অনেক নদী ভূটান, নেপাল ও ভারত হয়ে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। বর্ষাকালে যখন এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তখন এ নদীগুলো এ বিপুল পরিমাণ বৃষ্টির পানি তাড়াতাড়ি বয়ে নিতে পারে না। তাই নদীর দু'কূল ছাপিয়ে পানি ফসলের ক্ষেত, বাড়িঘর, শহর ও গ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এটাই বন্যা।



চিত্র ৬.১৪: বাংলাদেশের নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল

বাংলাদেশের বৃহৎ নদীগুলোর উৎপত্তিস্থল ও গমন পথসহ মানচিত্রটির দিকে তাকালে বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা যাবে। বাংলাদেশের তিনটি বৃহৎ নদী পদ্মা, যমুনা ও মেঘনাসহ বেশিরভাগ নদী ভারতের মধ্য দিয়ে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ভারতে পদ্মা গঙ্গা নামে, যমুনা ব্রহ্মপুত্র নামে এবং মেঘনা বরাক, সুরমা ও কুশিয়ারা নামে পরিচিত। বর্ষাকালে এ নদীসমূহ চীনের তিব্বত, নেপাল, ভূটান ও ভারতের বৃষ্টি থেকে প্রাপ্ত পানি নদীগুলো দিয়ে বাংলাদেশে আসে, এজন্য দেখা যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, মেঘালয় বা আসামে বন্যা হলে কিছু দিন পরে ঐ বন্যার পানি বাংলাদেশে প্রবেশ করে বন্যার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ বা নদীতে পলি জমার কারণেও পানি দ্রুত নেমে যেতে পারে না। ফলে বন্যা দেখা যায় বা দীর্ঘায়িত হয়।

জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কিত অনুসন্ধান

প্রত্যেক দেশ বা অঞ্চলের জলবায়ুর একটি স্বাভাবিক রূপ রয়েছে। তেমনি বাংলাদেশের জলবায়ুরও একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। কিন্তু বাংলাদেশের জলবায়ু নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত বেশ কিছু অস্বাভাবিকতা সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। জলবায়ুর এরূপ অস্বাভাবিক প্রবণতার কারণ কী?

অনুসন্ধান ৬.৯: গ্রিন হাউস প্রভাব।

অনুসন্ধান আমন্ত্রণ

আমরা তাপ কোথা হতে পাই? পৃথিবীতে তাপের প্রধান উৎস কী? পৃথিবীতে তাপ কেন প্রয়োজন? পৃথিবী কীভাবে তাপ ধরে রাখে? পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ কী?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে। বায়বীয় উপাদানগুলোর কোন কোনটি তাপ শোষণ করে বা ধরে রাখতে পারে। বায়বীয় উপাদানগুলোর তাপ ধরে রাখার বিষয়টি আমরা কীভাবে পরীক্ষা করতে পারি? চিন্তা করুন ও সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে পরিকল্পনা করুন। স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে বরফ রেখে তা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিয়ে সূর্যালোকে রাখলে কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি

১. নিচের ছকটি খাতায় তুলুন।

সময় (মিনিট)	স্বচ্ছ প্লাস্টিকে ঢাকা বরফ ভর্তি গ্লাসের বরফ গলনের মাত্রা	স্বচ্ছ প্লাস্টিক বিহীন বরফ ভর্তি গ্লাসের বরফ গলনের মাত্রা
---- মিনিট		
---- মিনিট		
---- মিনিট		

২. দুইটি গ্লাসে ২/৩ টুকরো করে বরফের টুকরো রাখুন।

৩. একটি গ্লাসকে প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখুন।

৪. প্লাস্টিকে ঢাকা এবং প্লাস্টিক বিহীন বরফভর্তি গ্লাস দুটোকে সূর্যালোকে রাখলে, কোন গ্লাসের বরফ আগে গলবে? গ্লাস দুটোকে সূর্যালোকে রাখুন।

৫. এবার দুই গ্লাসের বরফ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পর্যবেক্ষণযোগ্যভাবে গলন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

৬. কোন গ্লাসের বরফ আগে গলছে তা পর্যবেক্ষণ করুন।

ধারণা গঠন

প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখা গ্লাসের বরফ খন্ডগুলো কেন প্লাস্টিক বিহীন বরফ খন্ডের আগে গলছে? স্বচ্ছ প্লাস্টিক বরফ গলন কী ভূমিকা রেখেছে? প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাচের বিকার ব্যবহার করলে ফলাফল কীভাবে হবে? পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে এই পরীক্ষণের মিল কোথায়?

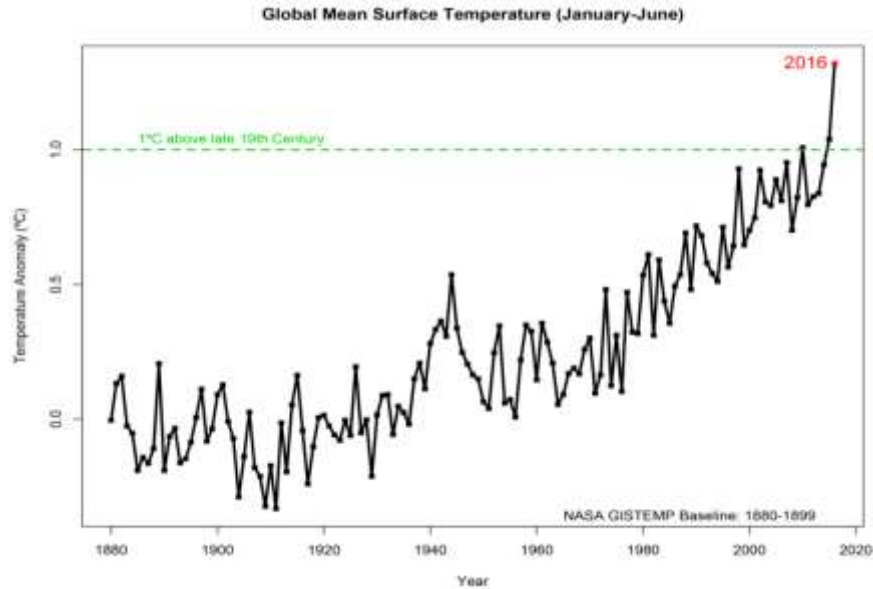
ধারণা প্রয়োগ

আমরা জানলাম, স্বচ্ছ কোন কাচপাত্রের ভেতর সূর্যালোক প্রবেশ করলে তা পাত্রের ভেতরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। তাহলে, যেসকল অঞ্চলে/দেশে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় না, তারা কীভাবে ফসলের চাষ করতে পারে ?

ধারণা পরিবর্তন

জলবায়ুর পরিবর্তন

ইতোমধ্যেই আপনারা জেনেছেন যে, জলবায়ু হলো কোনো স্থানের বহুদিনের আবহাওয়ার গড় বা সামগ্রিক অবস্থা। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ। আমরা জানি যে, বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে ও তেমন শীত পড়ে না। শীতকাল বেশ ছোট, সাধারণত পৌষ ও মাঘ এ দু'মাস শীত পড়ে। তারপর শীত কমে গিয়ে ধীরে ধীরে আবহাওয়া উষ্ণ হতে থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ বেশ গরম পড়ে। এ দু'মাসকে আমরা গ্রীষ্মকাল বলি। বৈশাখ মাসে প্রতি বছরই কালবৈশাখী দেখা যায়। আষাঢ়ের শুরু থেকে বৃষ্টি শুরু হয় অর্থাৎ বর্ষাকাল শুরু হয়। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বেশ গরম ও বৃষ্টি পড়ে। তারপর আবার আবহাওয়া ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং পৌষ মাসে শীত ফিরে আসে। এটাই হলো বাংলাদেশের জলবায়ুর স্বাভাবিক রূপ। বছরের পর বছর মোটামুটিভাবে এরকমই আমরা দেখে থাকি। জলবায়ুর এ স্বাভাবিক প্রবণতার পরিবর্তন দেখা দিলে তাকে জলবায়ুর পরিবর্তন বলতে পারি। কোনো স্থানের জলবায়ু সহসা পরিবর্তন হয় না। সেক্ষেত্রে, আবহাওয়ার উপাদানগুলোর উল্লেখযোগ্য স্থায়ী পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে দেখতে পেয়েছেন যে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা এভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রাও ক্রমশ বাড়ছে। নিচে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার পরিবর্তনের লেখচিত্র থেকে জলবায়ু পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পারি।

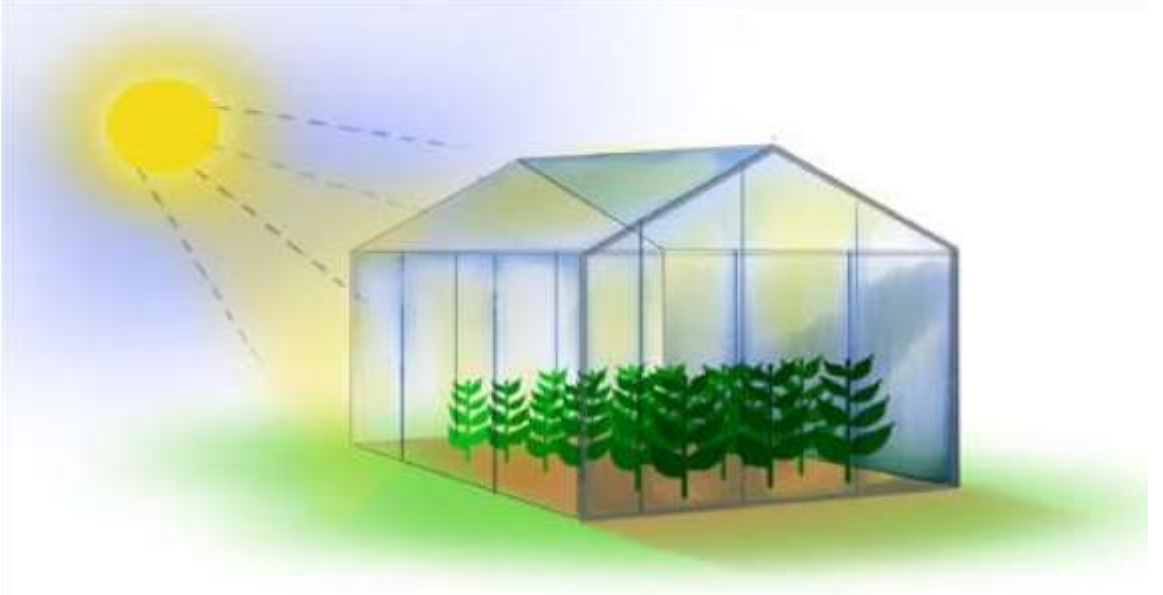


চিত্র ৬.১৫: পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার পরিবর্তন

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। আপনারা জানেন যে, জীব শ্বসন কাজে বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। আবার উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে খাদ্য তৈরি করে এবং অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। এভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ একই থাকে। কিন্তু ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে কলকারখানা ও যানবাহনে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো হচ্ছে। এসব জ্বালানি পোড়ানো থেকে উৎপন্ন কার্বন-ডাই অক্সাইড কোনোভাবে ব্যয় বা শোষিত হচ্ছে না, ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কার্বন-ডাই অক্সাইড বেড়ে গেলে কেন তাপমাত্রা বাড়ছে?

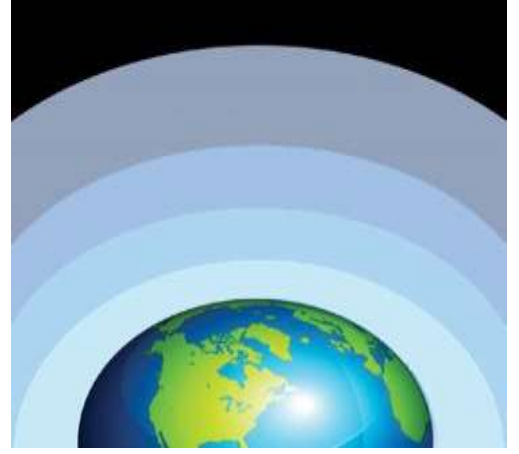
পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ বোঝা যায় গ্রিন হাউজে তাপমাত্রা কীভাবে বেশি থাকে তা বুঝলে। শীতপ্রধান দেশে তীব্র শীতে গাছপালা টিকে থাকতে পারে না। তীব্র শীতে শাক-সবজি ফলানোর জন্য কাচের ঘর তৈরি করা হয় যাকে গ্রিন হাউজ বলা হয়। ‘গ্রিনহাউজ’ মূলত কাচের ধর্মের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সূর্যের আলো কাচের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে পারলেও দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো কাচ বেধ করে বের হতে পারে না। শীতকালে অল্পসময় যখন রোদ থাকে, তখন বিকিরণ পদ্ধতিতে সূর্যের আলো ও তাপ/কাচ ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে ও ঘরের বায়ু, মাটি ও গাছকে উত্তপ্ত করে। এতে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সূর্যের আলো কাচের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে এবং ঘরের বায়ু, মাটি ও গাছ প্রভৃতি কর্তৃক শোষিত হয়। ফলে, আলো দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লাভ করে যা কাচ বেধ করে বাইরে বের হতে পারে না। এই কারণে গ্রিনহাউজের ভিতরটা দিন-রাত গরম থাকে এবং ভেতরের শাক-সবজি বেঁচে থাকে। কাচের ঘরের ভেতরে এভাবে তাপ থেকে যাওয়ার বিষয়টিকে গ্রিন হাউজ ইফেক্ট বা প্রভাব বলে (Callister, ২০০৬)।



চিত্র ৬.১৬: একটি কাচের ঘর, তার ভেতরে ছোট গাছপালা, উপর থেকে সূর্যের আলো পড়ছে

পৃথিবীটাকে একটি গ্রিন হাউজের মতো ধরা যায়। পৃথিবীর চারদিক ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। এ বায়ুমণ্ডলে আছে কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন আর জলীয়বাষ্প যেগুলো গ্রিন হাউজের কাঁচের মতো কাজ করে। এরা সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসতে কোনো বাধা দেয় না, ফলে সূর্যের তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। কিন্তু

এরা পৃথিবীকে ঢালের মতো ঢেকে রেখে উত্তপ্ত পৃথিবী থেকে তাপকে বিকিরিত হয়ে চলে যেতে বাধা দেয়। ফলে পৃথিবী রাতের বেলায়ও গরম থাকতে পারে। এসব গ্যাসকে গ্রিন হাউজ গ্যাস বলে। গ্রিনহাউজ গ্যাসগুলোর মধ্যে প্রায় অর্ধেক হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড। গ্রিনহাউজ গ্যাসগুলোর মধ্যে গত শতাব্দীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ২৫%, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ১৯% এবং মিথেনের পরিমাণ ১০০% বেড়েছে (চতুর্থ সমীক্ষাপত্র, আইপিসিসি) যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অন্যতম প্রধান কারণ।



চিত্র ৬.১৭: পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডল

কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন আর জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলে থাকা জীবকুলের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, কারণ এসব গ্যাস না থাকলে পৃথিবী থেকে তাপ বিকিরিত হয়ে মহাশূন্যে চলে যেত আর পৃথিবী ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে পড়ত। এখন প্রশ্ন হলো, আশীর্বাদ আবার কীভাবে সমস্যা হলো? সমস্যা হলো বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায়। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড বেশি থাকায় এরা বেশি বেশি তাপ ধরে রাখতে পারছে। তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া।

অনুসন্ধান ৬.১০: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল শনাক্ত করা।

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বাভাবিক ধরনে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। কোন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবণতা যেমন বেড়েছে তেমনি এগুলোর তীব্রতাও বেড়েছে। এসকল দুর্যোগের ফলে বাংলাদেশের কোন কোন এলাকা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? বাংলাদেশের মানুষ এ ধরনের প্রতিকূল অবস্থায় কীভাবে টিকে আছে? প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিরূপ পরিস্থিতির প্রভাব মোকাবিলায় কী কী কৌশল গ্রহণ করা যায়?

অনুসন্ধান কাজ

পরিকল্পনা প্রশ্নয়ন: বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান কীরূপ? ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনা করে এর বিভিন্ন এলাকার উপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ফলাফল কী কী হতে পারে? চিন্তা করুন ও সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন। অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখানো হয়েছে এমন একটি মানচিত্র ব্যবহার করে আমরা বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল শনাক্ত করতে পারি। প্রয়োজনে ইন্টারনেট ও বিভিন্ন তথ্য পুস্তক থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

উপকরণ: অঞ্চলভিত্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ চিহ্নিত বাংলাদেশের মানচিত্র

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি

১. নিচের ছকটি খাতায় তুলুন।

দুর্যোগের নাম	অঞ্চল/ এলাকা	কারণ	ফলাফল/ সমস্যা সমূহ	ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ফলাফল
খরা				
বন্যা				
জ্বলোচ্ছাস				
আকস্মিক বন্যা				

২. মানচিত্রটি ব্যবহার করে অঞ্চল/এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ শনাক্ত করে ছকে লিখুন।
৩. দুর্যোগগুলো কী কী কারণে সংঘটিত হচ্ছে? সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে লিখুন।
৪. দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো লিখুন।
৫. জলবায়ু পরিবর্তনের এই ধারা বজায় থাকলে ভবিষ্যতে কী কী সম্ভাব্য সমস্যা হতে পারে তা পূর্বানুমান করুন ও ছকে লিখুন।

ধারণা গঠন

পৃথিবীতে দেশে দেশে পূর্বেও এরূপ বহু দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছে, তাহলে বর্তমানে সংঘটিত দুর্যোগের সাথে পূর্বের দুর্যোগসমূহের পার্থক্য কোথায়? পার্থক্যের কারণ কী?

ধারণা প্রয়োগ

বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের অনেক প্রভাব প্রত্যক্ষ শিকার হচ্ছে। এশিয়ার দেশ (মালদ্বীপ/ইন্দোনেশিয়া) প্রভৃতি কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্ধন

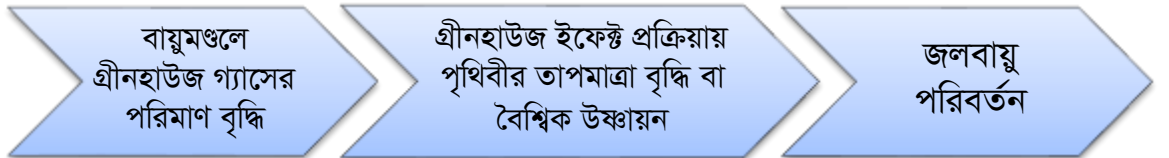
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা গত ১৪ বছরে (১৯৮৫-১৯৯৮) মে মাসে ১° সে. এবং নভেম্বর মাসে ০.৫° সে. বৃদ্ধি পেয়েছে, মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি ৮৩০,০০০ হেক্টর আবাদি জমির ক্ষতি করেছে, গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে, বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়েছে, বজ্রপাতে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিক বন্যায় আগে যেখানে দেশের ২৫% থেকে ৩০% ক্ষতিগ্রস্ত হতো, তা এখন বেড়ে ৬৮% পৌঁছেছে। এতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ যেমন বাড়ছে তেমনি জীববৈচিত্র্যও হুমকির মুখে পড়ছে। বেড়েছে শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতা। জানুয়ারি ২০০৭ সালে উত্তরাঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৫° সে. যা বিগত ৩৮ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। আবার, ২০০৯ সালে যশোরে বিগত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২.০৮° সে. রেকর্ড করা হয়। এতে ঐসকল অঞ্চলে তীব্র ঠাণ্ডা ও গরমে মানুষ

বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং প্রাণহানি ঘটে। আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো স্বল্প সময়ের মধ্যে বৃষ্টিপাতের তীব্রতার বৃদ্ধি। হঠাৎ ভারি বৃষ্টিপাতে আকস্মিক বন্যা ও দেখা যায়। ২৮ জুলাই ২০০৯ তারিখে ঢাকায় ৩৩৮ মিমি বৃষ্টিপাত হয়, যা গত ৬০ বছরের মধ্যে ৬ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২৯০ মিমি বৃষ্টিপাতের রেকর্ডকে অতিক্রম করে। একই বছর ৪০৮ মিমি বৃষ্টিপাত হয়। এতে ভূমিক্ষবসের কারণে অনেক মানুষ মারা যায়। অন্যদিকে, ২০০৯ সালে বর্ষাকালে (জুন-আগস্ট) ২১% বৃষ্টিপাত কম হয়। এতে উত্তরাঞ্চলে এমনকি উপকূলীয় অঞ্চলেও খরা দেখা যায়। (National Plan for Disaster Management, ২০১০-২০১৫, Disaster Management Bureau, Disaster Management & Relief Division, April ২০১০)

লক্ষণীয়, বাংলাদেশে এপ্রিল মাসকে উষ্ণতম মাস হিসেবে গণ্য করা হলেও বিগত কয়েক বছর ধরে মার্চ মাসে বেশি গরম পড়ছে এবং বঙ্গোপসাগরে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হচ্ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানির আয়তন বেড়ে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে (গড় তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে) এবং ফলস্বরূপ সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়তে থাকলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ বিশ্বের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে যাবে। এছাড়া তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বিরূপ আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশি বেশি ঘটতে দেখা যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ

আমরা জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ জানলাম। উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিচের প্রবাহ চিত্রটি আঁকতে পারি।



উপরের প্রবাহ চিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি। তাহলে কীভাবে আমরা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে পারি? জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাব বা ঝুঁকি (Risk) (কোন আপদ ঘটার সম্ভাবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভাবনা এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক) মোকাবিলা করার জন্য আমরা দুইটি কৌশল অবলম্বন করতে পারি। একটি হলো- জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানো (Mitigation to climate change) অপরটি হলো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন (Adaptation to climate change)।

জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানো (Mitigation to climate change):

আমরা পূর্বেই জেনেছি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। সুতরাং বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নির্গমনের পরিমাণ কমিয়ে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে পারি। এজন্য, জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার সীমিত করে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে আমরা কার্বন ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধি হ্রাস করতে পারি। তাছাড়া, দৈনন্দিন জীবনে শক্তির ব্যবহার কমিয়ে এবং বিলাসী জীবন-যাপন না করে সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়েও আমরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কমাতে পারি। এই সকল কর্মকাণ্ড দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস করতে সহায়তা করবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন (Adaptation to climate change):

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থা এবং বিপদাপন্নতার (Vulnerability) মাত্রা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তবে জলবায়ুর যে পরিবর্তন ইতিমধ্যে সাধিত হয়েছে তার সাথে আমাদের খাপ খাওয়াতে হবে। পরিবর্তিত জলবায়ুতে বেঁচে থাকার জন্য গৃহীত কর্মসূচিই হলো 'জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাওয়ানো বা অভিযোজন'। অভিযোজনের উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি কমানো ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেমন-

কাঠামোগত অভিযোজন (Structural Adaptation): বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধক্ষম বাড়ি ও মাছ ধরার নৌকার কাঠামো উন্নয়ন এবং স্থায়ীত্বশীল বাঁধ নির্মাণ করে; বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে; রাস্তার নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন; নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ মানানসই অবকাঠামো নির্মাণ করে; বিদ্যালয় ও কলকারখানার কাঠামো উন্নয়ন করে অভিযোজিত হওয়া।

অ-কাঠামোগত অভিযোজন (Non-structural Adaptation): ঝুঁকিপূর্ণ স্থান থেকে অন্যত্র চলে গিয়ে; পেশা ও জীবন যাপনের ধরন পরিবর্তনের মাধ্যমে অভিযোজিত হওয়া।

নিবৃত্তিমূলক অভিযোজন (Anticipatory Adaptation): বন্যার আগেই শুকনো খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

প্রতিক্রিয়ামূলক অভিযোজন (Reactive Adaptation): লোনা এলাকায় লবণাক্ত সহায়ক ধান ও খরাকবলিত এলাকার জন্য খরা সহায়ক বিভিন্ন শস্যের প্রজাতি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও আবাদ করে; বিপুল পানীয় জলের জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে অভিযোজিত হওয়া যায়।

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে বিশ্বাঙ্গনে সবচেয়ে আলোচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি। উন্নত দেশগুলোর মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ জলবায়ু পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশসহ বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশ ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বেশ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তবে আশার কথা হচ্ছে, বর্তমানে সবদেশ বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনরোধে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ, আইন প্রণয়ন করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হ্রাসে তাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখছে। আমাদেরকেও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধগুলো অর্জন করতে হবে এবং অভিযোজিত হওয়ার কৌশলগুলো রপ্ত করতে হবে। অন্যথায়, আমরা অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবো।

অধ্যায় ৭

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি

এই অধ্যায়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় এসেছে তথ্য প্রযুক্তি কী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য আছে কিনা, কীভাবে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদান করা যায়, আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার কীরূপ, তথ্যপ্রযুক্তি সাক্ষরতা কী-এই বিষয়গুলো।

অনুসন্ধান ৭.১: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কী?

অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করেছে। প্রযুক্তি ছাড়া মানব জীবন অচল। সকালে এলার্ম ঘড়ির শব্দে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত প্রত্যেক কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জড়িত। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আসলে কী?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার চিহ্নিত করা দরকার। এটা আপনারা কীভাবে করতে পারেন? এটা কীভাবে করা যেতে পারে তা একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি

- ১। একজন শিক্ষার্থীকে থার্মোমিটার দিয়ে নিজের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে বলুন। কত তাপমাত্রা উঠেছে লিখতে বলুন। ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নির্ণয় করুন।
- ২। শিক্ষার্থীদের ঘড়ি দেখে সময় নির্ণয় করতে বলুন। ঘড়িতে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লিখতে বলুন।
- ৩। শিক্ষার্থীদের ব্যাটারি দেখিয়ে এর মধ্যে কোন ধরনের শক্তি সঞ্চিত থাকে তা লিখতে বলুন। কীভাবে এটি বৈদ্যুতিক বাত্ব জ্বালাতে সাহায্য করে তা বলতে বলুন।
- ৪। ব্যাটারি ও তার ব্যবহার করে বাত্বটি চালু করুন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন এখানে কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহৃত হয়েছে?

ধারণা গঠন

এলার্ম ঘড়ি, থার্মোমিটার, ব্যাটারি, বিভিন্ন ছবি সম্বলিত পোস্টার দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের একেক জনের কাছে প্রশ্ন করুন এবং কোথায় কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহৃত হচ্ছে তা বলতে বলুন। ছবি থেকে প্রযুক্তিগুলো নির্ণয় করতে বলুন।

অনুসন্ধান ৭.২: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য

অনুসন্ধান আমন্ত্রণ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্নভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয় দুটি কি একই রকম? নাকি এদের মধ্যে কোন পার্থক্য রয়েছে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলো উদ্ভাবনে বিজ্ঞানকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়? অন্যের সাথে আলোচনা করে কাজটি কীভাবে করা যায় তার একটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

- ১। থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জ্ঞান কীভাবে কাজে লাগে, তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।
- ২। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, তারা যোগাযোগের জন্য মোবাইল বা টেলিফোন ব্যবহার করেছে কিনা? মোবাইল বা টেলিফোন বিজ্ঞান নাকি প্রযুক্তি?
- ৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনার মাধ্যমে খাতায় লিখতে বলুন।

ধারণা গঠন: থার্মোমিটারের সাহায্যে কারও শরীরের তাপমাত্রা দেখে কীভাবে বোঝা যায় তার ওষুধ খেতে হবে কি না? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি পরস্পর নির্ভরশীল? কীভাবে?

ধারণা প্রয়োগ: বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং প্রযুক্তি হলো কৌশল বা যন্ত্র। বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে আর কী ধরনের পার্থক্য রয়েছে?

অনুসন্ধান ৭.৩: বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ

অনুসন্ধান আমন্ত্রণ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারে আমাদের জীবন ও জীবিকা অর্জন অনেক সহজ হয়েছে। জীবনে চলার পথে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন, কাগজ, কলম, রেডিও, টেলিভিশন, লাঙল, ট্রাক্টর, নতুন নতুন ঔষধ, যন্ত্রপাতি, এক্সরে, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কখনও কি ভেবে দেখেছ এগুলো কীভাবে কাজ করে? আমাদের জীবনকে এগুলো কীভাবে সহজ করেছে?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এটা আপনারা কীভাবে করতে পারেন? এটা কীভাবে করা যেতে পারে তা একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

- ১। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজের খাতায় নিজের নাম লিখতে বলুন। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন নাম লেখার খাতা ও কলম কীভাবে তাদের শিক্ষাকে সহজ করেছে? বিভিন্ন ছবি সম্বলিত পোস্টার না দেখে শুধু যন্ত্রের নাম শুনে তারা সঠিকভাবে বুঝতে পারত কি না?

- ২। জমি চাষ করার জন্য কৃষকেরা বর্তমানে কী কী ব্যবহার করে তা জিজ্ঞাসা করুন। ভালো ফসল লাভের জন্য গাছের খাদ্য হিসেবে কৃষকেরা কী কী ব্যবহার করে বলে মনে হয় তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।
- ৩। শিক্ষার্থীরা যে পোশাক পরে আছে তা কীভাবে আসল তা তাদের বলতে বলুন। ঘর-বাড়ি তৈরির জন্য কী কী উপকরণ লাগে তা বলতে বলুন। এগুরো কেন প্রয়োজন তা জিজ্ঞাসা করুন?
- ৪। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ ইদানিংকালে অসুস্থ ছিল কিনা তা বলতে বলুন। অসুস্থ থাকলে কীভাবে সে সুস্থতা লাভ করল তা সকেরর উদ্দেশ্যে বলতে বলুন। জ্বর আসলে ডাক্তার কীভাবে জ্বর পরিমাপ করে তা জিজ্ঞাসা করুন।

ধারণা গঠন

টেলিভিশন, ওভার হেড প্রজেক্টর, ট্রাস্টর, ধানমাড়াইয়ের যন্ত্র, কীটনাশক, গার্মেন্টস, চিনিকল, কাগজকল, এক্সরে, ইসিজি, পেসমেকার ইত্যাদির ছবি সম্বলিত পোস্টার দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের একেক জনকে প্রশ্ন করুন ও বলতে বলুন এগুলোর কোনটি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কীভাবে এটি আমাদের জীবনকে সহজ করেছে।

ধারণা প্রয়োগ

আলোচনা করুন-

- ১। শিক্ষা ক্ষেত্রে আর কোথায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ রয়েছে।
- ২। কৃষি ক্ষেত্রে আর কোথায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।
- ৩। শিল্প ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ কীভাবে আমাদের কাজে লাগে।
- ৪। রোগ হতে সুস্থতার জন্য আর কোথায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান রয়েছে।

অনুসন্ধান ৭.৪: তথ্য প্রযুক্তি কী?

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ

আমাদের জীবনে তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজ করেছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা কীভাবে তথ্য পাই?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: প্রাচীনকালে দূরের মানুষকে তথ্য জানানোর জন্য সশরীরে যেতে হত। বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই যোগাযোগ করা যায়। যোগাযোগ ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির কী গুরুত্ব রয়েছে? তথ্যের উৎস কী? একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। আলোচনার মাধ্যমে একটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

- ১। একজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন, দূরে থাকা আত্মীয় স্বজনের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করে।
- ২। স্কুলের সময়সূচি, পরীক্ষার সময়সূচি আমরা কোথা থেকে পাই।
- ৩। প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা কীভাবে অন্যকে তথ্য জানাতে পারি, তা শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন।

ধারণা গঠন

আজকের পাঠদানের বিষয়, স্কুলে অনুপস্থিত একজন শিক্ষার্থীকে কীভাবে জানানো যায়? আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য আমরা কীভাবে পেতে পারি?

ধারণা প্রয়োগ

চিঠি, মোবাইল, টেলিফোন, সংবাদপত্র ইত্যাদি থেকে আমরা তথ্য পেতে পারি। আর কোন কোন উৎস থেকে তথ্য পাওয়া যায়?

অনুসন্ধান ৭.৫: তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের উপায় কী?

অনুসন্धानে আমন্ত্রণ: তথ্য আমাদের নতুন কিছু শিখতে ও বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। কিন্তু এই তথ্য আমরা কীভাবে পেতে পারি? আর এই তথ্য কীভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে? কীভাবে আমরা আমার জানা তথ্য অন্যের কাছে পৌঁছাতে পারি? কখনো ভেবে দেখেছেন?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য পেয়ে থাকি। কিন্তু তথ্য পাওয়ার উৎস নির্ভরযোগ্য হতে হয়। এই তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করে সংরক্ষণ করলে তা আমরা অন্যের সাথে বিনিময় করতে পারি। এটা আপনারা কীভাবে করতে পারেন? কীভাবে করা যেতে পারে তা অন্যের সাথে আলোচনা করুন। কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

- ১। শিক্ষার্থীদেরকে আজকের তারিখ, বার, আবহাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। কোথা থেকে তারা এ সম্পর্কে জেনেছে তা বলতে বলুন।
- ২। কোন ধরনের তথ্য আমাদের জানা দরকার সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করুন।
- ৩। প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা সেগুলোকে কীভাবে সংরক্ষণ করে তা বলতে বলুন। বিভিন্ন মোবাইলে যে সব গান থাকে তা কীভাবে সংরক্ষিত থাকে তা জিজ্ঞাসা করুন।
- ৪। কোন একটি খুশির সংবাদ শিক্ষার্থীরা কীভাবে তার বিদেশে থাকা মামাকে জানাতে পারবে তা জিজ্ঞাসা করুন। আজকের ক্লাসে পঠিত বিষয় কীভাবে শিক্ষার্থীরা অনুপস্থিত বন্ধুকে জানাতে পারে তা বলতে বলুন।

ধারণা গঠন

শিক্ষার্থীদেরকে চারটি দলে ভাগ করে চারটি বিষয় সম্পর্কে জেনে আসতে বলুন। পরদিন প্রত্যেক দলকে তাদের প্রাপ্ত তথ্য অন্য দলকে জানাতে বলুন। কীভাবে তারা এই কাজগুলো করবে?

ধারণা প্রয়োগ

আলোচনা করুন-

- ১। পর্যবেক্ষণ, কম্পিউটার, মোবাইল, ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।
- ২। প্রয়োজনীয় বিষয় চিহ্নিত করে সঠিক তথ্য গ্রহণ করতে পারি।
- ৩। সংগৃহীত তথ্য মেমোরি কার্ড, সিডি, খাতায় লিখে বা ছবি তুলে সংরক্ষণ করতে পারি।

৪। সরাসরি কথা বলে, মোবাইল বা টেলিফোনের মাধ্যমে, চিঠি বা ইমেইলের মাধ্যমে বা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্য বিনিময় করতে পারি।

অনুসন্ধান ৭.৬: তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করি কোন কোন ক্ষেত্রে?

অনুসন্ধান আমন্ত্রণ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করি। কোন কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: শিক্ষা, ব্যবসা, যোগাযোগ, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কীভাবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে? অন্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

- ১। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিয়ে, প্রত্যেকটি দলকে আমাদের জীবনে কোন একটি ক্ষেত্রে (শিক্ষা, ব্যবসা, যোগাযোগ, চিকিৎসা)- তথ্য প্রযুক্তি কীভাবে ব্যবহার করি, তা আলোচনা করতে বলুন।
- ২। আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা প্রাপ্ত তথ্যগুলো খাতায় লিখবে।
- ৩। প্রাপ্ত তথ্যগুলো অন্য দলের সাথে শেয়ার করবে।

ধারণা গঠন

দূরে থাকা বা বিদেশে থাকা আত্মীয় স্বজনের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করি? আবহাওয়ার পূর্বাভাস, পরীক্ষার ফলাফল কীভাবে পাওয়া যায়?

ধারণা প্রয়োগ

কম্পিউটারে আমরা লিখতে পারি, ছবি আঁকতে পারি, ইন্টারনেট ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে পারি, বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট যেতে পারি। দেশ-বিদেশের খবর জানতে পারি। আর কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারি?

অনুসন্ধান ৭.৭: তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা কী ও কেন প্রয়োজন

অনুসন্ধান আমন্ত্রণ

আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য কীভাবে পেতে পারি? তথ্য জানা আমাদের দরকার কেন?

অনুসন্ধান সম্পাদন

পরিকল্পনা প্রণয়ন: কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আমরা একজন লোককে তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষর বলতে পারি তা একে অন্যের সাথে আলোচনা করুন। শ্রেণি শিখনে কাজটি কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করুন।

সম্ভাব্য কার্যপ্রণালি:

- ১। ইভা গতকাল স্কুলে আসতে পারে নি। তাই সে তার আব্বুর ফোন নিয়ে তার এক বন্ধুকে কল দিয়ে সে পরদিনের পড়াটা জেনে নিল এবং সে পরদিন পড়াটা প্রস্তুত করে ক্লাসে আসল।
- ২। জোবায়ের টেলিভিশনে পরিবেশ সচেতনতামূলক একটি অনুষ্ঠান দেখে শিখল যে যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলতে নেই। এতে পরিবেশ দূষিত হয়। তাই আজ সে চিপস খেয়ে চিপসের প্যাকেট রাস্তায় না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় (ডাস্টবিন) ফেলল।
- ৩। ঘটনা দুটির সাথে তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতার কোন মিল আছে কিনা তা শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলুন।
- ৪। তারপর তাদের মতামত উপস্থাপন করতে বলুন।

ধারণা গঠন

ইভা এবং জোবায়ের দুজনকেই কী আমরা তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষর বলতে পারি? কেন তাদের দুজনকেই তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষর বলতে পারি?

ধারণা প্রয়োগ

ইভা এবং জোবায়ের তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই তথ্য নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এজন্য দুজনকেই তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষর বলা যায়। তাহলে আমরা কী বিবেচনায় কোন একজন লোককে তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষর বলতে পারি?

ধারণা পরিবর্তন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মানুষ দিনে দিনে তার কাজের ধরন বদল করে থাকে। বলতে পারেন এ কাজের ধরন বদলের পিছনে কার ভূমিকা বেশি? আপনি কি খেয়াল করেছেন আজকাল অনেক জায়গায়ই গরু দ্বারা টানা লাঙল দিয়ে আর জমি চাষ করা হয় না? লাঙলের বদলে ব্যবহার হচ্ছে ট্রাক্টর। ধান থেকে চাল করতে আজ আর টেকি ব্যবহার হচ্ছে না। এমনি বদলে যাচ্ছে সব কাজের ধরন। মানুষ বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ায় আজ তেমন অসাধ্য মনে করছে না। এ পরিবর্তন মূলত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে।

প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত ঘটছে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ও পরিবর্তন। আর এসব ঘটনা ও পরিবেশের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের কারণ জানার জন্য মানুষ নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন জ্ঞান। বিজ্ঞানের এই জ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে ঘটা বিভিন্ন ঘটনাবলিকে ব্যাখ্যা করা যায়।

বিজ্ঞান হল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত বা পরীক্ষালব্ধ তথ্যপ্রমাণ দ্বারা সমর্থিত জ্ঞান যার মাধ্যমে প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে ঘটা ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। যার মধ্যে নিম্নোক্ত ধাপসমূহ রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ

ধাপসমূহ	ধাপসমূহের ব্যাখ্যা
পর্যবেক্ষণ	আমাদের চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার মধ্য দিয়ে আমরা প্রাকৃতিক ঘটনা কিংবা নিজের পছন্দের কোনো বিষয় সম্পর্কে কৌতুহল বোধ করি।
প্রশ্নকরণ	যখন আমরা কোনো কিছু দেখি, শুনি বা পড়ি আমাদের মনে এ সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন আসতে পারে। এ সকল প্রশ্ন থেকে এমন একটি প্রশ্ন বেছে নেই যার উত্তর পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব।
অনুমান	পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে প্রশ্নটির সম্ভাব্য উত্তর ঠিক করি এবং খাতায় লিখি। এটিই অনুমান।
পরীক্ষণ	অনুমানটি সঠিক কি না তা যাচাই করার জন্য একটি পরীক্ষার পরিকল্পনা করি। পরীক্ষাটি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করি। পরীক্ষাটি সম্পাদন করি। তথ্য সংগ্রহ করে পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করি।
সিদ্ধান্ত গ্রহণ	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করি এবং ফলাফলের সারসংক্ষেপ করি। ফলাফলটি অনুমানের সাথে মিলেছে কিনা তা যাচাই করি।
বিনিময়	প্রাপ্ত ফলাফল ও সিদ্ধান্ত অন্যের সাথে বিনিময় করি।

অন্যদিকে, আমরা আমাদের সুবিধামতো প্রকৃতিকে পরিবর্তন করি। এ পরিবর্তন হয় মূলত আমাদের টিকে থাকার প্রয়োজনে, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য। যেমন, ফসল ফলাবার জন্য দরকার হয় জমি চাষ করা। আমাদের প্রয়োজনে প্রকৃতি ও পরিবেশকে পরিবর্তনে দরকার প্রযুক্তি। প্রযুক্তি হলো আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ। যেমন, জমি চাষের জন্য দরকার হয় লাঙল। কোনো জিনিসকে কাটা, আকৃতি পরিবর্তন করা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয়া প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজন হয় আমাদের হাত ও ইন্দ্রিয়সমূহকে বর্ধন করা। মানুষের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে পরিবর্তনের যেসব যন্ত্র, কৌশল উদ্ভাবিত হয় তা-ই প্রযুক্তি। মানব ইতিহাসের গোড়া থেকেই প্রযুক্তি ছিল, এখনো রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, হাতিয়ার বানানোর কৌশলকে মানবসভ্যতা বিকাশের প্রধান সাক্ষ্য বা প্রমাণ ধরা হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য কী?

আমরা জেনেছি, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান হলো বিজ্ঞান। অন্যদিকে, মানুষের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করার জন্য কৌশল, যন্ত্র এগুলো হলো প্রযুক্তি। মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করার জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দু'টোরই কেন্দ্রে রয়েছে প্রকৃতি।

প্রাচীনকালে প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে বিজ্ঞানের তেমন জ্ঞান অর্জন না করেই। যেমন মানুষ দেখেছে পাথরকে ঘষলে তা ধারালো হয়, সেটি দিয়ে কোনো কিছু কাটা যায়। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জ্ঞান দরকার হয়নি। তবে বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিজ্ঞান বিরাট ভূমিকা রাখছে। কারণ প্রকৃতি সম্পর্কে জানলে (অর্থাৎ বিজ্ঞান) প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা সহজ হয়ে যায়। যেমন বিজ্ঞানের

গবেষণায় জানা গেছে যে, উদ্ভিদ মাটি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে বাড়ে। মাটিতে নাইট্রোজেন কম থাকলে উদ্ভিদ কম বাড়ে। তাই উদ্ভাবিত হলো ইউরিয়া সার যার মাধ্যমে মাটিতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করা হয়। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রযুক্তির উন্নয়নের উপর বেশ নির্ভরশীল। যেমন অত্যাধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে আমরা জানতে পারছি ক্ষুদ্র অনুজীব সম্পর্কে। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও আমাদের জীবনে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একে অপরের উপর বেশ নির্ভরশীল।

প্রযুক্তি মানেই কি যন্ত্র?

আপনাদের মনে হতে পারে যে, প্রযুক্তি মানেই হলো বড় বড় যন্ত্র। আসলে তা কিন্তু নয়। আপনারা দেখেছেন কি কীভাবে গরুকে মাঠে বেঁধে রাখা হয়? একটি দড়ি দিয়ে ছোট একটা খুঁটার সাথে গরুকে বেঁধে রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে দড়ি ও খুঁটা দুটোই প্রযুক্তি। পাটের নরম আঁশ দিয়ে গরুকে বেঁধে রাখতে পারার কথা নয়। কিন্তু পাটের চিকন আঁশগুলোকে পাকিয়ে দড়ি বানানো হয়, যেটি অনেক শক্ত হয়। আবার গাছের ছোট ডাল মাটিতে পোঁতা খুব কঠিন। কিন্তু ডালটি একটু চোখা করলেই খুব সহজেই তা মাটিতে পোঁতা যায়। সুতরাং, প্রযুক্তি হতে পারে কোনো যন্ত্র, পদ্ধতি বা হাতিয়ার।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যাপক ব্যবহারে আমাদের জীবন ও জীবিকা অর্জনে অনেক সহজ হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তি ব্যবহারের নির্দেশকগুলো তুলে ধরা হলো—

শিক্ষা ক্ষেত্রে: কাগজ উদ্ভাবন শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। তারপর ছাপাখানা উদ্ভাবনের পর বই ছাপাতে পারার পর জ্ঞান বিস্তার আরো সহজ হয়েছে। সর্বশেষ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট উদ্ভাবন জ্ঞান আদান-প্রদানে অধিকতর সহজ হয়েছে। এছাড়া রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, ওভার হেড প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে।

যাতায়াতের ক্ষেত্রে: প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নৌকা তৈরি করে জলপথে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করত। পরবর্তীতে চাকা উদ্ভাবন হওয়ায় গরুচালিত, ঘোড়াচালিত গাড়িতে করে স্থালপথে মানুষ ও মালামাল পরিবহন সহজ হয়ে ওঠে। স্থালপথে বড় পরিবর্তন আসে স্টিম ইঞ্জিন উদ্ভাবনের পর। রেল ও



মোটরগাড়ি মানুষ ও মালামাল পরিবহনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জলপথেও ইঞ্জিনচালিত স্টিমার/জাহাজ অনেক দ্রুত ও সহজে পরিবহনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। সবশেষে আরেকটি বৈপ্লবিক

পরিবর্তন আসে অ্যারোপ্লেন উড্ডাবনের পর। এরপর মানুষ অনেক কম সময়ে আকাশ পথে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন শুরু করল।

কৃষি ক্ষেত্রে: লাঙল, কোদাল, নিড়ানি কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অনেক পুরনো ব্যবহার। বর্তমানে আমাদের দেশেও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে বর্তমানে ট্রাক্টর, মোটরচালিত নলকূপ, ধান মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার খুব দেখা যায়। তাছাড়া উচ্চফলনশীল ধান, বছরের বেশিরভাগ সময় ধরে সবজি চাষ এগুলোও প্রযুক্তির অবদান। কৃষিতে জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই প্রযুক্তি মানুষকে অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ, পোকামাকড় প্রতিরোধী এবং অধিক ফলনশীল উদ্ভিদ উৎপাদনে সহায়তা করছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে: নতুন নতুন ওষুধ, যন্ত্রপাতি, এক্স-রে, আল্ট্রাসোনোগ্রাম, ইসিজি, লেজার অপারেশন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন ও বদল, কৃত্রিম কিডনি, পেস মেকার, রোগ প্রতিরোধক টিকা বা ইনজেকশন ও বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক আবিষ্কার চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের নির্দেশক।

দৈনন্দিন জীবন ও বিনোদন: টিভি, ফ্রিজ, এয়ারকুলার, ভিসিআর, ডিভিডি, সিডি, স্বয়ংক্রিয় দরজা, ডিশ অ্যান্টেনা, লিফট, রিমোট কন্ট্রোল প্রযুক্তির উদ্ভাবন আমাদের জীবনমানকে করেছে অনেক উন্নত। এছাড়াও আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি। সাধারণ একটি উদাহরণ হলো পাট দিয়ে দড়ি তৈরি করা। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সরল যন্ত্র প্রযুক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে।

প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব

প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে নিরাপদ ও উন্নত করার পাশাপাশি নানারকম সমস্যাও সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা পুড়িয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করি কিন্তু এর ফলে বায়ুও দূষিত হয়। এই বায়ু দূষণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও এসিড বৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক অধিক পরিমাণে ব্যবহারের ফলে মাটি ও পানি দূষিত হয় যা জীবের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে ভয়াবহ প্রয়োগ হলো যুদ্ধের অস্ত্র তৈরি ও এর ব্যবহার। যেমন-বন্দুক, বোমা, ট্যাংক ইত্যাদি। অনেক সময় প্রযুক্তির ব্যবহার নেশায় পরিণত হয় যেটা আমাদের সময় অপচয়ের পাশাপাশি প্রযুক্তির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধও সংঘটিত হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তি

প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে তথ্য কী? আপনার ভাই বিদেশে থাকে। বিদেশ থেকে তিনি জানালেন যে, আগামী বুধবার তিনি দেশে আসছেন। এটা নিশ্চয় আপনার জন্য খুশির খবর। একইসাথে একটি দরকারি খবর। এরকম দরকারি বা অর্থবহ কোনো খবরই হলো তথ্য। সাধারণ অর্থে তথ্য হলো অর্থবোধক বাক্য, সংকেত, সংখ্যা বা সংখ্যার সমষ্টি। তথ্য হতে হলে একে অবশ্যই অর্থবহ হতে হবে।

প্রাচীনকালে দূরের মানুষকে তথ্য জানানোর জন্য সশরীরে যেতে হতো। কিছুদিন আগেও দূরের মানুষকে কোনো তথ্য জানানোর জন্য চিঠি লিখতে হতো। কিন্তু বর্তমানে কীভাবে বিদেশ থেকে খবর আসে? প্রযুক্তির কল্যাণে আরো সহজে মোবাইল, টেলিফোন বা ই-মেইলে খবর আসে। চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ই-মেইল সব কটিই তথ্য আদান প্রদানকে সহজ করেছে। এগুলোর সব কটিই তথ্য প্রযুক্তি। এই সব প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ সহজেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণেই মানুষ পুরো পৃথিবীটাকে এখন হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘুরছে। খুব সহজেই একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করেছে। এর ফলে কমেছে মানুষের শ্রম এবং সাশ্রয় হয়েছে সময়।

তথ্যের উৎস

সাধারণত যা থেকে তথ্য পাওয়া যায় তাকে আমরা বলি তথ্যের উৎস। যেমন বই, খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি। প্রকৃত অর্থে এরা তথ্যের উৎস নয়, এরা অনেকটা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এসব মাধ্যমে তথ্য আসে মানুষের কাছ থেকে—মানুষের গবেষণা থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে।

তথ্য জানা ও জানানোর গুরুত্ব

মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথ্য জানা দরকার হয়। তথ্য জেনে মানুষ তথ্যকে কাজে লাগাতে পারে। আপনারা হয়তো টেলিভিশনে একটি বিজ্ঞাপন দেখে থাকবেন। একজন জেলেকে মাছ ব্যবসায়ী বলছে যে, বাজারে মাছের দাম কম। জেলে যাতে তাকে কম দামে মাছগুলো বিক্রি করে। কিন্তু জেলে মোবাইলে ফোন করে জানে যে, বাজারে মাছের দাম ভালো। তখন জেলে মাছ ব্যবসায়ীকে বলে, দিন বদলাইয়া গেছে না? এভাবে একজন জেলে যদি জানে যে, বাজারে মাছের দাম কেমন তাহলে সে ঠকবে না।

একইভাবে, একজন কৃষক যদি জানে কোন বাজারে ধানের দাম বেশি তাহলে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কোন বাজারে যাবে। আপনি যদি জানেন যে, চোখের ডাক্তার হিসেবে কে ভালো, তাহলে চোখের সমস্যায় আপনি সেই ডাক্তারের কাছে যাবেন। ৭৫ তথ্য জানার মতো জানানোও জরুরি। ধরুন আপনি অসুস্থ হলেন। আপনি যদি ডাক্তারকে অসুস্থতা বিষয়ে তথ্য ঠিকমতো জানাতে না পারেন যে আপনার কী কী সমস্যা, তাহলে ডাক্তার কি ঠিকমতো চিকিৎসা করতে পারবেন। আবার একজন দোকানি নতুন দোকান দিলেন। তিনি যদি মানুষকে না জানান তার দোকানে কী কী বিক্রি হয়, তাহলে কী ক্রেতারা তাঁর দোকানে যাবে?

তথ্য সংগ্রহ

আমরা বই, খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন বা কোনো মানুষের কাছ থেকে তথ্য পাই। কিন্তু ভেবেছেন কি তথ্য কীভাবে জোগাড় বা সংগ্রহ করা হয়? আসুন এবার একটি কাজ করা যাক।

কার্যপ্রণালি:

- আপনারা কয়েকটি দলে ভাগ হোন। দলে আলোচনা করে ঠিক করুন কোন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন।

তথ্য সংগ্রহের বিষয়: ১। বাজারে শাক-সবজির দাম; ২। পিটিআইয়ের আশেপাশে কী কী উদ্ভিদ আছে; ৩। পিটিআইয়ের আশেপাশে কী কী প্রাণী আছে; ৪। শ্রেণির ২০ জন শিক্ষার্থীর উচ্চতা ও ওজন; ৫। আপনার দলের সদস্যদের শরীরের তাপমাত্রা।

- এবার ঠিক করুন কীভাবে এ তথ্য সংগ্রহ করবেন। শিক্ষককে পরিকল্পনা জানান। শিক্ষক সম্মতি দিলে তথ্য সংগ্রহ করুন।

সব কয়টি দল কি একই প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ করেছেন? নিশ্চয়ই না। বাজারে শাক-সবজির দাম জানার জন্য কী করতে হয়েছে? সবজি বিক্রেতার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে কোন সবজির কত দাম। এভাবে মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। আবার পর্যবেক্ষণ করে আমরা জানতে পারি কোনো একটি জায়গায় কী কী উদ্ভিদ বা প্রাণী আছে। আবার সহপাঠীদের উচ্চতা, ওজন ও তাপমাত্রা মাপতে হলে কী করতে হবে? ফিতা দিয়ে উচ্চতা মাপতে হবে। যন্ত্র দিয়ে ওজন মাপতে হবে। থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপতে হবে। এভাবে মানুষকে জিজ্ঞাসা করে, পর্যবেক্ষণ করে এবং পরিমাপ করে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

উপরে যে যে উপায়ে তথ্য সংগ্রহের কথা বলা হলো, সেখানে কি প্রযুক্তি ব্যবহারের দরকার আছে? সবজির দাম জানতে বা উদ্ভিদ-প্রাণী খুঁজে বের করতে প্রযুক্তি না হলেও চলে। কিন্তু উচ্চতা মাপতে ফিতা, ওজন মাপতে ওজন মাপার যন্ত্র আর তাপমাত্রা মাপতে থার্মোমিটার দরকার হয়েছে। কলের পানিতে আর্সেনিক আছে কি না তা জানতে প্রযুক্তির দরকার। এরকম অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে প্রযুক্তির দরকার হয়। আবার প্রযুক্তি তথ্য সংগ্রহকে অনেক সহজ করে দেয়। যেমন, ধরুন আপনার কাছে সবজি বিক্রেতার মোবাইল নম্বর আছে। আপনাকে কি তাহলে বাজারে গিয়ে সবজির দাম জানতে হবে? বিক্রেতাকে টেলিফোন করে সবজির দাম জানতে পারা যায়।

তথ্য সংরক্ষণ

আপনারা নিজেরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এ তথ্য কি মনে মনে রাখবেন? সব তথ্য কি আপনারা ঠিকমতো মনে রাখতে পারবেন? একটি কাজ করুন। আপনারা যাঁরা নিজেদের স্মরণশক্তি ভালো মনে করেন তাঁরা ১০ জন করে দু'টি দলে ভাগ হোন। অন্যরা দেখুন। একজন মডারেটরের ভূমিকা পালন করুন। মডারেটর একটি কাগজে কয়েকটি তথ্য লিখুন। শহরের মোড়ে একটি রিকশা ও ভ্যানের মধ্যে সংঘর্ষে দুজন যাত্রী সামান্য আহত হয়েছেন। বাজারের লোকেরা দ্রুত ছুটে এসে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। তারপর নতুন রিকশা ডেকে তাদের রিকশায় তুলে দেন। এ তথ্যটি দু'দলের দু'জনকে দেখান। তারপর তাদেরকে বলুন তাদের দলের একজনের কাছে কানে কানে তথ্যগুলো জানাতে। সেই একজন আবার পরের জনকে কানে কানে তথ্য জানাবে। এভাবে প্রতিটি দলেই যখন দশম ব্যক্তি তথ্য জানবে তখন তাকে একটি কাগজে তা লিখতে বলুন। লেখা হলে তা পড়ে শোনাতে বলুন। দেখবেন, দু'দলই সঠিক তথ্য থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

মানুষ যখন লিখতে-পড়তে পারত না তখন বিভিন্ন তথ্য মনে রাখত। একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষ তথ্য জেনে নিত। এভাবে তথ্য একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে যেতে যেতে তথ্য ঠিক থাকত না। তখন মানুষ গুহার দেয়ালে ছবি আঁকে তথ্য রাখত। তারপর যখন মানুষ লিখতে শিখল তখন থেকে গুহার দেয়ালে, গাছের ছালে ও পাতায় লিখে তথ্য সংরক্ষণ করত।

বর্তমান সময়ে তথ্য সংরক্ষণ করার অনেক ভালো উপায় আছে। কাগজে লিখে বা ছাপিয়ে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। লেখা বা ছাপানো কাগজ বাঁধাই করে রেখে দেয়া যায়। টেপ রেকর্ডারে কথা রেকর্ড করার মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। সিডিতে গান রেকর্ড করা থাকে, তাই না? এটাও একধরনের তথ্য সংরক্ষণ। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে, ভিডিও করেও তথ্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। কম্পিউটারে টাইপ করে ও স্ক্যান করে তথ্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। কম্পিউটারে রেকর্ড, ভিডিও, ছবি এগুলোও সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। পেন ড্রাইভ, সিডি, ভিসিডি এগুলোর মধ্যেও অনেক তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। মোবাইলেও তথ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা থাকে। যেমন মোবাইলে অনেক মানুষের মোবাইল নম্বর সেভ বা সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

বর্তমানে আমরা বসবাস করছি তথ্যবিশ্বের যুগে। আমাদের চারপাশে রয়েছে তথ্যের অবাধ সরবরাহ। এই সব তথ্যের কোনগুলো আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় তা আমাদের জানা দরকার। কেননা, আমরা যেন প্রয়োজনের সময় সেই জানা তথ্যগুলো কাজে লাগাতে পারি। এছাড়া প্রয়োজনে এই তথ্যগুলো আমরা সংরক্ষণ করবো যাতে করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে পারি। এজন্য আমাদের উচিত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বিন্যস্ত করাকে বুঝায়।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বর্তমান যুগকে অনেকে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ বলে থাকে। প্রযুক্তি উৎকর্ষের মাধ্যমে তথ্য যোগাযোগ হয়ে গেছে অতিশয় সহজ। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ন্যূনতম সময়ের ব্যবধানে তথ্য পৌঁছিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু কয়েকশ' বছর আগেও তথ্য যোগাযোগ এত সহজ ছিল না। তারবিহীন প্রযুক্তি তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরেকটি বিপ্লব নিয়ে আসে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেই রেডিও উদ্ভাবিত হয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে টেলিভিশন। মোবাইলও একই পদ্ধতিতে কাজ করে। রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে তথ্য তার ছাড়াও মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যাচ্ছে। আর মোবাইলের মাধ্যমে আমরা একে অন্যের সাথে কথা বলে তথ্য বিনিময় করতে পারি। ছোট চিঠি বা মেসেজের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারি। আজকাল মোবাইলের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেটের বুকিং দেয়া যায়। মোবাইলে আজকাল বিভিন্ন বিল পরিশোধ করা হয়। ব্যাংকের কিছু কাজও করা যায় মোবাইলে। তারবিহীন প্রযুক্তির কারণে বর্তমান যুগে তথ্য আদান-প্রদান অনেক সহজ ও দ্রুত হয়েছে।

আপনারা কম্পিউটার দেখেছেন নিশ্চয়ই? কম্পিউটারে আমরা লিখতে পারি, ছবি আঁকতে পারি, গান শুনতে পারি, নাটক বা ছায়াছবিও দেখতে পারি। কিন্তু কম্পিউটারের সাহায্যে আরো প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারি। কম্পিউটারে আমরা তথ্য সংরক্ষণ করতে পারি। যেমন ছবি, গান, লেখা এগুলো সংরক্ষণ করা যায়। এটি দিয়ে আমরা তথ্যকে ব্যবহার উপযোগী করতে পারি। যেমন আপনার শ্রেণির সকলের উচ্চতা ও ওজন মাপলেন। কম্পিউটারের সাহায্যে বের করতে পারবেন গড় উচ্চতা ও গড় ওজন কত কিংবা উচ্চতার সাথে ওজনের সাথে কী সম্পর্ক রয়েছে। কম্পিউটারের সাহায্যে তথ্য

আদান-প্রদানও করা যায়। তবে তার জন্য দরকার হয় ইন্টারনেট। ইন্টারনেট হলো সারা পৃথিবীর কম্পিউটারগুলোর একটি জাল বা নেট। এ জালে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার একটার সাথে আরেকটা যুক্ত করা হয়েছে। ফলে একটা কম্পিউটার থেকে আরেকটি কম্পিউটারে তথ্য সহজেই পাঠিয়ে দেয়া যায়। যেমন আপনি বাংলাদেশের একটি কম্পিউটারে বসে আপনার বিদ্যালয়ের একটি ছবি জাপানের একটি কম্পিউটারে পাঠিয়ে দিতে পারেন। সেখানে আপনার বন্ধু তার কম্পিউটারে সাথে সাথে সেই ছবিটি দেখতে পারবেন। তার কম্পিউটারে সেটি সংরক্ষণ করতেও পারবেন। বিভিন্ন বিষয়ে অসীম তথ্য বা জ্ঞান ইন্টারনেটে রাখা আছে। আপনার কম্পিউটারে যদি ইন্টারনেটের সংযোগ থাকে তাহলে আপনি চাইলেই সে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। যেমন, ইন্টারনেটে দেয়া আছে ঢাকা থেকে চট্টগামের ট্রেন কখন ছাড়ে। আপনি ইন্টারনেটে গিয়ে তা দেখতে পারেন। ইন্টারনেট থেকে ট্রেনের টিকেটও কাটতে পারেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সাক্ষরতা

বর্তমানে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও আদান প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সাক্ষরতা বা ডিজিটাল সাক্ষরতার ধারণা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সাক্ষরতা একজন ব্যক্তির সেই সক্ষমতা বা সামর্থ্য যার দ্বারা তিনি

- কোন কাজে কী ধরনের ও কতটুকু তথ্য দরকার তা নির্ধারণ করতে পারেন
- কার্যকরভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন
- তথ্য ও তথ্য উৎসের সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়ন করতে পারেন
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্যকে প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করতে পারেন এবং
- প্রয়োজনীয় তথ্যের অর্থনৈতিক, আইনগত ও সামাজিক দিক বুঝে তথ্য নৈতিকভাবে ও বৈধভাবে (আইনী বিবেচনায়) নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহার করেন।